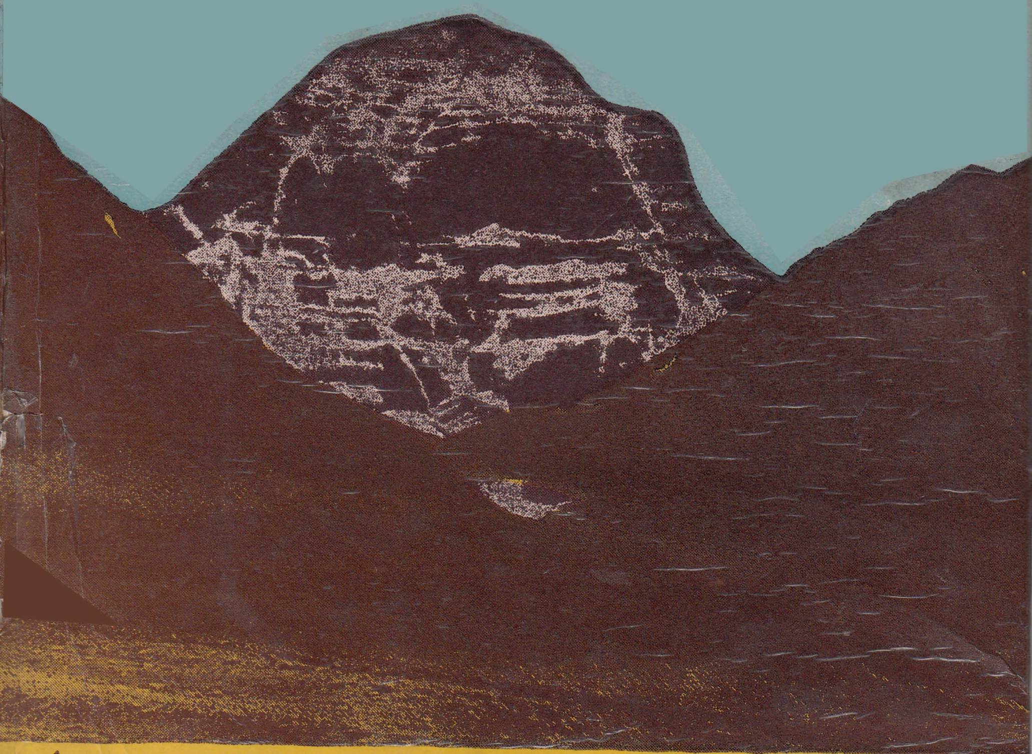


কৈলাস ও মানসসরোবর

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কৈলাস ও মানস সরোবর

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়


মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮৪
অষ্টম মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৯৯

—ষাট টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—অজিত গুপ্ত
মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

আলোক চিত্র
শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ও লেখক
মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশান সিন্ডিকেট

KAILASH 0 MANASSAROBAR
A travelouge by Umaprosad Mukherjee published by Mitra & Ghosh
Publishers Pvt. Ltd. of 10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta-73

Price Rs. 60/-

ISBN : 81-7293-097-6

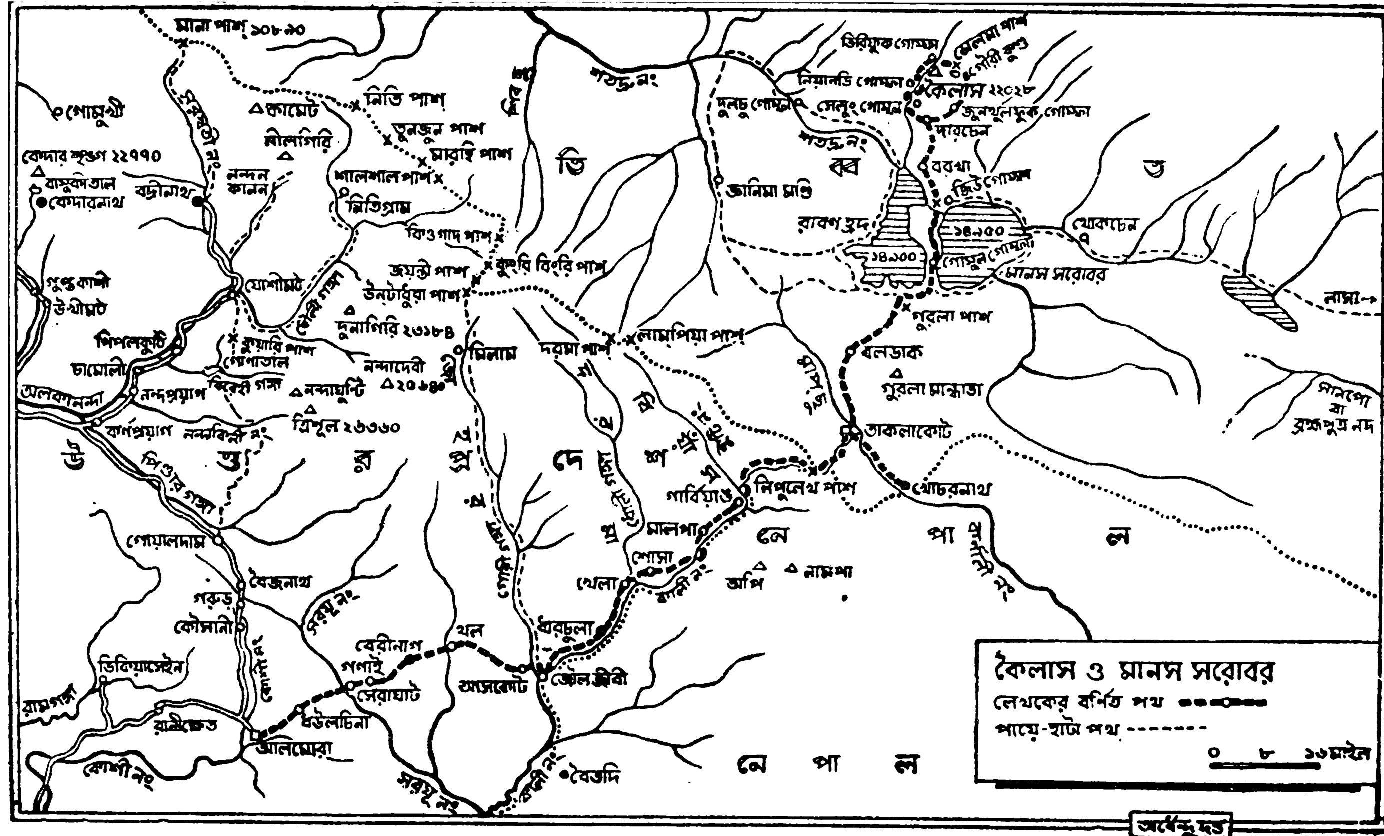
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

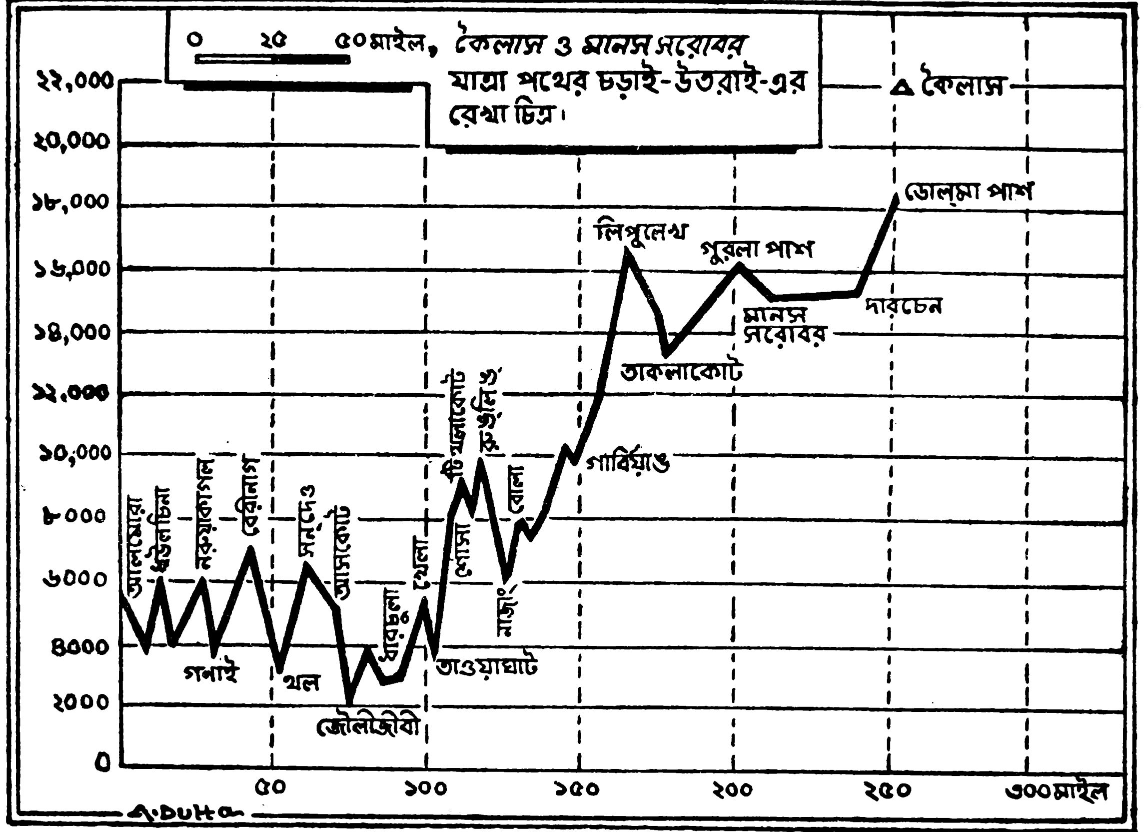
সূচীপত্র

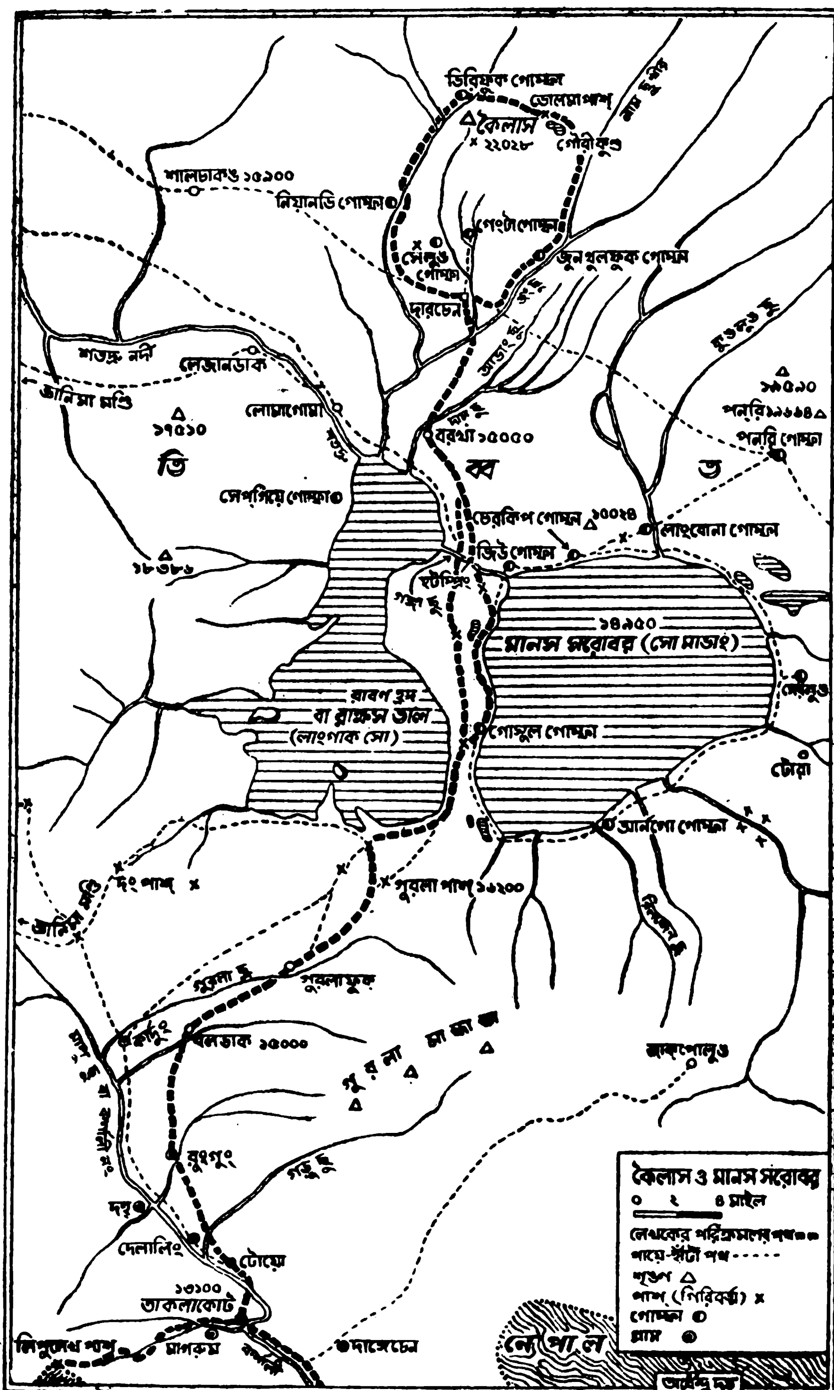
কৈলাস

ও

মানস সরোবর


কৈলাস ও মানস সরোবর
লেখকের বর্ণিত পথ
পায়ে-হাটা পথ
০ ৮ ১৬মাইল
অর্ধেন্দু দত্ত
মানা পাশ ১০৮৯০
গোমুখী
কেদার শৃঙ্গ ২২৭৭০
বাসুকিতাল
কেদারনাথ
বদ্রীনাথ
নন্দন কানন
কামেট
নীলগিরি
নিতি পাশ
তুনজুন পাশ
মারাহি পাশ
শালশাল পাশ
নিতিগ্রাম
কিওগাদ পাশ
জয়ন্তী পাশ
কুংরি বিংরি পাশ
উনটাধুরা পাশ
যোশীমঠ
গুপ্তকাশী
উখীমঠ
পিপলকুঠি
চামোলী
অলকানন্দা
নন্দপ্রয়াগ
কর্ণপ্রয়াগ
ত্রিশূল ২৩৩৬০
নন্দাঘুন্টি
নন্দাদেবী
দুনাগিরি ২৩১৮৪
মিলাম
দরমা পাশ
লামপিয়া পাশ
উ ত্ত র প্র দে শ
গোয়ালদাম
বৈজনাথ
গরুড়
কৌসানী
ডিবিয়াসেইন
রানীক্ষেত
আলমোরা
কোশী নং
রামগঙ্গা
সেরাঘাট
ধউলচিনা
বেরীনাগ
গণাই
থল
অসকোট
জৌলজীবী
ধরচুলা
খেলা
শোসা
মালপা
গার্বিয়াং
নিপুনেথ পাশ
তাকলাকোট
খোচরনাথ
সরযূ নং
কালী নং
বৈতডি
নে পা ল
শতদ্রু নং
তি ব্ব ত
ডিরিফুক গোম্ফা
দোলমা পাশ
গৌরী কুণ্ড
নিয়ানড়ি গোম্ফা
কৈলাস ২২০২৮
দুলচু গোম্ফা
সেলুং গোম্ফা
জুনথুলফুক গোম্ফা
দারচেন
বরখা
জিউ গোম্ফা
জানিমা মণ্ডি
রাবণ হ্রদ
১৪৯৫০
১৪৯০০
গোসুল গোম্ফা
মানস সরোবর
খোকচেন
লাসা
গুরলা পাশ
বলডাক
গুরলা মান্ধাতা
সানপো বা ব্রহ্মপুত্র নদ

০ ২৫ ৫০মাইল, কৈলাস ও মানস সরোবর
যাত্রা পথের চড়াই-উতরাই-এর
রেখা চিত্র।
২২,০০০
২০,০০০
১৮,০০০
১৬,০০০
১৪,০০০
১২,০০০
১০,০০০
৮০০০
৬০০০
৪০০০
২০০০
০
৫০
১০০
১৫০
২০০
২৫০
৩০০মাইল
কৈলাস
আলমোরা
ধৌলছিনা
নরুয়াকাগল
গনাই
বেরীনাগ
থল
সনদেও
আসকোট
জৌলজীবী
ধারচুলা
খেলা
তাওয়াঘাট
পোসা
টিথলাকোট
রুঙলিঙ
নাজাং
বোলা
গার্বিয়াঙ
লিপুলেখ
তাকলাকোট
গুরলা পাশ
মানস
সরোবর
দারচেন
ডোলমা পাশ
A. Dutta


ডিরিফুক গোম্ফা
ডোলমাপাশ
কৈলাস
গৌরীকুণ্ড
নিয়ানডি গোম্ফা
গেংটা গোম্ফা
সেলুঙ গোম্ফা
জুনথুলফুক গোম্ফা
দারচেন
শতদ্রু নদী
লেজানডাক
লোমাগোমা
বরখা ১৫০৫০
পনরি গোম্ফা
তি
ব্ব
ত
সেপগিয়ে গোম্ফা
চেরকিপ গোম্ফা
লাংবোনা গোম্ফা
জিউ গোম্ফা
হটস্প্রিং
১৪৯৫০
মানস সরোবর (সো মাভাং)
রাবণ হ্রদ
বা রাক্ষস তাল
(লাংগাক সো)
গোসুল গোম্ফা
টোকা
আর্নগো গোম্ফা
দং পাশ
গুরলা পাশ ১৬২০০
গুরলা চু
গুরলাফুক
বলডাক ১৫০০০
গু র লা মা ন্ধা তা
রুংগুং
গড়ু চু
দপু
দেলালিং
টোয়ো
১৩১০০
তাকলাকোট
লিপুলেখ পাশ
মাগরুম
দাসেচেন
নেপাল
কৈলাস ও মানস সরোবর
০ ২ ৪ মাইল
লেখকের পরিক্রমণের পথ
পায়ে-হাঁটা পথ
শৃঙ্গ
পাশ (গিরিবর্ত্ম)
গোম্ফা
গ্রাম

ভূমিকা

১৯৩৪ সাল আমার পরিব্রাজন-জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। সেই বছরে কৈলাস মানস সরোবরে যাই। যাত্রা-শেষে ফিরে এসে এই দিনপত্রী লিখি। নানা কারণে সে-সময়ে বই-আকারে রচনাটির প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তার এক প্রধান অন্তরায়, ঘটনা-বিপর্যয়ে পাণ্ডুলিপির অংশ-বিশেষ হস্তচ্যুত হয়। অবশিষ্ট অংশ বিকলাঙ্গ-কলেবরে ধূলিধূসরিত ও অবহেলিত পড়ে থাকে। এখন বন্ধুবান্ধবের তাগিদে এটিকে যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ করে আবার সাজাতে বসা। বত্রিশ বছর বয়সের লেখা,—তায় আবার হারিয়ে-যাওয়া অংশ চল্লিশ বছর পরে পুনরায় লিখে জুড়ে দেওয়া। এই জীর্ণ-সংস্কার কতখানি সফল হোল জানি না। তবে, মূল রচনার ভাষাগত সামান্য বদল হলেও ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে নি।

এই রচনা-প্রকাশে শুভানুধ্যায়ীদের উৎসাহ ও তাগাদার এক বিশেষ কারণ থাকে। হিমালয়ের পরপারে, ভারত সীমান্তের বাইরে, সুদূর তিব্বতে কৈলাস ও মানস সরোবর। তিব্বত এখন চীনের দখলে। চীনের সঙ্গে সম্প্রতি ভারতের সৌহার্দ্যের অভাবে এদেশ থেকে কৈলাস-মানস-যাত্রার যুগযুগান্তরের পথ অবরুদ্ধ। সেই দুর্গম তীর্থপথের যাত্রা-কাহিনী শোনবার আগ্রহ ও কৌতূহল জাগা স্বাভাবিকই। পাঠকমনের সেই ঔৎসুক্য এই রচনা যদি কিছুমাত্র মেটাতে সক্ষম হয়, তবেই এর প্রকাশ সার্থক হবে।

মূল রচনার মধ্যে মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রার অতীত কাহিনীর বিশদ উল্লেখ না থাকায় এই মুখপত্রে তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

* * * *

সেক্সপীয়র যেমনি বলুন না কেন, নামের জাদু কিছু থাকেই।

না হলে, 'কৈলাস মানস সরোবর'—নাম শুনলেই মন কেন কোথায় উড়ে চলে কল্পনার রথে বসে? হৃদয়ের নিভৃত তন্ত্রীতে কী এক মধুর সুরের অস্ফুট মূর্ছনা ওঠে?

অথচ, এ-নাম প্রথম কবে জগদ্বাসীর কানে আসে, তা কি কেউ জানে?

ইতিহাস-রচনা এদেশের লোকের ঠিক ধাতে আসে না। চন্দ্রবিহীন

রজনীতে অসংখ্য তারার যেমন ঝিকিমিকি, তেমনি তথ্যের যেখানে যত অভাব কল্পনার সেখানে তত প্রভাব, প্রবাদ-সৃষ্টির স্বর্ণ সুযোগ।

সেই কারণেই, হয়ত, কৈলাস মানস সরোবর নাম ঘিরেও পৌরাণিক উপকথা ও কাব্যকাহিনীর অন্ত থাকে না। ভারতবাসী ভাবতে আনন্দ পায় কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেবের বাস। কৈলাস শিবলোক। অতএব দেবতাদেরই সেখানে আনাগোনা। অসুর ও রাক্ষসদেরও কখন-সখনও আবির্ভাব। কিন্তু তাঁরাও শাপভ্রষ্ট দেবতা বা শিবভক্ত। ভস্মাসুর, রাবণ আদি এইখানে এসে শিবের আরাধনা করেন। আবার, যোগী-ঋষিদেরও পুণ্যক্ষেত্র তপোভূমি কৈলাস।

কৈলাসের অদূরে মানস সরোবর। ভূতত্ত্ববিদ হিসাব করে প্রমাণ দিয়ে দেখান, তিব্বতের এসব অঞ্চলে পুরাকালে সমুদ্র ছিল। টেথিস্ সাগর। তারপর, কয়েকটি বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ও ভূগর্ভে আলোড়নের কারণে সেই সাগর লুপ্ত হয়। স্থানে স্থানে বিশাল হ্রদের অস্তিত্ব রেখে যায়। হিমালয়েরও আবির্ভাব ঘটে। ভূবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে পৃথিবীর এই ভূভাগের সৃষ্টিক্রিয়া হতে থাকে কত যুগ—অধিযুগ—কল্প ধরে।

ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ ও সাহিত্য,—চতুর্বেদ। কৈলাস মানস সরোবরের নাম সে-গ্রন্থে দেখা যায় না। তবে মেরুপর্বতের উল্লেখ আছে। পুরাকালে ভারতবাসীর মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সুমেরু শিখর মর্ত্যলোকের মধ্যবিন্দু। মানবদেহে যেমন মেরুদণ্ড, পৃথিবীরও তেমনি মেরুদণ্ড সুমেরু পর্বত। এই থেকেই কি মেরু নামের প্রবর্তন, সেখানে দেবতার অধিষ্ঠান পরিকল্পনা? মেরুপর্বতই পরে কৈলাস নামে অভিহিত হয় বলে একটা অভিমত আছে। বেদের আর্য দেবতা রুদ্র, অনার্য দেবতা শিবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যান। মেরুপর্বতেরও কৈলাস নামে পরিণতি তারই ফল কি না কে জানে!

বিভিন্ন পুরাণে কৈলাস মানস সরোবর নামের ছড়াছড়ি। স্বয়ং শিব ও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মানসখণ্ডে তপস্যা করেন। মরীচি, বশিষ্ঠ আদি ঋষিরাও সেখানে যোগাসীন থাকেন।

বাঙলাভাষায় 'মান্ধাতার আমল' বলে একটা কথার প্রচলন আছে। প্রবাদ, সেই রাজা মান্ধাতা জগতে মানস সরোবরের প্রথম সন্ধান দেন। এরই সৈকতে তিনি ধ্যাননিমগ্ন থাকেন। এই ঘটনার স্মারক স্বরূপ হ্রদের দক্ষিণ তীরবর্তী

গিরি-শ্রেণীর নামকরণ,—মান্ধাতা শৈলশ্রেণী—গুর্লা মান্ধাতা।

বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে মানস সরোবরের উৎপত্তি ও নামকরণের কাব্যরসাত্মক কারণ বলেন। আদিকাণ্ড, চতুর্বিংশ সর্গ। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নৌকাযোগে রামচন্দ্রের গঙ্গা পার হওয়ার বিবরণ। সরযূ ও গঙ্গার সংযোগস্থল। সঙ্গমের নিকটে গঙ্গার জলরাশির তুমুল শব্দের হেতু কি, শ্রীরামচন্দ্র জানতে চান। বিশ্বামিত্র বলেন,

কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্॥
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।
তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে॥
সরঃপ্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।
তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে॥

হে নরশার্দূল রাম। পুরাকালে ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মনের দ্বারা এক সরোবর নির্মাণ করেন। ব্রহ্মার মানস-উদ্ভূত, নাম তাই মানস সরোবর। সেই সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে এক নদী এসে অযোধ্যা নগরীকে ঘিরে রেখেছে। ব্রহ্মার রচিত সরোবর থেকে প্রবাহিত, তাই ঐ নদী অতিপবিত্র। সরোবর থেকে উদ্গত হওয়ায় নাম তার সরযূ। সেই সরযূনদীর গঙ্গার সঙ্গে এইখানে মিলন। সরযূর জলরাশি গঙ্গায় পতিত হওয়ার কারণেই এই অতুল শব্দ।

নিছক কবি-কল্পনাই নয়। ভৌগোলিক তথ্যেরও সন্ধান কিছু এইখানে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল-ব্যাপী এক প্রাচীন ধারণা ভারতে বহুপ্রচলিত ছিল, —গঙ্গার উদ্ভব কৈলাস-পর্বতে বা মানস সরোবরে। এই অন্ধ বিশ্বাসের কবে থেকে, কী ভাবে, প্রচার হয়, জানা নেই। তবে, এই ভ্রান্ত ধারণা যে ছিল, তার বহু প্রমাণ মেলে। এমন কি, মহাকবি কালিদাসও 'মেঘদূতে' কৈলাসের বর্ণনা দিতে লেখেন:

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গা দুকূলাং

প্রণয়ীর অঙ্কশায়িনী রমণীর বসনের মত তার (কৈলাস) থেকে গঙ্গা স্রস্ত স্খলিত হচ্ছে। পরবর্তী কালেও কোন কোন পর্যটকের এই ধরনের বিবৃতি বই-এ পড়া যায়।

কিন্তু, বাল্মীকি গঙ্গার উৎপত্তি কৈলাসে বা মানস সরোবরে, এমন ইঙ্গিত করা তো দূরের কথা, নির্ভুল বর্ণনা লেখেন, অপর নদী—সরযূর জন্ম

মানস সরোবরে,—নামও তাই সরযূ। এই ভৌগোলিক তথ্য সেই যুগেও আদি কবির জানা ছিল, আজ ভাবতেও বিস্ময় জাগে।

কৈলাস মানস সরোবর অঞ্চল থেকে চারটি প্রসিদ্ধ নদীর উৎপত্তি,—যাদের ক্ষুরধার জলধারা হিমালয়ের গিরিপ্রাচীর ভেদ করে ভারতে প্রবেশ করে। সাংপো—পরে যার নাম হয় ব্রহ্মপুত্র; শতদ্রু বা সাতলেজ; সিন্ধু বা ইন্ডাস এবং কর্ণালী। কর্ণালীর উৎসের নিকটে যে জলপ্রবাহ, তিব্বতে তার নাম Map chhu; সে নদীর খোজরনাথের সন্নিকটে নাম দেখা যায় কর্ণালী। কর্ণালী তিব্বত ছেড়ে নেপালে আসে, তারপর ভারতে নেমে কালীনদীর সঙ্গে মিলিত হয়। কালীর এক উপনদী সরদা বা সারদা বা সরযূ। এই নদীগুলির মিলিত ধারার আধুনিক নাম ঘর্ঘরা বা গোগরা। এরই আর এক নাম সরযূ। অযোধ্যা নগরী আবেষ্টন করে আরও নেমে এসে ছাপরার নিকটে গঙ্গার সঙ্গে তার সঙ্গম। তাই, ভৌগোলিক দৃষ্টিতে সরযূর দীর্ঘতম উপনদী—কর্ণালী,—জন্ম যার মানস সরোবর অঞ্চলে। বাল্মীকির এ-তথ্য জানা ছিল—সুস্পষ্ট।

মহাভারতেও কৈলাস মানস সরোবরের উল্লেখ বহু স্থলে। কিন্তু সেই বিরাট মহাকাব্যের কোন্ অংশ কোন্ ব্যাসদেবের লেখা, কতখানিই বা প্রক্ষিপ্ত এ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

এশিয়া মহাদেশের যে অঞ্চলে কৈলাস মানস সরোবরের অবস্থান, আধুনিক কালে সেদেশের নাম তিব্বত। ভারত ভূভাগের বাইরে। হিমালয়ের পরপারে—আরও উত্তরে। মহাভারতীয় যুগে ঠিক এই অঞ্চলের নাম কি ছিল বলা হয়ত যায় না। তবে, হিমালয়ের উচ্চস্তরে ও অপরপারে আধুনিক তিব্বতে যে-সব অধিবাসীর বসবাস ছিল, তাদের নাম শোনা যায়,—কোথাও বা গন্ধর্ব, কোথাও বা কিন্নর, যক্ষ ইত্যাদি।—তাই তাদের নাম অনুসারে সেই সব প্রদেশের অংশ-বিশেষেরও পরিচয় ছিল,—কিন্নরদেশ, গন্ধর্বলোক, কুবের আলয় প্রভৃতি। সে-সব অঞ্চল ভারতীয় অধিপতিদের অধীনস্থ ছিল বলে মনে হয় না। প্রাচীন কালে তিব্বতের নাম ছিল হুন্ দেশ। পরে ভোট নামেরও প্রচলন হয়। ভোট থেকে টৌ-ভোট হয়ে তিব্বত শব্দে পরিণতি সম্ভব। মার্কো পোলো (আঃ ১২৫৪-১৩২৪ খৃষ্টাব্দ) চীনদেশে গিয়েছিলেন এবং তিব্বতে না গেলেও সম্ভবতঃ প্রথম ইউরোপে তিব্বত নাম প্রচার করেন। এর পরে মুসলমানরা হয়ত ভারতে এসে এই নাম চালু করে দেন। শুনি, আবুল ফজল এ-নাম ব্যবহার করেছেন, আইন-ই-আকবরিতেও

প্রয়োগ আছে। ইয়ারখণ্ডের উজবেকরা ভেড়ার লোমের পশমকে এখনও নাকি "তিব্বত" বলে। সংস্কৃতে ত্রিবিষ্টপভূমি—অর্থাৎ দেবভূমি বলেও শুনেছি তিব্বতের পরিচয় পাওয়া যায়,—কৈলাস মানস সরোবরের অবস্থিতির কারণে কিনা জানি না। সেই ত্রিবিষ্টপ থেকে তিব্বত শব্দের উৎপত্তি, এমনও কারো কারো ধারণা।

প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্টতা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়, এককালে ভারত প্রকৃতই মহা-ভারত ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারে হোক বা না হোক, ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার বিপুল প্রভাব এশিয়ার নানান সুদূর প্রান্তে বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমে কোথায় আফগানিস্থান, উত্তরে তিব্বতদেশ, পূর্বাঞ্চলে কম্বোজ, ইন্দো-চীন ছাড়িয়ে সর্বত্রই ভারতীয় সংস্কৃতির মঙ্গলময় দীপশিখার স্নিগ্ধপ্রভা। ভারতীয় ধর্মগুরু, সাধু মহাত্মাদের এইসকল দেশে সেকালে যাতায়াত থাকে। মাঝে মাঝে যুদ্ধযাত্রার বিজয়কাহিনীর দুন্দুভি নিনাদও যে শোনা যায় না এমন নয়। অর্জুনের হিমালয় ও তিব্বত-অঞ্চল জয়ের কথা মহাভারতে লেখে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ঐ সব প্রদেশ থেকেও রাজন্যবর্গের উপঢৌকন আসে,—বহুবিধ স্বর্ণরত্নাদি, বলশালী অশ্ব, চমরীপুচ্ছ-নির্মিত চামর ইত্যাদি। পরে ভীমসেন ব্যাস ঋষির সঙ্গে কৈলাস যান। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেখানে ভ্রমণ করে আসেন। হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চল ব্যাসদেবের তপস্যাক্ষেত্রের সগৌরব স্মারকচিহ্ন বহন করে এখনও বর্তমান কাল,—মহর্ষি ব্যাসের নামে সে সব স্থানের নামকরণ। কৈলাস মানস সরোবরের যাত্রাপথেও তার এক নিদর্শন আছে।

সেই পুরাকালে হিমালয়ের দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গিরিপ্রাচীর ও তুষারাবৃত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে এত মুনি-ঋষির যাতায়াত কিভাবে সম্ভব হত এখন ভেবে কূল পাওয়া যায় না।

প্রাচীন কবিগণও কৈলাস মানস সরোবরের মহিমা কীর্তন করেন সুযোগ পেলেই। কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'কুমারসম্ভবে' নগাধিরাজ হিমালয়ের ও কৈলাস-মানসের রূপবর্ণনা প্রসিদ্ধ। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' পদ্মদীঘি মানস সরোবরের অকলঙ্ক জলে ব্রহ্মার বিমান হংসপালকের বিচরণের উল্লেখ। তাঁর 'কাদম্বরীর' 'অচ্ছোদ সরোবর'ও এই হ্রদেরই কাব্যময় নামান্তর অনুমিত হয়।

সুপ্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থেও পদ্মহ্রদের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা মানস সরোবরেরই আর এক নাম বলে কারও কারও অভিমত। প্রথম তীর্থঙ্কর

আদিনাথ ঋষভদেবের জন্ম অযোধ্যায়। মানসের অদূরে কৈলাসে তিনি নির্বাণলাভ করেন বলে প্রচার আছে। কৈলাসপতির বাহন—বৃষ। ঋষভ-দেবেরও লাঞ্ছন—অর্থাৎ প্রতীক বৃষ।

আধুনিক যুগেরও সাধুসন্ন্যাসী এবং ধর্মপ্রচারকদের নামের সঙ্গে কৈলাস-মানস-খণ্ডের সংযোগ থাকে। প্রমাণসাপেক্ষ হলেও কিংবদন্তী শোনা যায়, জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্য কৈলাসের নিকটে মহাপ্রয়াণ করেন। কেউ কেউ বলেন, গাড়োয়ালে কেদারনাথে!

স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিতে লেখেন, তিনি নাকি প্রায় একাদিক্রমে বাষট্টি বছর মানস সরোবরে স্বামীজীর চরণকমলসেবায় রত ছিলেন।

সাধু মহাত্মাদের অসাধারণ জীবনের বিবিধ অলৌকিক কাহিনী ছাড়াও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে মানস সরোবরের নাম সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। দু-একজন ঐতিহাসিক মনে করেন, মহারাজ অশোক আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৬৯ সালে কুমায়ুনের কত্যুরি রাজা নন্দীদেবকে পশ্চিম তিব্বত জয় করতে পাঠান। উনটাধুরা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে প্রবেশ করেন। যুদ্ধে জয়ী হন। ফেরবার পথে মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শন করেন। এর পরের বছরেও নন্দীদেব আবার ঐ অঞ্চলে যান।

বদরীনাথের পথে পড়ে প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির পাণ্ডুকেশ্বর। শুনেছি, সেখানকার তাম্রলিপিতে নাকি লেখে, আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৩ অব্দে কত্যুরি রাজা ললিত সুরদেব ও দেশতদেব হুনদেশ—অর্থাৎ মানসখণ্ড জয় করেন।

তিব্বতের এই প্রদেশ কত্যুরি রাজাদের রাজ্যভুক্ত থাকার কথা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজকগণও উল্লেখ করেন। এই পরিব্রাজকদের মধ্যে কেউ কেউ মানসখণ্ডের মধ্যে দিয়ে ভারতে আসেন বলে এক অভিমত আছে।

ঐতিহাসিক তথ্যরূপে এ সকল উক্তির কিন্তু ভিত্তি স্থাপিত হয় নি।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ রোমান লেখক Pliny মানস সরোবরের উল্লেখ করেন, এরূপ এক মতের প্রচার আছে। কিন্তু সোয়েন হেডিন লেখেন, Pliny-র কোন বিবরণে তা পাওয়া যায় না।

তবে, বিগত প্রায় এক হাজার বছর ধরে মানস ও কৈলাস অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবাসীর সংযোগ চলেছেই এর সন্দেহাতীত প্রমাণ মেলে।

খৃষ্টীয় ১০২৭ সালে কাশ্মীরের পণ্ডিত সোমনাথ তিব্বতের ঐ অঞ্চলে যান এবং কালচক্র জ্যোতিষ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর সঙ্গে পণ্ডিত লক্ষ্মীকর ও ধনশ্রী রাহুলও ছিলেন।

খৃষ্টীয় এগার শতকে তিব্বতী যোগিরাজ ও প্রসিদ্ধ কবি মিলারেপা কৈলাস অঞ্চলে কয়েক বৎসর তপস্যারত থাকেন। কৈলাস পরিক্রমার পথে জুল্‌থুক্‌ফুক্‌ গোম্ফায় তার স্মৃতিচিহ্ন এখনও বর্তমান। সেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মহাযোগী মিলারেপার যোগৈশ্বর্যের নানান্‌ কাহিনীর প্রচার আছে। তিব্বতের আদিম Bon ধর্মপন্থী এক যোগীর সঙ্গে তাঁর একবার বাদ-প্রতিবাদ হয়। মিলারেপা যোগবলে কৈলাস শিখরদেশে উপনীত হন্‌ এবং সেই যোগীকে পরাস্ত করেন। কৈলাস-মানস অঞ্চলে তাঁর ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতী ভাষায় লেখা সেই প্রাচীন কাহিনীর ইংরাজি অনুবাদ ১৮৮১ সালে শরৎচন্দ্র দাস তাঁর এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। (Dispute between a Buddhist and a Bonpo priest for the possession of Mount Kailasa and the Lake Manas,—দ্রঃ পরিশিষ্ট।)

আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—অতীশ নামেও যিনি প্রখ্যাত ও যাঁর শরীর ছিল বঙ্গভূমির—খৃষ্টীয় ঐ এগারো শতকে তিব্বতে গিয়েছিলেন। মানস-কৈলাসে ও খোজরনাথে তিনি কিছুকাল কাটান, তারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়ারখণ্ডের অধীপ (খাঁ) তাঁর সেনাপতি মিরজা হাইদারকে লাসা জয়ের উদ্দেশ্যে পাঠান। সেই রণ-অভিযান সফল না হলেও দেখা যায় ফেরবার পথে তিনি এক রাত্রি মানস সরোবরের তীরে কাটিয়েছিলেন। ১৫৮১ সালে সম্রাট আকবরের কাবুল যাত্রা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেসুইট ফাদার Antonio Monserrate (১৫৩৬-১৬০০)। তিনি ছিলেন আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের শিক্ষক। তীর্থযাত্রীদের কাছে থেকে মানস সরোবরের বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি সেই সুবিখ্যাত হ্রদের ভৌগোলিক অবস্থিতি অনুমান করে এক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভিত্তিতে মানস সরোবরের প্রতিষ্ঠাও হয়। এই-ই বোধ করি ঐ এলাকার প্রথম মানচিত্র।

এর বহুপূর্বে কোন্‌ প্রাচীন যুগ থেকে, কি কারণে, জানি না, মানস সরোবরের সঙ্গে ভারতের মাতৃস্বরূপা গঙ্গানদীর সংযোগের কিংবদন্তী সংস্কৃত কাব্যজগতে ও লোকমুখে প্রচারিত থাকে। কল্পনাবিলাসী সরলবিশ্বাসী প্রাচ্য-বাসীদের বদ্ধমূল ধারণা, সুদূর মানস সরোবরই সুরধুনী জাহ্নবীর জন্মস্থান।

এর হয়ত এক কারণ, কৈলাস শিবালয়। মানস সরোবর কৈলাসের নিকটে। শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, মহাদেবের জটা বেয়ে গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ। অতএব, কৈলাসে বা তার পাদমূলে মানসে গঙ্গার উৎস ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।

অবশ্য, গঙ্গাদেবীর এই জন্মকাহিনীর অন্তরালে স্বরলোকের সঙ্গে মর্ত্যভূমির এক যোগসূত্র গাঁথার চেষ্টা হয়ত আছে। এই কারণেই, বোধ হয়, উচ্চস্তরের সাধু-সন্ন্যাসীর মুখে এখনও অভিমত শোনা যায় এবং কোন কোন প্রসিদ্ধ যোগী-মহাত্মার জীবনচরিতে তাঁদের অলৌকিক শক্তির প্রচারকল্পে লেখা হয় যে, এই আধুনিক কালে ভূগোলে বর্ণিত বা মানচিত্রে নামাঙ্কিত কৈলাস মানস সরোবর প্রাচীন ঋষিদের বা শাস্ত্রবর্ণিত প্রকৃত কৈলাস মানস সরোবর নয়। সেই অমৃত দেবলোক সাধারণ মানুষের অগম্য। কেবলমাত্র যোগ-সিদ্ধ সাধু-মহাত্মাগণই সেখানে উপস্থিত হতে সমর্থ। সেখানে নাকি স্বর্ণময় পুরীতে হিরণ্ময়-সিংহাসনে সাক্ষাৎ কৈলাসপতির ও জগজ্জননী ভগবতীর দর্শন মেলে।

সেই 'মানসলোকের অগম পারে' অজ্ঞেয় কৈলাস মানস সরোবরের কথা থাক। আমাদের একালের গঙ্গা যে সেই শাস্ত্রোক্ত সেকালের গঙ্গাই,— এ কথার কিন্তু খণ্ডন হয় নি। আধুনিক ভৌগোলিক কৈলাস-মানসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কি করে হল, সেই প্রশ্নই এখানে মনে জাগে।

তিব্বতের এক প্রাচীন পুঁথি,—কৈলাস পুরাণ। মানস সরোবরের সন্নিকটে রাবণ হ্রদ বা রাক্ষসতাল। এক অপরিসর জলধারা এই দুই হ্রদের মধ্যে সংযোগ রাখে। এই ধারার নাম সেই পুঁথিতে লেখে,—গঙ্গা ছু। তিব্বতী ভাষায় 'ছু' অর্থে নদী, ঝরণা বা জল। রাক্ষসতাল শতদ্রুনদের এক উৎসমুখ। এই সংযোগকারী ধারাকেও কেউ কেউ শতদ্রুর উৎস মনে করেন। এখানে এই ধারার "গঙ্গা" বলে আখ্যাত হওয়ার কারণ জানা নেই। শতদ্রু হিমালয় ভেদ করে ভারতের সমতলভূমিতে নামে। গঙ্গার সঙ্গে তার কোথাও যোগাযোগ নেই। শতদ্রুকে কি তিব্বত অঞ্চলে এককালে গঙ্গা বলে অভিহিত করা হত? অথবা, পবিত্র জলধারাকে গঙ্গা নামে প্রচার করার প্রথার এও এক নিদর্শন? সুদূর দক্ষিণপ্রান্তে সিংহল দ্বীপে—আধুনিক শ্রীলঙ্কায়—এখনও অনেক নদীর নামের সঙ্গে গঙ্গা-শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

মানস সরোবর থেকে গঙ্গার উৎপত্তি,—এই ভ্রান্ত ধারণার প্রচারের সামান্য আর এক কারণ এ যুগেও ঘটে। খৃষ্টধর্মপ্রচারক জেস্যুইট (Jesuit) সম্প্রদায়ের Father Antonio de Andrade (১৫৮০-১৬৩৪), Brother Manuel

Marques-এর সঙ্গে ১৬২৪ সালে পশ্চিম তিব্বতে Tsaparang-এ প্রথম খৃষ্টীয় মিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে যাত্রা করেন। বদরীনাথ-তীর্থযাত্রীদের দলে তাঁরা ছদ্মবেশে যোগ দেন। বদরীনাথ ছাড়িয়ে মানা পাশ্ অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেন। সেই মানা পাশ্-এর নিকটে তাঁরা এক ক্ষুদ্রাকার হ্রদ দেখেন। তারই সন্নিকটে সরস্বতী নদীর উৎস। বদরীনাথের অল্প উপরে মানাগ্রামে বিষ্ণুগঙ্গার (এখন অলকনন্দা নামে যার পরিচয়) জলধারার সঙ্গে সরস্বতী মিলিত হয়। সঙ্গমের নাম কেশবপ্রয়াগ। অলকনন্দা গঙ্গার আর এক প্রধান উপনদী। ৮ই নভেম্বর ১৬২৪ সালে Father Andrade-র লেখা এক চিঠিতে তাঁর এই যাত্রা-পথের কিছু বিবরণী পাওয়া যায়। এই হয়ত ইউরোপবাসীর এ পথে প্রথম যাওয়া ও তার লিখিত বর্ণনা (দ্রঃ পরিশিষ্ট)। সেই বিবরণে, মানা পাশ্-এর নিকটবর্তী ঐ হ্রদের কোন নাম দেওয়া ছিল না। তবুও, পাশ্চাত্ত্য কোন কোন ভৌগোলিকের মনে কিছুকাল ভুল ধারণা থাকে,—ঐ হ্রদই মানস সরোবর এবং ঐখানেই গঙ্গার উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে, সেই হ্রদের নাম দেওতাল (দেবতাল) এবং সে হ্রদ এখনও বর্তমান।

এই বিভ্রান্তির কারণে কাপ্তেন উইলফোর্ড (Capt. F. Wilford)—Asiatic Researches পত্রিকায় (দ্রঃ পরিশিষ্ট) যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাতে Andrade প্রথম ইউরোপবাসী যিনি ১৬২৪ সালে মানস সরোবর দেখেন বলে ভ্রান্ত মত প্রকাশ করেন। এই ভুল বহু বছর পরে ধরা পড়ে। উইলফোর্ডের প্রবন্ধে অপর দুইজন ধর্মপ্রচারক P. Desiderius (Father Ippolito Desideri) ও Emanuel Freyre (Father Freyre)-এরও ১৭১৫ ও ১৭১৬ সালে মানস সরোবর দেখার উল্লেখ আছে। এ তথ্য নির্ভুল। Desideri ও Freyre-ই প্রথম ইউরোপীয় যাঁরা কৈলাস মানস সরোবর স্বচক্ষে দেখেন বলে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা কাশ্মীর শ্রীনগর হয়ে লাডাকে লে-তে যান। Tashigong থেকে এক Tartar—তাতার-রাজমহিষী Princess Casals-এর দলে যোগ দেন, গারটক হয়ে লাসা যান। ৯ই নভেম্বর ১৭১৫ সালে তাঁরা মানসের তীরে পৌঁছান। Desideri তাঁর এই রোমাঞ্চকর যাত্রাবিবরণী লিখে গেলেও সে-রচনা দুশো বছর পরে প্রকাশিত হয় (দ্রঃ পরিশিষ্ট)। ইনিও কৈলাস মানস সরোবরে গঙ্গার উৎপত্তি বলে ভুল করেন।

কাপ্তেন উইলফোর্ড তাঁর প্রবন্ধে Father Tieffenthaler-এরও নাম উল্লেখ করেন। ১৭৮৪ সালে তাঁর আঁকা তিব্বতের এক মানচিত্রে মানস সরোবর ও

রাক্ষসতাল দেখানো আছে। কিন্তু কারও কারও অভিমত, লোকমুখে-শোনা তথ্য থেকে এ-মানচিত্র আঁকা।

এই ধর্মপ্রচারকদের প্রায় একশো বছর আগে কুমায়ুনে চাঁদবংশীয় নৃপতিদের রাজত্ব ছিল (১৬৩৮-১৬৭৮)। আলমোরায় ছিল তাঁদের রাজধানী। রাজা বজবাহাদুর চাঁদ সংবাদ পান, হুনিয়া—অর্থাৎ তিব্বতীরা কৈলাস-মানস তীর্থ-যাত্রীদের নানাভাবে নির্যাতন করে। তিনি সসৈন্য উনটাধুরা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিব্বত আক্রমণ করেন। কৈলাস মানস সরোবরেও যান। ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতের ঐ অঞ্চলে প্রবেশের যতগুলি গিরিপথ—সবগুলি তাঁর দখলীভূত হয়। ভারতীয় ভোটিয়া ব্যাপারীদের নিকট তিব্বতীরা যে ট্যাক্স বা কর নিত, তার আদায় বন্ধ করেন। পরে, তিব্বতীরা ভবিষ্যতে যাত্রীদের বা ব্যবসায়ীদের উপর আর কোন জুলুম করবে না—এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আবার কর-আদায় চালু হতে দেন। কৈলাস থেকে ফিরে এসে ১৬৭৩ সালে তিনি কৈলাস তীর্থ-যাত্রীদের বিনামূল্যে খাদ্য ও বস্ত্রাদি দানের জন্য সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাম্রলিপিতে দানপত্র লিখে পাঁচটি গ্রামের রাজস্ব উৎসর্গ করে যান।

অপর দিকে চীন সম্রাটদেরও তিব্বতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ১৭১১ থেকে ১৭১৭ সালের মধ্যে সম্রাট কাঙ্ হি তিব্বতের এই অঞ্চল পরিদর্শন ও জরিপ করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন লামাদের পাঠান। এর ফলে তিব্বতের ও এই প্রদেশের এক মানচিত্রও আঁকা হয়।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে খেম্‌বো সোনাম্ গেল দিন্ (Ngor বা Ngyur গোম্ফার) কৈলাস-মানস তীর্থে আসেন এবং খোচর-পুরাণ গ্রন্থ রচনা করেন।

ইতিমধ্যে ভারতে বৃটিশদের আবির্ভাব ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জাল পেতে রাজ্য স্থাপনার আয়োজন চলে। ১৭৭৪ সাল। ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে জর্জ বোগ্‌লে নামে এক ইংরেজকে তিব্বতে পাঠান সে দেশের সঙ্গে বঙ্গদেশের ব্যবসা চলাচলের সুরাহা করবার উদ্দেশ্যে। ডাক্তার আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনও তাঁর সঙ্গে যান। বোগ্‌লে হলেন প্রথম ইংরেজ যিনি তিব্বতে প্রবেশ করেন। কুচবিহার, বক্সাদুয়ার, পারো, ফারি গিয়ান্‌ৎসে, পেনামজঙ্, সিগাৎস্-এ, নামলিঙ্ হয়ে পঞ্চেন লামার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করে ফিরে আসেন। লাসা পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হয় নি। পরে ১৭৮৩-৮৪ সালে সামুয়েল্ টার্নার দুই সহযোগী নিয়ে ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। তাঁরাও বালক পঞ্চেন লামার দর্শন পেয়ে ফিরে এলেন। লাসা যাওয়া

তাঁদেরও হয় না। প্রথম ইংরেজ লাসা যান—টমাস ম্যানিং। তিনি ছিলেন ইংরেজ সাহিত্যসেবী চার্লস্ ল্যামব্-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ল্যাম্ব্-এর সঙ্গে তাঁর যে পত্র বিনিময় হয় তার কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ক্যান্টনে কয়েক বছর কাটিয়ে চীন ভাষা শেখেন। তারপর তিব্বত যাত্রার উৎসাহ নিয়ে ভারতে আসেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে প্রতিনিধিরূপে পাঠাতে অসম্মত হওয়ায় ১৮১১ সালে একাই তিনি চলে যান কুচবিহার ও ভুটানের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে; লাসায় পৌঁছে দালাই লামার সাক্ষাৎও পান।

কিন্তু, তিব্বতের এই পূর্বাঞ্চলের ও লাসার এই সব অভিযানের কথা থাক। মানস-কৈলাস যাত্রার ইতিকথায় ফিরে আসি।

১৭৭৪ সালে পূর্বোক্ত ঐ বোগ্লের সঙ্গে কলকাতা থেকে এক হিন্দুস্থানী তিব্বতে যান। তিব্বত সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল, সেই কারণেই তাঁকে বোগ্লে ও টার্নার,—উভয় দলের সঙ্গে দোভাষীরূপে পাঠানো হয়। তাঁর নাম ছিল পুরাণগির গোসাঁই,—শুদ্ধ ভাষায় পূর্ণগিরি গোস্বামী। সেকালে এই গোসাঁই অভিহিত ব্যক্তিরা বঙ্গদেশের সঙ্গে হিমালয়ের পরপারে তিব্বত আদি প্রদেশের যে ব্যবসাবাণিজ্য চলত তার প্রধান পরিচালক বা এজেন্ট ছিলেন। পুরাণগিরের ভ্রাম্যমান জীবনের দুর্জয় সাহসিকতা এখন মনে বিস্ময় জাগায়। আনুমানিক ১৭৭০ সালে এক লামার সঙ্গে লাসা থেকে লাডাক যাবার পথে পুরাণগির যে হ্রদ দেখেন তা নিঃসন্দেহই মানস্ সরোবর। তিব্বতীরা এর নাম বলে Chu-Ma´panh—তাও তিনি জানান। সেই লামার আঁকা মানচিত্রে এই হ্রদ ও তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী অনেকটা সঠিক দেখানো হয়। রাবণ হ্রদেরও উল্লেখ তাতে থাকে। এই অঞ্চল থেকে চারটি বড় নদীর উৎপত্তি এবং তিব্বতী ভাষায় চতুষ্টয় জন্তুবিশেষের নামে তাদের উৎসমুখ,—তারও বিবরণ পুরাণগির দেন। কিন্তু, নদীগুলির নাম তিব্বতী যাত্রীদের মুখে তিনি যা শোনেন তা থেকে বোঝা যায়,—ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, ইন্ডাস্ ও সীতা। পূর্বোক্ত Capt. Wilford এর প্রবন্ধে পুরাণগিরের নাম ও প্রদত্ত তথ্যগুলি পাওয়া যায়। সে প্রবন্ধের প্রকাশ ১৮০৫ সালে। ১৭৯০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্রে পুরাণগিরের বর্ণনা আছে "this intelligent and great traveller" "who had been employed in the different stages of the business of effecting the treaty allowing us access to Bootan and Thibet."

পুরাণগির দেবনাগরীতে ডায়েরী লিখে রাখতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

ডিরেক্টররা সেই দিনলিপি অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে চেয়ে পাঠান, কিন্তু সংগ্রহ করা যায় নি।

হাওড়ায় যে ভোট-মন্দির আছে, সেইখানে তিনি থাকতেন। সেখানে তাঁর সমাধিস্তম্ভে বাঙলায় লেখা মৃত্যু-তারিখ—৩রা মে, ১৭৯৫! [A note on Puran Gir Gosain—by S. C. Sarcar. - দ্রঃ পরিশিষ্ট]

১৭৯২ সালে Jonathan Duncan পুরাণগিরকে দেখে তাঁর এক প্রতিকৃতি আঁকেন। ১৭৯৯ সালের Asiatic Researches গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ডে সেই আলেখ্য মুদ্রিত হয়। তাতে দেখা যায়, পুরাণগির ছিলেন উর্ধ্ববাহু এক সাধু এবং পুরাণপুরী নামেও তিনি অভিহিত হতেন। এই পরিব্রাজক বিচিত্রচরিত্র সাধুর বিস্ময়কর জীবনী ও অত্যাশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্ত সেই গ্রন্থে প্রকাশিত Jonathan Duncan-এর লিখিত প্রবন্ধ – An Account of Two Fakeers with their Portraits-এ পাওয়া যায়। (দ্রঃ পরিশিষ্ট)

১৮০৮ সালে Webb ও Hearsey গঙ্গা নদীর উৎস সন্ধানে ও জরিপের কাজে গঙ্গোত্রী অভিমুখে যাত্রা করেন। হিয়ারসে কিন্তু খাঁটি ইংরেজ ছিলেন না। বৃটিশ পিতা, ভারতীয় মাতা। তাঁর নাম ছিল হায়দার জঙ্ ('ইয়ং'-এ রূপান্তরিত) হিয়ারসে। এঁদেরই সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়, মানস সরোবরে গঙ্গার উৎপত্তি নয়।

এই সুদীর্ঘকাল ধরে লোকমুখে ও কাব্যজগতে মানস সরোবরের নাম এবং যাত্রীদের প্রদত্ত কিছু কিছু বর্ণনা প্রচারিত হলেও কোন প্রত্যক্ষদর্শীর স্বলিখিত নির্ভরযোগ্য বিশদ বিবরণীর সন্ধান মেলে না। ১৮১৬ সালে মানস সরোবরের ভৌগোলিক মানচিত্র সমেত এক দুঃসাহসিক ইংরেজ অভিযাত্রীর মানসযাত্রা কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয়—Asiatic Researches গ্রন্থমালার দ্বাদশ খণ্ডে, ১৮১৬ সালে (দ্রঃ পরিশিষ্ট)।

তিব্বতের ভৌগোলিক ইতিহাসে সেই লেখকের নাম অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম বৃটিশ মানস সরোবর অভিযাত্রী। উইলিয়াম মুরক্রফ্‌ট্ William Moorcroft (১৭৬৫-১৮২৫) ছিলেন পশুচিকিৎসক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করেন। পুসার পশুশালার তত্ত্বাবধায়ক—সুপারইন্টেনডেণ্ট। পশুদের নিয়েই তাঁর কারবার। ভাবতে থাকেন, দীর্ঘ লোমশ তিব্বতী ভেড়া-ছাগলের সুকোমল লোমের অত প্রসিদ্ধি, তিব্বতী টাট্টুরও বলবত্তার খ্যাতি,—মানস সরোবরের তীর্থযাত্রার অজুহাত নিয়ে চলে যাই না তিব্বতে? সেখানকার ঘোড়া-ছাগল সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। বৃটিশ-বাণিজ্যের সম্প্রসারণও এতে

হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তিনি তিব্বতের পথে রওনা হন। সঙ্গী নেন,—পূর্বোক্ত হিয়ারসেকে,—জরিপের কাজে সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে। এদিকে কোম্পানির কোর্ট উইলিয়মের বড়কর্তারা খবরটা জানতে পেরে স্তম্ভিত। সে কী! মুরক্রফ্‌ট্‌ এ কি কাণ্ড করেছে! হিমালয়ের কুমায়ুনের যে অঞ্চল দিয়ে তাকে যেতে হবে,—সে দেশ এখন গুরখা রাজ্যভুক্ত। তিব্বতও পররাষ্ট্র—হুনিয়াদের দেশ। তাদের কাউকে কোন কিছু জানানো নেই, অনুমতি নেওয়া নেই,—একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী চলল এই ভাবে! এতে রাষ্ট্রদ্বন্দ্বের সম্ভাবনা।

ওদিকে মুরক্রফ্‌ট্‌ তখন সঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন। বিদেশী সাজ-পোশাক নয়। সাহেবী নামও নয়। তীর্থযাত্রী সাধু ফকিরের বেশ। নাম নিয়েছেন,—মায়াপুরী ও হরগিরি। বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর তাঁদের অভিজ্ঞতা। ১৮১২ সালের মে মাস থেকে নভেম্বর ব্যাপী তাঁদের সেই যাত্রা। তাঁরা বদরী-নাথের পথ ধরেন। যোগীমঠ হয়ে নিতি পাশ্‌ দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন। গার্‌টক, তীর্থপুরী, দারচেন পেরিয়ে ৬ই আগস্ট তারিখে মানস সরোবরের তটে পৌঁছান। দূর থেকে কৈলাসশিখর ও রাবণহ্রদও দেখেন। এই দীর্ঘ যাত্রা-পথের বিস্তারিত বিবরণ, পাহাড়ীদের বিচিত্র আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, কাশ্মীর ও লাডাকের সঙ্গে সেকালের ব্যবসা পদ্ধতি, পার্বত্য অঞ্চলের পশুপক্ষীর বিবরণী, নদনদীর উৎপত্তি ও গতিপ্রণালী,—সব কিছুই সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা দেখেন, লিপিবদ্ধ করেন। মানস সরোবরে গঙ্গার উৎপত্তি নয়,—কোন নদীই যে সরাসরি ঐ হ্রদ থেকে উদ্গাত হয় নি,—তাও লক্ষ্য করেন। রাবণহ্রদ থেকে শতদ্রু নদীর নির্গম এবং মানস সরোবর ও রাবণহ্রদের মধ্যে এক ক্ষীণাঙ্গী জলধারার সংযোগ আছে, অসুস্থতার কারণে নিজে গিয়ে না দেখতে পারলেও লোকমুখে মুরক্রফ্‌ট্‌ সে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রায় শ'দুয়েক তিব্বতী ভেড়া ও ছাগল কিনে তিনি আবার তীর্থপুরীর পথ ধরেন। নিতি পাশ্‌ পার হন, এবং যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথ দিয়ে ফিরতে থাকেন। পথে বাঘ, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্য জন্তু দেখতে পান, সেকালে তা কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু পিপলকুঠি ছাড়িয়ে এসে জঙ্গলের এক জায়গায় এক বিশালকায় পশুর কথা শোনেন,—প্রকাণ্ড তার মাথা, ঘাড়ে তার দীর্ঘ কেশর,—বর্ণনা শুনে পশুরাজ সিংহ বলেই স্বভাবতঃ তাঁর সন্দেহ হয়। দেড়শো' বছর আগেও হিমালয়ে সিংহের বাস ছিল,—এর অনুমান থেকে তাই মনে হয়। তাহলে মহাকবি

কালিদাসও 'রঘুবংশে' তাঁর অপূর্ব হিমালয়-বর্ণনায় হয়ত নিখুঁত চিত্রই এঁকেছেন,—রাজা দিলীপ ঋষি বশিষ্ঠের ধেনুচারণে যত্নবান হলেও হিমালয়ের শোভা দেখে বিমুগ্ধচিত্ত হয়ে পড়েন, হঠাৎ শোনেন সিংহ-আক্রান্ত গাভীর সভয় কাতর আহ্বান।

মুরক্রফ্‌ট্‌রা কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছুলে নেপালী গোর্খাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ে। আধবদরীতে গোর্খা সিপাহীরা তাঁদের আক্রমণ করে। মেহেলচৌরী ছাড়িয়ে এলে ১৫ই অক্টোবর তাদের হাতে বন্দী হন। তখন প্রকাশ পায়, দাশরথী বক্‌সী নামে এক ধূর্ত পাহাড়ী নেপাল-সরকারে মিথ্যা এক রিপোর্ট পাঠায় যে মুরক্রফ্‌ট্‌ চার-পাঁচশো সশস্ত্র লোক নিয়ে নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং গোর্খারাজের বিরুদ্ধে তিব্বতী হুনিয়া ও সীমান্তবাসী মারচাদের সঙ্ঘবদ্ধ করছেন। প্রসিদ্ধ explorer কিরণ সিং-এর বাবা ও কাকা — দেব সিং ও বীর সিং এঁদের এই দুর্বিপাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নেপাল সরকারে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়ে আবেদন পত্র পাঠান। ১লা নভেম্বর তাঁদের কারামুক্তি হয়।

মুরক্রফ্‌ট্‌-এর এই মানস সরোবর যাত্রা বিবরণী এখনও পাঠকের মনে রোমাঞ্চ জাগায়।

এর চার বছর ১৮১৬ সালে Treaty of Sagauli-র বলে ইংরেজরা গাড়োয়াল-কুমায়ুন করায়ত্ত করে।

মুরক্রফ্‌ট্‌-এর অভিযানের চৌত্রিশ বছর পরের কথা। ১৮৪৬ সাল। লেফ্‌টেনাণ্ট হেনরী স্ট্রাচী—Henry Strachey—নামে আর এক ইংরেজ চলেন মানস সরোবর এলাকায়। তাঁরও সুলিখিত দীর্ঘ যাত্রাকাহিনী প্রকাশিত হয় Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ (দ্রঃ পরিশিষ্ট)।

স্ট্রাচীর তিব্বতে ঐ অঞ্চলে যাবার মাত্র পাঁচ বছর আগে ডোগরা সেনানায়ক জোরাহর সিং তিব্বত আক্রমণ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে বিজয়লক্ষ্মী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হলেও পরে তিব্বতী সেনাদের হাতে তিনি নিহত হন, ছত্রভঙ্গ তাঁর অবশিষ্ট কিছু সৈন্য পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ভারতে ফিরে আসে। তবুও, জোরাহরের অসমসাহসিকতা ও বীরত্বময় কাহিনী কাশ্মীরীদের গৌরবময় ইতিহাস। স্ট্রাচী নিজে বৃটিশ সেনাবিভাগের অফিসার, সেই কাজ নিয়েই তাঁর ভারতে আসা। কিন্তু, তাঁর তিব্বত-অভিযান বোধ করি সেই দুর্গম অজ্ঞাত দেশ সম্পর্কে তথ্য সন্ধানে। সেই কারণে হয়ত স্ট্রাচীর চোখে ডোগরা

সৈন্যদের হাতে নিরীহ তিব্বতীদের হত্যা নিষ্ঠুর বলেই প্রতীয়মান হয়। সেই শান্ত কতিপয় তিব্বতী গ্রাম। শান্তির আশ্রয়স্থল বৌদ্ধমঠগুলি। স্ট্রাচী গিয়ে দেখেন, অগ্নিদগ্ধ গ্রাম ভগ্নস্তূপে পরিণত। পথের আশেপাশে নিহত তিব্বতী পশুর মৃত দেহাবশেষ। আশ্চর্য মানবচরিত্র। লেফ্‌টেনাণ্ট স্ট্রাচী স্বচক্ষে রণাঙ্গনের সেই শ্মশানদৃশ্য দেখে মর্মান্তিক দুঃখপ্রকাশ করেন, জোরাহরের নিন্দাও করেন। শত্রুহস্তে বিনাশই তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে বলে লিখতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। জোরাহরের তিব্বত আক্রমণের ফলে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের বিরুদ্ধে তিব্বতীদের মনে যে বিরূপ ভাব জাগে, স্ট্রাচী আসকোটে পৌঁছে তার কিছু প্রমাণ পান। আসকোটে মানস সরোবর-ফেরত দুইজন সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা। স্বভাবতই তাঁদের নিকট পথের অবস্থাদি সম্পর্কে তিনি খোঁজ নেন। তাঁদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী। কালো লম্বা দাড়ি। গেরুয়া বাস। সুশিক্ষিত। বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ। মার্জিত আচরণ। সেই কারণেই হয়ত ঐ অঞ্চলের হুনিয়া-তিব্বতীরা তাঁকে শিখদের কিংবা 'ফিরিঙ্গি' গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে। তাকলাকোটে আটক করে রাখে। পরে এক হুনিয়াকে সঙ্গে দিয়ে মানস সরোবরে স্নানটুকুই করতে দেয়। হ্রদ পরিক্রমা করতে অথবা কৈলাস পর্যন্ত যেতে দেয় না। দ্বিতীয় যাত্রীটি এক 'যোগী'। ধূলিমলিন স্বল্প বেশভূষা। অপরিচ্ছন্ন। অশিক্ষিত,—'half-fool'—বোকা ভাব। অতএব, তার সম্পর্কে হুনিয়াদের সন্দেহ থাকে না, আপত্তিও করে না, কৈলাস পর্যন্ত যেতেও দেয়। স্ট্রাচীকে সে শুধু এইটুকু খবর দিতে পারে,—হুনদেশ-তিব্বত অতি সুন্দর স্থান,—যদিও সেখানে গাছ নেই,—সেরেফ পাথর আর বরফ ছাড়া কিছুই নেই।

স্ট্রাচী খবর জানতে পারেন, গত দু বছরের মধ্যে বিয়াঁস পট্টি হয়ে মানস সরোবরে পৌঁছুতে এই দুজন যাত্রী মাত্র সক্ষম হন।

খেলা, নিরপাণি, বুধি, গার্বিয়ঙ্, পার হয়ে স্ট্রাচী টিংকর ও কালী নদীর সঙ্গমে পৌঁছান। সেখানে গতানুগতিক যাত্রাপথ ছেড়ে কুন্তির দিকে এগিয়ে চলেন। কুন্তি নদী ধরে Lankpya Dhura Pass—১৭,৭৫০ ফুট—অতিক্রম করে তিব্বতে নামেন। সেদিকে Darma Yankti নদী ধরে এগোতে থাকেন। জ্ঞানিমা মণ্ডী উত্তরে রেখে পুব দিকে বেঁকে রাক্ষসতাল (রাবণহ্রদ) পৌঁছান। দূর থেকে কৈলাস দর্শন করে মুগ্ধ হন। রাক্ষসতাল থেকে মানস সরোবরে আসেন। তারপর লিপু পাশ্ হয়ে গার্বিয়াঙে ফেরেন।

স্ট্রাচী নিজে যা দেখেন ও লোকমুখে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন, তিব্বত সম্বন্ধে জানবার তার মধ্যে অনেক কিছুই অমূল্য উপাদান।

দু' বছর পরে ১৮৪৮ সালে স্ট্রাচীর ভ্রাতা লেফ্‌টেনাণ্ট Richard Strachey ও J. E. Winterbottom ও মানস সরোবর ঘুরে আসেন (দ্রঃ পরিশিষ্ট)।

মানস সরোবর অঞ্চলের উদ্ভিদ বিষয়ে এর আগে কোন কিছু জানা ছিল না। রিচার্ড স্ট্রাচী সে দেশের গাছ, লতাপাতা, চারা, ফুল, ঘাস ইত্যাদির নমুনা—স্পেসিমেন—সংগ্রহ করে আনেন। এক অজ্ঞাত দেশের উদ্ভিদ-জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার খোলেন। E. T. Atkinson-এর সুপ্রসিদ্ধ Gazetteer of the North Western Provinces—Vol. X, Ch. VIII-এ সে-তালিকা আছে। (দ্রঃ পরিশিষ্ট)

ততদিন ভারত জুড়ে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। দিকে দিকে জরিপের কাজকর্মও এগিয়ে চলে। হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ও প্রতিবেশী স্বল্প-পরিচিত তিব্বতের ভৌগোলিক তথ্যাবলী আহরণের উদ্দেশ্যে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার দূতদল পাঠানো শুরু হয়েছে। সেই কাজেই জোহারবাসী ভোটিয়া ঠাকুর নয়ান সিং ১৮৫৬ সালে সরোবর এলাকায় যান। মানস ও রাক্ষস-তালের মানচিত্র তৈরি হয়। নয়ান সিং-এর ছদ্মনাম সার্ভের দপ্তরে "পণ্ডিত A" বলে লিখিত। নয়ান সিং-এর পর আরও কয়েকজন ভারতবাসী ভোটিয়া জরিপের কাজে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে রায় বাহাদুর কিষণ সিং-এর নাম বিখ্যাত। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত তিনি মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে সার্ভের কাজে ব্যাপৃত থাকেন এবং ফেরবার পথে মানস সরোবর অঞ্চলেও আসেন। তাঁরও আঁকা মানচিত্র সার্ভে দপ্তরে ছাপা হয়। "A.K.Pundit" নামে তিনি তাতে অভিহিত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে Capt. H. U. Smith ও হ্যারিসন্‌ ১৮৬৭ সালে কৈলাস ও মানস সরোবর যান এবং Smith তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রচার করেন (দ্রঃ পরিশিষ্ট)।

এরপর যে ইংরেজের তিব্বত সম্পর্কে বই পাওয়া যায় তাঁর নাম A. Henry Savage Landor। খ্যাতনামা কবি Savage Landor-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ইনিও ছিলেন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী। নিজের হাতে আঁকা বহু চিত্র সমৃদ্ধ করে দুখানি বই প্রকাশ করেন—In the

Forbidden Land (1898) দুই খণ্ডে এবং Tibet & Nepal (1905) দেখা যায়. তিনি সঙ্গোপনে মানস সরোবরে আসেন—প্রথম ১৮৯৭ সালে ও দ্বিতীয়বার ১৮৯৮-তে।

Landor-এর পরেই যাঁর মানস-কৈলাস তীর্থযাত্রা কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ, তিনি এক জাপানী। একাই কাওয়াগুচি—Ekai Kawaguchi। এই বোধ হয় সর্বপ্রথম জাপানীর তিব্বত যাত্রা। শুধু তাই নয়। যুগ-যুগান্তর ধরে শোনা যায় সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, মহাত্মা, ধর্মপ্রচারকদের কৈলাস মানস সরোবর তীর্থ পর্যটনের কথা। কিন্তু তাঁদের স্বলিখিত যাত্রাবিবরণীর সন্ধান কচিৎ মেলে। কাওয়াগুচি ছিলেন শিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তি। অথচ, সর্বত্যাগী বৌদ্ধ শ্রমণ—ভিক্ষু। তাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাধুর দৃষ্টিতে দেখা এই তীর্থপথের কাহিনীর বৈশিষ্ট্য আছে। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে জাপান থেকে তিনি যাত্রা করেন। কলকাতায় এসে প্রথমে দার্জিলিং যান। তারপর কলকাতায় ফিরে সগৌলি হয়ে নেপালে প্রবেশ করেন। কাঠমাণ্ডু থেকে পোখ্‌রা,—তুকুচে হয়ে মুক্তিনাথ দর্শন করে তিব্বতে পদার্পণ করেন—১৯০০ সালের জুলাই মাসে। কৈলাস মানস সরোবর দর্শন করে লাসা যান। পরে Jelap La হয়ে কালিম্পঙ্-দার্জিলিং ঘুরে কলকাতায় ফেরেন। ১৯০৩ সালের মে মাসে তাঁর জাপান প্রত্যাবর্তন।

এই সুদীর্ঘ দুঃসাহসিক একক অভিযান কাহিনী অতীব রোমাঞ্চকর। ভৌগোলিক তথ্যগত ভুলভ্রান্তি পরিব্রাজক সাধুর বিবরণীতে অপ্রত্যাশিত নয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৈলাস মানস সরোবর দর্শনের অনুভূতি যা মনে জাগে ও বর্ণনা করেন তাও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কৈলাস দর্শন করে তিনি এই মর্মে লেখেন: চারিদিকের শৈলশ্রেণীর মধ্যে কৈলাসশিখর এমনি রাজকীয় রূপে উন্নতশির যে দর্শনমাত্রেই মনে হয় যেন স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁর পাঁচ শত শিষ্য পরিবৃত হয়ে শান্তভাবে তাঁর বাণী প্রচার করেন।

তেমনি, মানস সরোবর সম্পর্কেও লেখেন, সংস্কৃতে এই হ্রদকে বলে অনবতপ্ত—যে হ্রদের জলরাশি উত্তাপহীন, উদ্বেলবিহীন। আর্যবুদ্ধ-অবতংশনাম—মহা-বৈপুল্য সূত্রে এই হ্রদের কাহিনী লিপিবদ্ধ,—যার কাব্যময় রূপ Kegon-এর Gospel-এ। এই অনবতপ্ত হ্রদের মধ্যে মানবদেহের সর্বরোগহর ফলধারক এক বৃক্ষের অবস্থিতি। স্বর্গের দেবতা ও ধরার মানুষ সকলেই এই ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন। এই হ্রদের বুকে প্রস্ফুটিত সহস্র কমলে বোধিসত্ত্বগণ ও স্বয়ং

বুদ্ধদেব ধ্যানাসীন থাকেন।

এই বর্ণনা পড়লে মনে আসে হিন্দুধর্মমতেও প্রবাদ, ব্রহ্মা আপন মানস থেকে এই হ্রদের সৃজন করে নিজে রাজহংসের রূপ ধরে হ্রদের সুনীল সলিলে বিচরণ করেন। হ্রদের মধ্যখানে কল্পতরুর অবস্থান,—এখানে তপস্যার ফলে যা কিছু কাম্য সবই লাভ হয়।

কাওয়াগুচির যাত্রাকাহিনী Three years in Tibet নামে পুস্তকাকারে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯০৪ সালে Major Ryder ও Capt. Rawling মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল দেখে আসেন।

পরের বছর—১৯০৫ সালে আলমোরার ডেপুটি কমিশনার C. A. Sherring তিব্বতীদের সঙ্গে ব্যবসাদি পরিচালনার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বন্ধুত্ব স্থাপনার উদ্দেশ্যে কৈলাস মানস সরোবর অঞ্চলে যান। সঙ্গে থাকেন Dr. T. G. Longstaff। তাঁরা লিপুলেখ পাশ্ দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন; ফিরে আসেন কুঙ্রী, বিঙ্রী, উন্টাধুরা পাশ্ দিয়ে। লঙ্স্টাফ্ প্রসিদ্ধ পর্বতারোহী ছিলেন। দু'জন আলপ্স-অঞ্চলের সুদক্ষ গাইড্—দুই ভাই Alexis ও Henri Brocheral—এঁদের সঙ্গে যান। লঙ্স্টাফ্ তাঁদের নিয়ে গুরলা মান্ধাতা শিখরে (২৫,৩৫৫ ফুট উঁচু) ওঠবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, হিমানী-সম্প্রপাত—Avalanche-এর কারণে তাঁদের অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয় না, শিখরদেশের সামান্য নীচে থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ১৯০৬ সালে Sherring-এর Western Tibet and the British Borderland নামে মূল্যবান তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। Longstaff ও তাঁর গুরলা অভিযানের বর্ণনা দিয়ে তাতে এক অনুচ্ছেদ লেখেন। পরে ১৯৫০ সালে Longstaff-এর This my voyage বইখানিতেও তাঁর যাত্রাবিবরণী পাওয়া যায়।

এর পরেই যে অসমসাহসী অভিযাত্রীর নাম মানস সরোবর ও কৈলাস অঞ্চলের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তিনি সুইডেনবাসী সুবিখ্যাত পরিব্রাজক ও ভূগোলজ্ঞানসন্ধানী Sven Hedin। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার বহু স্থানে হেডিন্ ভ্রমণ করেন। কৈলাস মানস সরোবরেও যান। তাঁর এই দুর্জয় অভিযানকাহিনী সুললিত ভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর তিন খণ্ডে প্রকাশিত বিরাট গ্রন্থ Trans-Himalaya ভ্রমণ-সাহিত্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তাঁর Southern Tibet গ্রন্থও বহুবিধ তথ্যপূর্ণ

তিনিও তিব্বতের নানাপ্রকার চারা, ফুল, তৃণ ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করেন। Southern Tibet-এ তার তালিকা মুদ্রিত। শুধু কি তাই? তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অসীম। সাহস ও উৎসাহ ছিল অদম্য। মানস সরোবর অঞ্চলে দু মাসের উপর কাটান। হ্রদের জলে ক্যানভাস-এর নৌকা ভাসান। সারা রাত জলবিহার করেন। মানসসরসীর সুনীল বক্ষ থেকে সূর্যোদয় দেখেন। তার অপূর্ব বর্ণনা দেন। কয়েকদিন নৌকা চড়ে ঘোরেন,—হ্রদের দিকে দিকে। জলের গভীরতা মাপতে থাকেন। ২৬৮·৪ ফুট পর্যন্ত গভীরতা পান।

মানস সরোবর ও কৈলাসের আলোকচিত্র ও আঁকা রঙিন ছবি হেডিনের গ্রন্থেই আমি প্রথম দেখি। জন্ম আমার বই-এর রাজ্যে। পিতৃদেবের ছিল বিশাল গ্রন্থাগার। সেকালের বিরাট অট্টালিকা। ঘরের পর ঘর। প্রকাণ্ড হলঘর। টানা লম্বা-বারান্দা। সর্বত্রই বই-এর র‍্যাক, সারি সারি আলমারি, টেবিলেও স্তূপীকৃত বৃহদাকার সচিত্র গ্রন্থরাজি। সেই বই-এর গহনবনে আমার শিশুকালের লুকোচুরি খেলা, একটু বড় হতেই তার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। সেইখানে সোয়েন হেডিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। মানস সরোবর কৈলাসের সঙ্গে বই-এর পাতায় চাক্ষুষ পরিচয়। আজও মনে পড়ে প্রথম দর্শনেই মনের মধ্যে সে কী অপূর্ব শিহরণ। তখন থেকে স্বপ্ন দেখা, যেতেই হবে সেইখানে। সোয়েন হেডিনের বইগুলি সেই থেকেই আমার সাথী।

মানস সরোবর, রাক্ষসতাল ও কৈলাস অঞ্চলে যে চারটি বিশাল নদী—ব্রহ্মপুত্র (তিব্বতে সাঙ্‌পো) শতদ্রু, ইনডাস্ (সিন্ধু) ও কর্ণালীর উৎস, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণী প্রথম পড়ি সোয়েন হেডিনের গ্রন্থে। তাঁর সেই সকল ভৌগোলিক তথ্যাবলী ও অভিমত বহুদিন যাবৎ সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে ভূগোল-বিজ্ঞানী-মহলে গ্রাহ্য থাকে।

কৈলাস মানস সরোবর অঞ্চল সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের রচিত এই সকল অমূল্য তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ থাকলেও ভারতীয় পর্যটক বা সাধু-সন্ন্যাসীর লিখিত সেকালের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ কয়েকটি মাত্র আমার চোখে পড়েছে। সোয়েন হেডিনের প্রায় সমসাময়িক এক মহাত্মার কৈলাসভ্রমণ কাহিনী বহু বছর পরে প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে ভগবান শ্রীহংস নামে এক সাধু ঐ অঞ্চলে যান। আপন মাতৃভাষা—মারাঠীতে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন। পরে তাঁর শিষ্য পুরোহিত স্বামী তার ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড থেকে সেই বই Holy Mountain নামে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত আইরিশ কবি

W. B. Yeats তার মুখপত্র লেখেন। ভগবান শ্রীহংসের বিবরণীতে ভৌগোলিক তথ্য সম্পর্কে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলেও স্বামিজীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা ঘটনার ও আপন অনুভূতির কয়েকটি অলৌকিক কাহিনীর বিবৃতি তাতে আছে।

বৃটিশ-শাসিত ভারতে সাম্রাজ্য-রক্ষার উদ্দেশ্যে তিব্বতের প্রতি গভর্ণমেণ্টের যেমন সতর্ক দৃষ্টি থাকে, তেমনি সীমান্তবাসী ভোটিয়াদের সঙ্গে তিব্বতীদের ব্যবসা-বাণিজ্যও যাতে নির্বিবাদে চলে সেদিকেও সরকার নজর রাখেন। এই কারণে গাড়োয়াল-কুমায়ুনের সাহেব ডেপুটি কমিশনাররা তিব্বতের সঙ্গে যোগা-যোগ রেখে চলেন। সুযোগ-সুবিধা পেলেই ঐসব অঞ্চলে পরিদর্শনেও যান। ১৯০৮ সালে Cassels I. C. S. এবং ১৯১১ সালে Stiffe I. C. S. কৈলাস মানস সরোবর ঘুরে আসেন।

অপর দিকে, পুণ্যকামী সাধু-সন্ন্যাসীদের যাত্রাও চিরাচরিত ভাবে চলতে থাকে। এই সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন স্বামিজীর এই দুর্গম তীর্থযাত্রার কথা শোনা যায়। স্বামী অভেদানন্দ তিব্বতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন, কৈলাস ও মানস সরোবরেও নিঃসন্দেহ গিয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর মানস সরোবর কৈলাস যাত্রার স্বলিখিত কোন বিবরণ পড়েছি বলে আজ মনে পড়ে না, আছে কিনাও জানি না। স্বামী অভেদানন্দের "কাশ্মীর ও তিব্বতে" এবং "পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ" গ্রন্থ দু'খানিতে কৈলাস-মানস অঞ্চলের বর্ণনা পাই নি। স্বামী অখণ্ডানন্দের "তিব্বতের পথে হিমালয়ে" বইখানির প্রথম সংস্করণে এবং উদ্বোধনে ধারাবাহিক প্রকাশিত "তিব্বতে তিন বৎসর" প্রবন্ধে কৈলাস-যাত্রার বিবরণ নেই। তবে, "তিব্বতের পথে হিমালয়ে"র দ্বিতীয় সংস্করণে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর (পূর্বাশ্রম নাম গঙ্গাধর) পত্র প্রবন্ধ ও কথোপকথন থেকে সঙ্কলিত একটি অধ্যায় পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়। সেখানে তাঁর কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর যাত্রাকাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

বাঙ্লা ভাষায় কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা বিষয়ক তীর্থযাত্রীর স্বলিখিত বিস্তারিত প্রাচীনতম বর্ণনা, আমি যতদূর পেয়েছি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় "সাহিত্য" পত্রিকায় (দ্বাদশ বর্ষ, ১৩০৮ সাল)। প্রবন্ধের নাম "হিমারণ্য", —রচয়িতা স্বামী রামানন্দ ভারতী (দ্রঃ পরিশিষ্ট)। যাত্রাকাল—১৩০৫ সাল। যাত্রাপথ,—যোশীমঠ থেকে হোতি পাশ্, 'ত্রেতাপুরী' (তীর্থপুরী)—দারচিন

—কৈলাস পরিক্রমা—মানস সরোবর—"তকলাখার" (তাকলাকোট)—"খুজরুনাথ" (খোচরনাথ)। প্রবন্ধটি সুলিখিত ও তথ্যবহুল।

স্বামী সত্যদেব পরিব্রাজক ১৯১৫ সালে কৈলাস মানস দর্শনে যান, হিন্দীতে একখানি বই-ও লেখেন শুনেছি। হিন্দীতে এইটি প্রথম প্রকাশিত এ-পথের যাত্রা বিবরণপূর্ণ গ্রন্থ কিনা জানি না।

বাঙলা ভাষায় কৈলাস মানস সরোবরের বর্ণনা গ্রন্থাকারে যাঁর লেখায় আমি প্রথম পড়ি, তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর "সঙ্গীমহাশয়" ছিলেন সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী। এঁদের যাত্রাকাল ১৯১৮ সাল। মাসিক পত্রিকায় স্বতন্ত্র যাত্রাবিবরণী ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার পর এঁদের দুখানি বই বার হয়। ১৯২৪ সালে সত্যচরণ শাস্ত্রীর "কৈলাস যাত্রা" এবং ১৯৩৪ সালে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর।" প্রমোদকুমার এককালে নিছক পরিব্রাজকই ছিলেন না, এখনও তিনি স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী। তাঁর বইখানি যেমন সরস সাহিত্যসৃষ্টি তেমনি তাঁর নিজহাতে আঁকা রেখাচিত্রসমৃদ্ধ।

সাম্প্রতিককালে প্রায় প্রতি বছরই কৈলাস মানস সরোবর যাত্রীদলের নাম শোনা যায়। তাঁদের মধ্যে যাঁদের প্রকাশিত রচনা আমার জানা আছে, সেগুলিরও কিছু এখানে উল্লেখ করি।

জরিপের কার্যভার নিয়ে T. Jodh Singh Bagli Negi হিমালয়ের বহু স্থানে ঘোরেন। ১৯১৬ সালে তিনি লিপুলেখ পাশ্ দিয়ে মানস সরোবর কৈলাসও যান। ১৯২০ সালে তাঁর রচিত Himalayan Travels গ্রন্থখানি প্রকাশ হয় (দ্রঃ পরিশিষ্ট)।

১৯১৮ সালে Edwin G. Schary নামে এক অসমসাহসী আমেরিকান সাধুমহাত্মাদের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একাকী, নিঃসম্বল অবস্থায় গুপ্তবেশে কাশ্মীর থেকে তিব্বতে প্রবেশ করেন। লাডাক-লে-গারটক হয়ে কৈলাস ও মানস সরোবরের নিকট পৌঁছান, এগিয়ে চলেন পূর্ব তিব্বত অঞ্চলে। 'Gyantze'-তে পৌঁছে চুম্বি উপত্যকা দিয়ে সিকিমে গাংটকে এসে তাঁর যাত্রা শেষ হয়। তাঁর রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী যে গ্রন্থে প্রকাশ করেন তার নাম দেন,—In Search of the Mahatmas of Tibet (দ্রঃ পরিশিষ্ট)। এই দুঃসাধ্য দীর্ঘযাত্রা সত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নি, সাধুমহাত্মার তিনি সাক্ষাৎ পান নি।

১৯২২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস্. আর. কাশ্যপ লিপুলেখ পাশ্ হয়ে মানস সরোবর কৈলাস যাত্রা করেন। ফেরবার সময় জ্ঞানিমা ও খোলিং মঠ দেখে মানা পাশ্ অতিক্রম করে বদরীনাথে নামেন। সেই যাত্রায় তাঁর সহযাত্রী থাকেন অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়। এঁদের ভ্রমণবিবরণ প্রকাশিত হয় সেকালের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় ১৯২৩ সালের মে ও জুন মাসের সংখ্যায়। বহু বছর পরে,—১৯৭৫ সালে—বিজনরাজ বাবুর একখানি বাঙলা বই প্রকাশিত হয়েছে,—"স্বদেশে বিদেশে—চুরাশি বৎসর জীবন যাপন"। এতেও এই যাত্রার বিবরণ আছে।

১৯২৬ সালে অধ্যাপক কাশ্যপ দ্বিতীয়বার ঐ অঞ্চলে অভিযানে যান। এবার দরমা ভ্যালি ঘুরে জোলিঙকাঙ পাশ্ পার হয়ে কালীনদীর উপত্যকায় নামেন এবং লিপু পাশ্ দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন। ফেরবার পথে কুংরি-বিংরি, জয়ন্তী ও উন্টাধুরা পাশ্ দিয়ে ভারতে আসেন। কাশ্যপ এই সব অঞ্চল থেকে ১৩৯ প্রকার প্রজাতি উদ্ভিদের সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে ৬৪টি তিব্বত দেশে নব-আবিষ্কৃত। কাশ্যপের প্রদত্ত তথ্যাবলী Journal & Proceedings of Asiatic Society of Bengalএ—মুদ্রিত হয় (দ্রঃ পরিশিষ্ট) ;

১৯২৫ সালে স্বামী তপোবন মহারাজ নেপালের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেন এবং খোচরনাথ হয়ে মানস-কৈলাস দর্শন করেন, লিপু পাশ্ দিয়ে ফিরে আসেন। ১৯৩০ সালে তাঁর দ্বিতীয়বার যাত্রা। এবার সঙ্গে ১৭।১৮ জন মহাত্মারাও থাকেন, তার মধ্যে গঙ্গোত্রীর স্বামী কৃষ্ণাশ্রমজিও ছিলেন। এঁদের যাত্রা মানা পাশ্ দিয়ে খোলিং মঠ হয়ে ; প্রত্যাবর্তন লিপু পাশ্ দিয়ে। স্বামী তপোবন মহারাজ তাঁর হিমালয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে যান মলয়ালম্ ভাষায়। তার ইংরাজি অনুবাদ Wandering in the Himalayas (হিমগিরি বিহার) নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে।

১৯৩০ সালের আগে কোন এক বছরে স্বামী দিব্যাত্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আর কয়েকজন স্বামিজী কৈলাস মানস যাত্রা করে আসেন। ১৯৬৩ সালে "পুণ্যতীর্থ ভারত" নামে স্বামী দিব্যাত্মানন্দজীর যে গ্রন্থ প্রকাশ হয়, তাতে সেই যাত্রাবিবরণী পাওয়া যায়। কিন্তু যাত্রার বৎসরের উল্লেখ দেখি না। ১৯২৫ সালে প্রখ্যাত Orientalist অধ্যাপক Giuseppe Tucci লিপু পাশ্ হয়ে এ অঞ্চলে আসেন, মানস সরোবর ও কৈলাস পরিক্রমা করেন, গারটক ও লাডাক হয়ে ফিরে যান। তাঁর লিখিত Secrets of Tibet

প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

১৯২৬ সালে আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার Hugh Ruttledge-এর পরিভ্রমণ। সঙ্গে চলেন তাঁর স্ত্রী ও Col. Wilson। Ruttledge ছিলেন প্রসিদ্ধ পর্বতারোহী। পরে, ১৯৩৩ ও ১৯৩৬ সালের এভারেস্ট অভিযানে ইনিই নেতৃত্ব করেন। Ruttledge-এর যাত্রাবিবরণীর প্রকাশ ১৯২৮ সালে ইংলণ্ডের Geographical Journal-এ (দ্রঃ পরিশিষ্ট)। মানস সরোবর ও রাক্ষসতালের সঙ্গে যে জলধারার সংযোগ—Ruttledge-এর সঙ্গী Col. Wilson সেই প্রবন্ধের শেষে তার বিবরণ লেখেন। Ruttledge তাঁর রচনায় জানান, রাক্ষসতালের একটা দ্বীপে মথুরা থেকে আগত এক সাধু থাকতেন বলে তিনি শোনেন। শীতকালে হ্রদের জল জমে বরফ হয়ে গেলে সেই সাধুর এক বছরের আহার্য তাঁর কাছে পেঁৗছে দেওয়া হত। কিন্তু আগের বছর সেইভাবে তাঁর আহার্যসামগ্রী নিয়ে যাবার সময় খাদ্যবাহকরা তুষার-ফাটলের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারায়। সাধুরও তারপর কি হল কেউ খবর বলতে পারল না।

১৯২৭ সালে স্বামী জয়েন্দ্রপুরী, বারাণসীর এক মণ্ডলেশ্বর ২৫ জন মহাত্মাদের সঙ্গে নিয়ে এই তীর্থযাত্রায় যান। তাঁরা মানা পাশ্ দিয়ে গিয়ে লিপু হয়ে ফেরেন। এই দলের সঙ্গে এক পণ্ডিতও ছিলেন, ফিরে এসে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী হিন্দীতে লিখে প্রকাশ করেন, নাম দেন, "শ্রীকৈলাসমার্গ প্রদীপিকা"। এর পরে আমার জানা যে বইখানি, সেটি সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের লিখিত "মানস সরোবর ও কৈলাস"। প্রকাশকাল ১৯৩১। যাত্রার সাল ১৯২৯। সেই বছর কলকাতা থেকে আরও কয়েকটি বাঙালী যাত্রী দল যান। নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর মাতৃদেবীকে ঐ দুর্গম তীর্থ করিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর লেখা "The Himalayas—In and Across" বইখানিতে তার বর্ণনা আছে। বাঙালী মহিলার ঐ পথে তীর্থযাত্রার কথা ছাপার অক্ষরে এই হয়ত প্রথম প্রকাশ।

১৯৩২ সালে F. Williamson ও Ludlow-র কৈলাস মানস অঞ্চলে যাত্রার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী Himalayan Journal-এ প্রকাশিত হয় (দ্রঃ পরিশিষ্ট)।

১৯৩৪ সাল আসে।

এতদিনে আমার কৈলাস-মানস-যাত্রার আশামুকুল পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে। '১৮ সালে কেদার-বদরী দর্শন করে ফিরে আসার পর বিদ্যুৎবরণ

মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুত্বলাভের সুযোগ ঘটে। তাঁরও দেশবিদেশে ভ্রমণের অদম্য উৎসাহ। ১৯৩২ সালে তিনি এক দলের সঙ্গে মানস সরোবর ঘুরে আসেন। উন্মুখ হয়ে তাঁর মুখে সরাসরি ও পথের গল্প শুনি। যাবার উৎসাহ দুর্নিবার হয়ে ওঠে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তিনি নিখুঁত তালিকা করে দেন। আলমোরা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অনুভবানন্দজির সঙ্গে পত্রমাধ্যমে যোগাযোগ করান। এদিকে হঠাৎ ঠিক সেই সময়েই অধ্যাপক বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় মীরাট থেকে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তাঁরও কাছ থেকে খোঁজখবর পাই। বেরিয়ে পড়ি যাত্রায়। যাত্রা সাঙ্গ করে ফিরেও আসি। সেই সময়ে আমার যাত্রাকাহিনীও লিখি।

কিন্তু মুদ্রিত হয়ে প্রকাশের সুযোগ এল আজ এই তেতাল্লিশ বছর পরে।

সেই ১৯৩৪ সালের পর যতকাল তিব্বতে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত ছিল, উৎসাহী পর্যটক ও পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীদের মানস-কৈলাস যাত্রা অবাধে চলতে থাকে। তাঁদের কারো কারো ভ্রমণবৃত্তান্তও প্রকাশিত হয়।

এই সময়কার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনখানি পুস্তকের উল্লেখ এখানে করি।

সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ,—স্বামী প্রণবানন্দের। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৩৫ সাল থেকে।

স্বামী প্রণবানন্দের প্রথম কৈলাস যাত্রা ১৯২৮ সালে। কাশ্মীরের শ্রীনগর-লাডাক ও গারটকের পথ দিয়ে তাঁর যাওয়া, নিতি পাশ্ হয়ে ফেরা। এরপর প্রতি বৎসরই তিনি ঐ অঞ্চলে যেতে থাকেন,—নিত্য নূতন পথে, হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে। বৎসরের প্রায় অর্ধেক অংশ ঐ দিকেই কাটান। ১৯৩৬-৩৭ সালে একটানা পূর্ণ এক বৎসর এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ষোল মাস মানস সরোবরের তীরে গোম্ফার ভিতর অতিবাহন করেন। এদেশ থেকে নৌকা নিয়ে যান। মানস সরোবর ও রাক্ষসতালে নৌকা চড়ে ঘোরেন, হ্রদের জলের গভীরতা মাপেন। তাঁরই বর্ণনায় প্রথম জানা যায়, শীতকালে হ্রদ দুটি কি ভাবে বরফ হয়ে জমে যায়, শীতের প্রখরতা কমলে আবার কেমন করেই বা জলে পরিণত হয়। কৈলাস ও মানস সরোবরের ঐ অঞ্চলে যে চারটি বড় নদী—ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু ও কর্ণালীর উৎস সম্পর্কে Sven Hedin তাঁর মত প্রকাশ ও প্রচার করে যান,—স্বামীজী নিজে সেই সকল নদীর উৎপত্তিস্থল

দেখে আসেন, এই সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন, Hedin-এর প্রচারিত মতের তথ্যগত ভুলগুলি দেখান। ১৯৩৯ সালে Exploration in Tibet নামে এই বিষয়ে একখানি পুস্তকও প্রকাশ করেন। Survey of India স্বামিজীর আঁকা মানচিত্র নির্ভুল বলে গ্রহণ করে।

লণ্ডনের Royal Geographical Society স্বামিজীর ভৌগোলিক আবিষ্কার ও মতামতের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সমিতির সদস্য—Fellow মনোনয়ন করে নেন। এর আগের বছর—১৯৩৮ সালে স্বামিজীর Pilgrims Companion to the Holy Kailas & Manasarovar বইখানিও প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক Kailas-Manasarovar-এর প্রকাশ। ১৯৫৩ সালে হিন্দীতেও ঐ একই নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতীয় বিভিন্ন কয়েকটি ভাষায় তাঁর বই-এর অনুবাদও হয়। বাঙলা ভাষাতেও তাঁর বই-এর অনুবাদ হলেও, দুঃখের বিষয় বই আকারে ছাপা হয়ে তা প্রকাশিত হয় নি। হিমালয়-প্রেমিকদের নিকট স্বামী প্রণবানন্দের নাম একালে কৈলাস-মানস সরোবরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে থাকে।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় গ্রন্থখানির প্রকাশ—তার যুগ্ম লেখক দুই সুইস্ বৈজ্ঞানিক—প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ—Arnold Heim ও August Gansser। ভূতত্ত্ব গবেষণার উদ্দেশ্যে তাঁদের হিমালয় অভিযান। তিব্বত ভ্রমণেরও তাঁদের অভিলাষ জাগে। গভর্ণমেন্টের নিকট তিব্বত প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তবুও Gansser তিব্বতী লামার ছদ্মবেশ ধরে, এক শেরপা সাথী নিয়ে ভোটিয়া ব্যবসায়ীদের দলে যোগ দেন, তিব্বতে প্রবেশ করেন। কৈলাস মানস সরোবরও দেখে আসেন। বৈজ্ঞানিক Gansser-এর মনে ধর্মভাবের প্রভাব না থাকা স্বাভাবিক। অথচ, কৈলাসশিখর দর্শনে তাঁর মনে যে আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হয়, তাঁর বর্ণনার মধ্যে তা ফুটে ওঠে। তিনি লেখেন: "The fundamental idea of Asiatic religions is embodied in one of the most significant temples I had ever seen, a sunlit rock and ice! Its remarkable structure and peculiar harmony of its shape, justify my speaking of Kailas as the most sacred mountain in the world...the holiest mountain in the world and the sublime Throne of the Gods." তিনি কৈলাস পর্বতের ভূতত্ত্বগত সৃষ্টিরহস্য ও গঠনবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন।

আবার তাকিয়ে দেখেন, তাঁর সঙ্গী শেরপা পাল্‌ডিন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কৈলাসের উদ্দেশে প্রণাম করে তাঁর পানে সপ্রশ্ন নির্বাক দৃষ্টি ফেলে। বৈজ্ঞানিক বিজাতীয় বিধর্মী Gansser সেই বাক্যহীন প্রশ্নের উত্তর দেন,—না পাল্‌ডিন। ঐ পর্বত তোমার নিকট যেমন, আমার কাছেও তেমনিই পবিত্র। মুহূর্তআগে ঐ যে দুজন লামা যাত্রী চলে গেলেন, আমিও তাঁদেরই মতন তীর্থযাত্রী। তাঁদের মত, তোমারও মত, আমিও ঐ বিস্ময়কর পূতাত্মা গিরিবরের অরূপ রূপের সন্ধানী।

এই বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের যাত্রা ১৯৩৬ সালে। যাত্রাশেষে ফিরে এসে তাঁরা জার্মান ভাষায় যে বই লেখেন তার নাম দেন—Thron der Gotter। ১৯৩৯ সালে তার ইংরাজি অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হয়—The Throne of the Gods—দেবগণের রাজাসন। বইখানি অতি সুন্দর আলোকচিত্রে অলঙ্কৃত।

সেই একই বৎসরে—১৯৩৬ সালে অস্ট্রিয়ান্ ভূতাত্ত্বিক Herbert Tichy সাধু সেজে গুপ্তভাবে ঐ অঞ্চলে যান। তাঁর বই-এরও নাম দেন—The Holiest Mountain!

এমনি সর্বজনপূজ্য অপার্থিব সৌন্দর্যময় কৈলাসশিখর।

তাঁরই পুণ্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় 'যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী'।

সেই যাত্রীদলের পদানুসরণে আমারও তীর্থ-পর্যটন "যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে"।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। উ. প্র. মু.

কৈলাস

ও

মানস সরোবর



পূর্বপৃষ্ঠায়
মানস সরোবর

পাশে
কালী নদী

নীচে
নিরপানির
পথে
ভেড়ার পাল







কিচ্—রুকুমসিং—রঞ্জন



গার্বিয়াঙে

অনুভবানন্দজি, কিচ্ ব্রহ্মচারীজি, রুকুমসিং, সুধীর, রঞ্জন, সুরেন্দ্র মহারাজ



ডুডুঙ্ উৎসবে সজ্জিত ইয়ক্



নাস্তির অরণ্যপ্রান্তে



লিপুলেখের তুষার-রাজ্যে

(সুমুখে) অনুভবানন্দজি, ব্রহ্মচারীজি, (উপবিষ্ট), সুধীর, ভান্‌সিং,

(পিছনে) অন্য যাত্রীরা

পাশে
ঝব্বু পৃষ্ঠে
তিব্বতী

নীচে
গুরলা মান্ধাতা
ও
মানস সরোবর

ডানদিকের পৃষ্ঠায়
প্রদক্ষিণ পথে
বৌদ্ধ চোরটেন
ও কৈলাস









কৈলাস

প্রথম অধ্যায়

কলকাতা—আলমোরা

(২রা জুন—৬ই জুন, ১৯৩৪)

॥ ১ ॥

অজানা পথের প্রবল আকর্ষণ বহুবার আমাকে পথে টেনেছে। সে কি আজ আবার সত্যই আমাকে বাড়িছাড়া করে এবার কৈলাস-তীর্থপথে টেনে নিয়ে চলে? সত্য হতে চললেও মন যেন বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ, এই ত কিছুক্ষণ আগে পরম আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ভয়কুণ্ঠিত গোপন অশ্রুধারার বিনিময়ে মুখের কোণে করুণ হাসির রেখা টেনে বিদায় নিয়ে এসেছি। তাঁদেরই শুভ আশীর্বাদ ও মঙ্গল ইচ্ছার রূপ ধরে ঐ ত চোখের সুমুখে ফুলের মালাগুলি এখনও দোলে।

ই, আই, আর, পাঞ্জাব মেল সবেগে ছুটে চলে। আলোকিত কামরার জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকি। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার। তারই বুকে চকিতে ফুটে ওঠে দু'একটা আলো। দেখা দিয়ে যেন সভয়ে পালায়। আকাশেও কালো মেঘের খেলা। তারই ফাঁকে সাথীহারা একটি তারার ক্ষীণ দৃষ্টি। ট্রেনের সঙ্গ পেয়ে সেও ছোটে। আমার অচিন পথের সেও কি সাথী হতে চায়?

গাড়ীর ভিতর তাকাই। একমাত্র সহযাত্রী সুধীরের উপর দৃষ্টি পড়ে। সে আমার সম্পর্কে ভাই। সমবয়সী। আবাল্যবন্ধু। সেও ওদিকের জানালার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বহুবিধ অভয়বাণী দিয়ে এই দুর্গমপথে তাকে সঙ্গী পেয়েছি। তার বহির্মুখী চিত্ত দ্বিধাজড়িত চরণে তাকে বার করে আনে। হিমালয়-পথের সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয়ের উপর সে নাকি অনেকখানি নির্ভর করে। অথচ, সে-পরিচয়পত্র এতই তুচ্ছ, যে তারই উপর ভরসা করে সেই মহান্ গিরিরাজের দরবারে উপস্থিত হতে আমারই সঙ্কোচ বোধ হয়।

কলকাতা থেকে কাঠগোদাম,—দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা। দু'রাত,—মাঝে এক সারাদিন। এখন ভাবি, এ আর কতটুকু? তারপর ত সুরু হবে হিমালয়ের পথে সেই অভিনব জীবন যাত্রা। প্রতিদিন এগিয়ে চলা। নিত্যনূতন স্থানে রাত্রিবাস। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম। দুরূহ চড়াই উৎরাই। দুর্গম গিরিপথ। হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে প্রবেশ,—তবে হবে মানস সরোবর-

কৈলাস দর্শন। কতদিন যাবে,—কেমন ভাবেই বা যাব? যাব নিশ্চয়ই;—সাগরতরঙ্গের মতন এইসব ভাবনা ওঠে মনে। নিজস্ব 'বার্থে' আরামে শুয়েও চোখে ঘুম নামে না। সারারাত ট্রেনের সশব্দ গতির তালে পা ফেলে অনেকগুলি মুখ, অনেক এলোমেলো চিন্তা ভিড় করে স্বপ্নপুরীর মাঝে যাতায়াত করতে থাকে।

॥ ২ ॥

রেলপথের বৈচিত্র্যময় দৃশ্যাবলী। কত নদ-নদী, গ্রাম-শহর, দেশ-দেশান্তর, মাঠ তেপান্তর,—পার হয়ে ট্রেন ছোটে। বড় স্টেশন আসে। গাড়ী থামে। যাত্রীদল ওঠে, নামে। প্ল্যাটফর্মে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকজনের ছোটাছুটি, হইচই, শশব্যস্ততা। আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ধরা দেয় না। দুজনে তন্ময় হয়ে গল্প করি নিজেদেরই যাত্রা নিয়ে।

সুধীর বলে, অবাক হয়ে যাচ্ছি, কীভাবে হঠাৎ চলে এলাম আমি! কদিন আগেও ভাবতে পারি নি, কৈলাস মানসসরোবর যাওয়ার ভাগ্য হবে আমার! কেদার-বদরী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী,—হিমালয়ের কোথাও যাই নি,—একেবারে ছুটেছি কৈলাসে। পারব তো? কিছুই সঙ্গে আনা হোল না। পথে কি কি দরকার হবে তাও জানি না,—আছে শুধু খানকয়েক গরম জামা-কাপড় আর তিনখানা কম্বল—

বলি, চল্ তো। ব্যবস্থা সবই হয়ে যাবে। বেরিয়ে যখন পড়েছি,—দর্শন করে ফিরেও আসব নিশ্চয়। সুধীর বলে, কীভাবে ছাড়া পেয়ে এলাম, ভাব্‌তেই পারি না,—এই ত ক'মাস আগে বিয়ে! ছাড়া পাওয়া কি সহজ ব্যাপার? অথচ, কৈলাস যাওয়ার এমন সুযোগ,—জীবনে আর কখনও কি পাব? সংসারের ঘানিটানা সে ত জীবন ভোর চল্‌বেই—

বলে জানালার বাইরে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

আমার কিন্তু মনে পড়ে মায়ের মুখখানি। কোনমতেই তাঁর অনুমতি পাই না। বলেন, মত দেব, আমাকেও যদি সঙ্গে নিয়ে যাও। তাঁকে বোঝাই, ও-পথ তোমার কেদার-বদরীর মত নয়। অতি ভীষণ, দুর্গম। ডাণ্ডী, কাণ্ডি চলে না, বরফের ওপর দিয়েও চলতে হবে। আর তিব্বতের শীত? সে নাকি দুর্জয়, শুনি,—এমন ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া, চামড়া ফাটিয়ে রক্ত বার করে দেয়। তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে?

মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, তবে তুমিই বা যাবে কি করে ?

বলি, তোমার আশীর্বাদ নিয়ে। আমার জন্মে মোটেই ভেব না।

তারপর হেসে চুপিচুপি বলি, আমি ত, মা, তোমার পাহাড়ী ছেলে। ভুলে গেলে ? তোমার কোলে এলাম কবে ? সেই বিজয়াদশমী,—বিকেলবেলা। প্রতিমা-বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলেছে,—ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে। কৈলাসে ফিরে চলেছেন মা দুর্গা,—মনে নেই তোমার ? তখনি ত রেখে গেলেন আমাকে তোমারি কাছে। আর তখন আমার কানে কানে বলে গেলেন কি, —বলি নি বুঝি তোমায় ?—"আমার মতনই দেখতে এমন মা দিলাম তোকে, দেখিস্ যেন এই মাকে পেয়ে ভুলিস্‌নে আমাকে, আসিস্ যেন আমারও কাছে মাঝে মাঝে হিমালয়ে"—তাই ত মা, আমার যাওয়া। দাও, মা, এখন হাসিমুখে কদিনের ছুটি।

মায়ের টানা-টানা চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। দেবী-প্রতিমার মত রাঙা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিও ফোটে। রোদের মাঝে ঝিকিমিকি বৃষ্টি যেন ঝরে।

আমি কিন্তু জানি, মায়ের প্রাণের গোপন ভাবনা কোথায়। পথের দুর্গমতায় নয়। তাঁর চোখের জলের কারণ,—ছেলে আমার কৈলাস গিয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, আর ঘরে না ফেরে। মুখ ফুটে সে কথা কিন্তু বলি না। বলি, মা, এবারের মত অনুমতি দাও। তোমার আশীর্বাদ পেলে ভয়টা আমার কীসের ? নিশ্চিত থাক, ফিরে আসব নিশ্চয়। এই ত কটা দিন, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর, তোমাকে নিয়ে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-দর্শন করিয়ে আনব।

অবশেষে অনুমতি পাই। যাত্রার আয়োজনও চলে।

ট্রেনে বসে এই সব কথাই মনে পড়ে। সুধীরকে বলি, তোর আসা হঠাৎ-ই বটে, আমার অথচ বহুকালের স্বপ্ন সফল হতে চলে। কৈলাস-যাত্রার ইচ্ছা,— সেই কবে থেকে। একটা ঘটনা বলি। বছরখানেক আগের কথা। খবরের কাগজে দেখি, দিল্লীতে এক হিমালয়-অভিযাত্রী-সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা চলেছে। উদ্যোক্তা,—যোশী নামে এক ব্যক্তি। তখনি চিঠি লিখি। সেই সমিতির সভ্য হয়ে যাই। কিছুদিন পরে খবর আসে, সমিতির পক্ষ থেকে প্রথম অভিযান হবে, কৈলাস-মানসসরোবর যাত্রা। যোশীকে লিখে জানতে চাই, যাত্রার কিভাবে আয়োজন হচ্ছে, দলে কারা থাকবেন ইত্যাদি। কদিন পরে হঠাৎ যোশী সশরীরে ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। কাঁধে রুকস্যাক্।

পরনে খাঁকি হাফ্‌প্যাণ্ট, হাফসার্ট। মূর্তিমন্ত ট্যুরিস্ট। তখন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। দিল্লীর ছেলে। পড়াশুনা ছেড়ে এখন এই নিয়ে মেতেছে। অসীম উৎসাহ। জানায়, সমিতির সভ্য কয়েকজন হয়েছেন। তাদেরই মধ্যে থেকে অভিযাত্রী দল গড়া হচ্ছে। আমার নামও তাতে আছে। যোশী নিজে দলনেতা। খরচার টাকাকড়ি সংগ্রহের ব্যবস্থা চলেছে। এই প্রথম ভারতীয় হিমালয়-অভিযান—মাউন্‌টেনিয়ারিঙ্‌ এক্‌স্‌পিডিশন্‌—ফলাও করে কাগজে ইতিমধ্যে তার প্রচার-কার্যও স্থরু হয়েছে। গত বছরে বৃটিশদের এভারেস্ট এক্‌স্‌পিডিশনের ছোটখাটো সংস্করণের অনুকরণে!

শুনে হেসে ফেলি। বলি, কিছু মনে কোরো না, এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তা ছাড়া, অনেক অযাচিত হাঙ্গামাও টেনে আনা হচ্ছে। অভিযান—এক্‌স্‌পিডিশন্‌—এই ধরনের নামের গন্ধ থাকলেই এখানকার বৃটিশ-সরকারের ও সেদিকের তিব্বত গভর্নমেণ্টের অনুমতির প্রশ্ন উঠবে,—ভুলো না, আমরা স্বাধীন দেশবাসী নই,—ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দরকার কি? তীর্থযাত্রী বলে গেলে অনুমতির কোন কথা উঠবে না, বাধাও আসে না। তোমার ঐ প্রচার-কার্য ফিরে এসে কোরো। কৈলাস-মানসসরোবর যাওয়াটাই যদি উদ্দেশ্য থাকে, চল যে যার খরচা দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি, সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যোশী একথা মানতে চায় না।

অতএব, আমিও তাকে জানিয়ে দিই, তাদের দলে যোগ দেওয়া আমার সম্ভব হবে না। আমি যাই ত একাই যাব। ক্ষুণ্ণ হয়ে যোশী ফিরে যায়।

মনে মনে ভাবি, ভালই হোল। সম্পূর্ণ অপরিচিত দল। কেমন সব সহযাত্রী হোতো জানা নেই।

হিমালয় যাত্রাপথে মনোমত ভাল সঙ্গী না হলে যাত্রার আনন্দ হারাতে হয়।

স্থধীর জিজ্ঞাসা করে, যোশী আর যোগাযোগ করে নি?

বলি, দিল্লী ফিরে আরও দু-একটা চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের দলে যোগ দিতে কোনমতেই রাজি হই নি। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, গভর্নমেণ্টের অনুমতি না নিয়ে তারা এক্‌স্‌পিডিশন্‌-এ যেতে পারবে কিনা। এদিকে আমার অন্য স্থযোগ স্থবিধে এসে গেল। ততদিন বিদ্যুৎবরণবাবুর সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব জমেছে। একসঙ্গে ওকালতি করছি, নিত্য দেখাও

হচ্ছে। দু বছর আগে তাঁরা ক'জন মিলে কৈলাস-মানস ঘুরে এসেছেন। আমার যাবার আগ্রহ শুনে তিনিও প্রচণ্ড উৎসাহে মেতে ওঠেন। বলেন, কিছু ভাববেন না আপনি, সব তোড়জোড় আমি করে দিচ্ছি,—যান্ ঘুরে আসুন,—আলমোরায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অনুভবানন্দজিকেও চিঠি লিখে আপনার যাবার কথা জানাচ্ছি। সেখান থেকেও সব ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন,—কোন ভাবনা না করে আপনি তৈরি হয়ে পড়ুন রওনা হবার জন্যে।—

ট্রেনের কামরার মধ্যে জড়-করে-রাখা একরাশ মালপত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি, ঐ যে প্রকাণ্ড কিট্-ব্যাগ ভরতি জিনিসপত্র চলেছে,—ও সবই বিদ্যুৎবাবুর লিখে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী। হিমালয়ের পথে এদিকের গ্রামের মধ্যে কখনো কখনো কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভারত-সীমান্তের শেষ গ্রাম গার্বিয়াঙ্ ছাড়িয়ে যাবার পর নিজেদের যা কিছু দরকার তার সব ব্যবস্থা সঙ্গে রাখতে হয়। প্রায় দিন কুড়ি তিব্বতে থাকা, তার জন্যে খাবার-দাবার, অতিরিক্ত শীতের জামাকাপড়, বিছানাপত্র,—এ সব ত আছেই, রাত কাটানোর জন্যে কলকাতা থেকে একটা তাঁবুও সঙ্গে নিতে হয়েছে। ঐ যে প্রকাণ্ড কিট্-ব্যাগ—ঐটের মধ্যে আছে।

সুধীর আশ্চর্য হয়,—দুজনের জন্যে এত আয়োজন ?

হেসে বলি, কিন্তু দুদিনের জন্যে ত নয়। প্রায় মাস দুয়েকের ব্যাপার। আর, যাত্রা শুরু করার পর এক জায়গায় কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকাও নয়, —পথই হবে তখন আমাদের ঘর,—আজ এখানে, কাল সেখানে। স্রোতে ভেসে চলার মত,—মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যে তট ছোঁওয়া,—আবার ভেসে যাওয়া!

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, ছ'বছর আগে—১৯২৮ সালেই ত?—মাসীমাকে নিয়ে যখন কেদার-বদরী যাস্ সেও তো হৃষীকেশ থেকেই হাঁটাপথ—প্রায় সাড়ে চারশ' মাইল যাতায়াতে—তাতে এমন বিরাট আয়োজন দেখি নি ত?

বলি, তাতেও ব্যবস্থা অনেক রকম করতে হয়েছিল, সেও ত একমাসের যাত্রা। কিন্তু ওপথের মস্ত সুবিধে—দু'তিন মাইল অন্তর চটি, কোথাও বা ধর্মশালা। আর যাত্রীও চলে যেন পিঁপড়ের সারি। গভর্নমেন্টের একটা বিবৃতিতে সেবছর পড়েছি, কেদার-বদরীর মন্দির বছরের যে ছয়মাস খোলা থাকে,—সেই সময়ের মধ্যে বছরে যাত্রী যায় প্রায় ষাট্ হাজার। আর

আমাদের এই কৈলাস-মানস সরোবরের পথে ভারত থেকে বছরে মোট চল্লিশ-পঞ্চাশজনের বেশি যাত্রী যায় না,—তাও যেতে হয় মাস চারেকের মধ্যে,—জুন থেকে সেপ্টেম্বর। এর কারণ, কেদার বদরীর মন্দির হোল হিমালয়ের যে বরফের পাহাড়-শ্রেণী তারই দক্ষিণ-দেশে পায়ের কাছে। বদরীনাথ—১০,১৩৯ ফুটে, কেদারনাথ ১১,৭৫০ ফুট। আর, আমাদের এই এবারকার যাত্রায় হিমালয়ের পাহাড়ের সারি একে একে পার হতে হবে,—তারপর লিপুলেখ পাশ্ ১৬,৭৫০ ফুটের ওপর উঠে হিমালয়ের শেষ বরফের যে-পাহাড় তাও ডিঙিয়ে অপর পারে তিব্বতে নামা—সুধীর মন্তব্য করে, 'নামা' মানে, শুনেছি, তিব্বতের সেখানকার যা' ময়দান—টেব্‌লল্যাণ্ড—সেও ত তেরো চোদ্দ হাজার ফুট্-এর কম কোথাও নয়,—আর কৈলাস-পরিক্রমার সময় সবচেয়ে ওপর দিয়ে যেখান দিয়ে যাওয়া—সেই ডোল্‌মা পাশ্ হোল —১৮,৬০০ ফুট্।

বলি, যেখানে যাই হোক্, চল্‌ত,—দেখাই যাক্ কোথায় কি রকম। 'জয় কৈলাসপতি' বলে বেরিয়ে ত পড়া গেছে।

এই ভাবেই জল্পনা-কল্পনার উৎসাহের স্রোতে অলক্ষ্যে সময় বয়ে যায়। ট্রেনও ছোটে। কিন্তু অত ছুটেও দু ঘণ্টা বিলম্ব করে বেরিলি স্টেশনে পৌঁছুয় রাত আটটায়। মালপত্র নিয়ে আমাদের এইখানে নামা। বেরিলি থেকে কাঠগোদাম,—রোহিলাখণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়ের শাখা লাইন। রাত ১১টা ৩৫-এ আমাদের সেই লাইনের ট্রেন ছাড়ে।

॥ ৩ ॥

হাল্‌দোয়ানী কাঠগোদামের আগের স্টেশন। গাড়ী দাঁড়ায়। রাতের অন্ধকার তখনো কাটে নি। ট্রেনের কামরায় কয়েকজন লোক ঢোকে। দেখেই বোঝা যায়, রেলের যাত্রী নয়। মোটর চালকের দল। তীর্থের পাণ্ডার মত ধরাধরি করে, "নৈনীতাল, আলমোরা—কোথায় যাবেন? কাঠগোদামে আমার মোটর নেওয়া চাই-ই।"

বুঝতে পারি, আলমোরা থেকে স্বামী অনুভবানন্দজি 'ঘনানন্দ মোটর কোম্পানী'র কথা এই কারণেই চিঠিতে লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মন্ত্রের মতন সে-নাম স্মরণ করি।

ভোর ৫টা ৪৫। কাঠগোদামে ট্রেন আসে। রেলপথের যাত্রা শেষ হয়।

সুমুখে আকাশের অস্ফুট আলোকের পটভূমিতে হিমালয়ের বিরাট গিরিশ্রেণী জমাট অন্ধকারের রূপ ধরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। দুর্গম অজানা পথের কুহেলিকাচ্ছন্ন। তারই পাদমূলে কাঠগোদাম। যেমন, দার্জিলিঙের পথে শিলিগুড়ি, সিমলার পথে কাল্কা।

ছোট স্টেশন। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সাগর বক্ষ থেকে ১৯৯৩ ফুট্ উঁচু। যাত্রীর ভিড় নেই। কয়েকজন নৈনীতালে বেড়াতে চলেছেন। দু'তিনজন শীর্ণকায় অসুস্থ ব্যক্তিও আছেন। হয়ত ভাওয়ালীর স্যানাটোরিয়ামে থাকবেন।

দেখতে দেখতে মোটর-চালকের দল ঘিরে ফেলে। ঘনানন্দ কোম্পানীর নাম নিই। আলিবাবার দস্যুগুহার দ্বার খোলে। জনতার মধ্য থেকে কোম্পানীর লোক এগিয়ে আসে। বলে, আপনারা স্বামিজীর লোক আছেন? —আমাকে বলে দিয়েছেন তিনি। চলে আসুন। মালপত্র কই? দেখিয়ে দিন্। বাস-এ উঠিয়ে নিচ্ছি।

সুধীর বলে, বাঃ! এ যে দেখছি এখান থেকেই অনুভবানন্দজির ব্যবস্থা সুরু!

বাস্-এ আলমোরা যাবার ভাড়া,—প্রতি যাত্রীর তিন টাকা। আমাদের অতিরিক্ত মালপত্র হওয়ায় লাগেজ ভাড়াও দিতে হোল—সাড়ে দশটাকা।

সকাল সাড়ে ছ'টায় বাস্ ছাড়ল। আলমোরা মোটর পথে প্রায় ৮৫ মাইল।

পথের দুধারে দোকানপাট, ঘরবাড়ি। লোকালয় ছাড়িয়ে এসে পাহাড় সুরু। গিরিপ্রাচীর ভেদ করে এক পার্বত্য নদী সমতলে নেমে আসে। মোটর পথ সমতল ছেড়ে সেই নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর ওঠে। গিরিরাজ যেন বাহু বিস্তার করে কোলে তোলেন। চারপাশে হিমালয়ের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। কখন সূর্যকিরণে ঝলমল করে, কখনো বা মেঘের অন্তরালে লুকোচুরি খেলে। পথের ধারে বনজঙ্গল। হঠাৎ কোথাও বা ছোট ছোট গ্রাম। এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে পথ ওঠে। মোটরও সশব্দে উঠে চলে।

বারো মাইল গিয়ে বাঁ দিকে ভিন্ন আর এক পথ পাহাড়ের অপর এক অংশে ঘুরে যায়। সেই পথে মাইল তিন গেলে নৈনীতাল শহর।

হিমালয়ের এই অঞ্চলে কয়েকটি হ্রদ আছে। সেই হ্রদগুলিকে 'তাল' বলে। নৈনীতাল তার মধ্যে প্রসিদ্ধ। ৬৩৪৬ ফুট্ উঁচুতে পাহাড়ে-ঘেরা

হ্রদের তীরে রমণীয় শৌখিন শহর। হ্রদের ধারে নৈনীদেবীর মন্দির। দেবীর নামে শহরের নামকরণ।

বাস্-এ বসে দূরে পাহাড়ের গায়ে শহরের কয়েকটা ঘরবাড়ি চোখে পড়ে।

সুধীর বলে, ফেরবার সময় শহর দেখে যাব।

বলি, এখন শুধু ভাবতে থাক,—কৈলাস-মানসসরোবর।

"মিস্টার, আপনারা কোথায় চলেছেন?"—ভাঙা ইংরাজিতে এক সহযাত্রী প্রশ্ন করেন। বাস্-এ আমরা দুজন ছাড়া আরও ছয় জন যাত্রী। তার মধ্যে চারজন দক্ষিণ ভারতীয়। তাঁদেরই একজন আমাদের পাশে বসে। সঙ্গীদের মুখপাত্র হয়ে তিনিই প্রশ্ন করেন।

সুধীর বলে, আপাততঃ আলমোরায়। সেখান থেকে কৈলাস যাবার বাসনা।

উত্তর শুনে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকান। বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, কৈ-লা-স!

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। অবিশ্বাসের হাসি মুখে ফুটে ওঠে।

বোধ করি, সুধীরের কথাতে অবিশ্বাস নয়, আমাদের কৈলাস-যাত্রার সামর্থ্যের উপরই তাঁদের অনাস্থা।

তাঁদের মধ্যে দুজনের—বিশেষতঃ প্রশ্নকর্তার সুবিপুল কলেবর রাত্রের অন্ধকারে দেখলে আতঙ্ক জাগার কথা। মসিকৃষ্ণ উজ্জ্বল বর্ণ। সারাদেহ মাংসপেশীর বাহুল্যে কঠিন। দেখতে যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। মহিষাসুরের বংশধর বলে সন্দেহ হয়। হয়ত দেশের বড় পালোয়ান হবেন।

সস্মিত বদনে করুণা মিশ্রিত স্বরে সহযাত্রী জানান, তাঁরা চারজনও কৈলাস-যাত্রী।

সুধীর একদৃষ্টে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে বলে, ভাই, ঐ রকম শরীর নিয়ে যদি এ পথের যাত্রী হতে হয় তবেই ত হয়েছে!

বলি, ভরসা এইটুকু, ওঁদের সঙ্গে কুস্তি লড়ে আমাদের পাহাড়ে উঠতে হবে না।

মোটর চলতে থাকে। আরও মাইল দশেক গিয়ে ভাওয়ালি। এখানে সরকারী টি বি, স্যানাটোরিয়াম্। পথের ধারে কয়েকটি ফলের দোকান। আপেল, নাশপাতি, পীচ্, ইত্যাদি স্তরে স্তরে সাজানো। দেখায় যেন নানারঙের ফুলের স্তবক। দোকানের সামনে ক'জন বাঙালী। চেহারা

দেখে মনে হয়, স্বাস্থ্য-নিবাসের অধিবাসী। আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন। পরস্পরে কি যেন বলাবলি করেন। ভাবি, নেমে দুটা কথা বলি। বাস্ হর্ন দেয়। নামা হয় না। তাঁরা তাকিয়ে থাকেন। চলন্ত বাস্ থেকেই মৃদু হাসির বিনিময় হয়। তাঁদের মুখের ম্লান হাসি অনেকক্ষণ চোখের উপর ভেসে থাকে।

এই ভাওয়ালি থেকে আর একটা পথ চলে যায় ভীমতালে। মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে। সেখানেও এক হ্রদ। আলমোরার পথ ধরে আমাদের বাস্ ছোটে। পাহাড়ের গায়ে পাইন গাছের বন। শুকনা খট্‌খটে বিশুদ্ধ আবহাওয়া। হঠাৎ পথের পাশে পাহাড়ী ঝরনা। দেখা দিয়ে পিছনে ফেলে আসা পথের বাঁকে লুকিয়ে পড়ে।

বাস্ পথ এবার হুড়হুড় করে নেমে যায়। গাড়ীর মধ্যে একভাবে বসে থাকার অস্বস্তি আছে। বাইরে মন-ভুলানো প্রকৃতির শোভা সে-কষ্ট ভোলাবার সম্ভার রাখে সত্য, কিন্তু, গাড়ীর ভিতর স্তূপীকৃত ছোটখাটো লটবহর গায়ের উপর বার বার ঝুঁকে পড়ে স্মরণ করায়,—তারাও আছে। পায়ের কাছে টিফিন কেরিয়ার্‌টাকে ত সোজা রাখাই এক বিরক্তিজনক দায় হয়ে ওঠে। প্রতিবার বাস্-এর আচমকা পাহাড়ে মোড় নেওয়ার সঙ্গে মাতালের মত টলতে টলতে তিনিও পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েন। ট্রেনে আসবার সময় বারাণসী স্টেশনে সুধীরের এক বন্ধুর-দেওয়া সরস চম্‌চম্‌গুলির কিছু অবশিষ্ট অংশ এখনও তার ভিতর টস্‌টস্ করে। আমাদের পায়ের জুতাগুলি ইতিমধ্যে সে রসাস্বাদনের লোভ সাম্‌লাতে পারে নি, দেখি।

অগত্যা খাবারগুলির মায়া ত্যাগ করতে হয়। গরমপানি-তে নেমে এসে বাস থামে। মলিনবাস এক পাহাড়ীকে সেগুলি দিয়ে সুধীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হেসে বলে, তীর্থের পথে দান, হয়ত কিছু পুণ্যসঞ্চয় করা গেল।

গরমপানি ছাড়িয়ে আবার বাস্ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। মাইল পনেরো যাবার পর আসে রাণীক্ষেত। ৫,৯৮০ ফুট উঁচুতে। কাঠগোদাম থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূর।

বড় শহর। বৃটিশদের সেনা-নিবাস। সাহেবরাও অনেকে বেড়াতে আসেন। তাঁদের থাকবার শৌখিন সাজানো বাঙ্‌লো, ফুলে-ভরা বাগান, খেলবার বিস্তীর্ণ ময়দান, পরিচ্ছন্ন পথঘাট,—শহরের শোভা বাড়ায়। পেট্রোল নেবার জন্য বাস্ দাঁড়ায়।

ছয় বছর আগেকার কথা মনে পড়ে।

এমনি এক সকালে কেদার-বদরীর পথচলা সাঙ্গ করে কর্ণপ্রয়াগ মেহেলচৌরি হয়ে এইখানেই সেদিন উপস্থিত হয়েছিলাম। ঐ ত দূরের বনঘেরা সবুজ পাহাড়গুলির বুকে কত দিন কত রাত্রি কী গভীর আনন্দেই না কেটেছে! সেদিন এই রাণীক্ষেতে গৃহমুখী পথক্লান্ত পথিকের শ্রান্তচরণ বিশ্রাম খুঁজেছিল। আজ আবার এইখানেই নবীন উৎসাহ ও নব উদ্যমের পাথেয় নিয়ে সুদূরপিয়াসী পথিক-চিত্ত পথ-চলার আনন্দের লোভে ছুটে এসেছে। হিমালয়ের এ এক অতিবিচিত্র দুর্নিবার আকর্ষণ।

গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী ভিক্ষার জন্য বাস্-এর কাছে এসে দাঁড়ান। কেদার-বদরীর তীর্থ করে ফিরছেন। ধূলিধূসর নগ্নপদ। মাথায় একরাশ জটা। একখানি অতিজীর্ণ কম্বল কাঁধের উপর ঝোলে। ভিক্ষা দিয়েও মন যেন ভরে না। প্রবীণ ও নবীন যাত্রীর মাঝে কোন্ এক অজানা বন্ধনের অনুভূতি জাগে।

হঠাৎ হাতের কাছে কি যেন গড়িয়ে পড়ে। চমকে উঠে দেখি, বাস্-এর গা বেয়ে উপর থেকে সরীসৃপের মত এক কালো তরল পদার্থ গড়িয়ে নামে। অনুসন্ধানে জানি, বাস্-এর মাথায় টার্পিন্ তেলের টিনগুলি এই ধারার উৎস। আমার গরমজামায় ও ওয়াটারপ্রুফে এরই মধ্যে কালিবর্ণ ছোপ ধরেছে।

বাস্-এর কর্তা বিলাতী কায়দায় অশেষ দুঃখ ও সহানুভূতি জানায়।

আর কি! রাগ করবার পথও নেই; করে লাভও নেই!

জানি, হিমালয়ের পথে এ-সব ক্ষয়-ক্ষতি হাসি মুখেই সইতে হয়।

বাস্ আবার চলতে সুরু করে। দূরে হিমালয়ের তুষার শিখর শ্রেণী সুনীল গগনে মাথা তুলে দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করে রাখে।

কিছু পরে সুমুখের পাহাড়ের গায়ে ও মাথায় আলমোরা শহরের বাড়ীগুলি দেখা দেয়। ঘন সবুজ গাছপালার মাঝে মানুষ যেন নীড় বেঁধেছে। শহর থেকে পাহাড়ের ঢালু অংশ স্তরে স্তরে নীচে নদীর উপত্যকায় নেমে গেছে। মনে হয় যেন বিশাল পাহাড় জুড়ে নীচে নদীর ঘাটে নামবার সোপানশ্রেণী। পাহাড়ের গায়ের অসমতল ভূমি চাষ-আবাদের উপযোগী করে ধাপে ধাপে সমান করা। তাইতেই এই স্তরগুলির সৃষ্টি। সেখানে কোথাও বা উৎক্ষিপ্ত গৈরিক ভূমি সদ্য হল-স্পর্শের সাক্ষ্য দেয়। কোথাও বা নবজাত শস্যের

শ্যাম-কান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ। ভুট্টা ও গমের চাষই প্রধান। নদীর নিকটবর্তী স্তরগুলিতে ও উপত্যকায় ধানের ক্ষেতও থাকে।

সামনের পাহাড়। দেখায় কত নিকট। লোকজনও স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু মধ্যবর্তী নদীর উপত্যকা পথের দুরত্ব বাড়ায়। বাস্‌পথ নেমে যায় নীচে নদীর ধারে। কোশী নদী। বাঁদিকে অপর আর এক মোটর-পথ নদীর তীর ধরে বেঁকে যায়। শুনি, সে পথ গেছে গরুড় ও বৈজনাথের দিকে। আমাদের বাস চলে কোশী নদীর অপর পারে। সিমেণ্ট বাঁধানো সুন্দর পুল। নীচে ধনুকের আকারে খিলান। নদীর ওপারে আবার চড়াই। বাস্‌ যেন পতিবাদ জানিয়ে বিকট শব্দ তুলে ঘুরে ঘুরে গা বেয়ে ওঠে।

বেলা ২টা ৪০ মিনিট। আলমোরা পৌঁছাই। ৫,৪৯৪ ফুট্‌ উঁচুতে। শহরে প্রবেশ করার মাইল দুই আগে টোল গেট। লোক পিছু আট আনা করে টোল নেয়।

অবশেষে, আলমোরার বাস্‌ স্ট্যাণ্ডে গাড়ী এসে থামে। যাত্রীরা একে একে নামতে থাকে।

সুধীর দেখায়, ঐ এক স্বামিজী বাস্‌-এর দিকে হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে আসছেন।

লোকেরা পথ ছেড়ে দেয়। বাস্‌-এর জানালার নিকটে এসে তিনি মাথা তুলে তাকান। দেখেই মনে হোল, ইনিই নিশ্চয় স্বামী অনুভবানন্দজি। তিনিও আমাদের দেখামাত্রই সাদরে বলে ওঠেন, "আসুন্‌, আসুন্‌। বাস্‌ ত বড্ড দেরি করে এল। খাওয়ার কত বেলা হয়ে গেল। রাস্তায় কষ্ট হয় নি ত? ঐ বুঝি আপনার ভাই? বেশ, বেশ! নাঃ, নাঃ,—গাড়ী থেকে নাম্‌বেন না এখন,—একেবারে হোটেলের সামনে নিয়ে চলুক।"—বাস্‌ ড্রাইভারকে গাড়ী আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেন।

বড় রাস্তার উপর "রয়াল হোটেল"। তারই সমুখে গিয়ে বাস দাঁড়ায়।

স্বামিজীর সঙ্গে যেন কতকালের পরিচয়! অথচ, এই প্রথম দেখা। কলকাতা ছাড়বার আগে দুবার পত্র বিনিময় হয়েছিল মাত্র। দেখি, স্বল্প সময়ে মানুষকে আপন করে নেবার অদ্ভুত শক্তি ধরেন।

গেরুয়া বাস। গৌরবর্ণ। দাড়ি, গোঁফ, মাথা কামানো। উজ্জ্বল চোখ দুটি থেকে যেন আলো ঠিকরে আসে। মানুষটি দেখতে ছোট, কিন্তু দেখেই বোঝা যায়, দেহে ও মনে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন। বিদ্যুৎবাবুর কাছে শুনেছি,

স্বামিজী প্রায় বছর বারো এ-অঞ্চলে আছেন, কৈলাসের পথে ধারচুলায় আশ্রম গড়ে কয়েক বছর ছিলেন, কৈলাস-মানস সরোবরও ঘুরে এসেছেন তিনবার।

তাঁরই তত্ত্বাবধানে দেখতে দেখতে সমস্ত মালপত্র বাস্ থেকে হোটেলের ঘরে এসে যায়।

স্বামিজী বলেন, এই অবেলায় স্নান করবেন না ত? খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিন, এখন দিনকয়েক এখানে আরামে কাটান। কৈলাস যাত্রার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুনে বলি, ভাবনা কিছু করি না। চিন্তার কোন কিছু থাকলেও সে দুশ্চিন্তার বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আছি, জানবেন। কিন্তু, এখানে নিতান্ত যে কদিন না থাক্‌লেই নয়, তার বেশী একদিনও থাকব না। যাত্রার জন্যে মন এখন উন্মুখ।

স্বামিজী হাসেন। বলেন, কৈলাসপতি যখন টেনেছেন, তা তো হবেই। তবুও, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে ত দুদিন লাগবে। ব্রহ্মচারীজিও এখনো এসে পৌঁছান নি। দিল্লী থেকে কাল আসার কথা।

ব্রহ্মচারীজি! গোপাল চৈতন্যদেব ব্রহ্মচারী?

মনে পড়ে, আমার যাত্রার কিভাবে সন্ধান পেয়ে কিছুকাল আগে কলকাতার ঠিকানায় তিনি একখানা চিঠি লিখে জানান্, কৈলাসযাত্রার উদ্দেশ্যে তিনিও আলমোরায় আসছেন, একসঙ্গে যেতে চান্। তখনও আমার যাত্রার স্থিরতা ছিল না। সেই কথাই তাঁকে জানিয়ে দিই।

এইটুকুই তাঁর সঙ্গে-আমার যোগাযোগ।

এখন শুনি, অনুভবানন্দজির সঙ্গেও তাঁর পত্রযোগে আলাপ। আমার এখানে আসার দিনের খবর তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।

স্বামিজী বলেন, এ-সব পথে দু'একজন সঙ্গী থাকা ভাল। প্রতি বছর আলমোরার আশ্রমে যাত্রীরা খোঁজখবর নেয়, কে কবে যাত্রায় চলেছেন,— যাতে একসঙ্গে যেতে পারে। ব্রহ্মচারীজি কাল এসে পৌঁছুন—তারপর দেখা যাবে।

ভাবি, তার চেয়ে বরং অনুভবানন্দজিকে কোনমতে দলে টানতে পারলে, কোন ভাবনাই থাকে না। কিন্তু তিনি যাবেন কেন? তিন-তিনবার ঘুরে এসেছেন।

'ভান সিং!'

স্বামিজীর আহ্বানে হাফ্-প্যাণ্ট-পরা একটি পাহাড়ী মিলিটারী কায়দায় সেলাম করে সুমুখে এসে দাঁড়ায়।

স্বামিজী বলেন, এই লোকটি আপনাদের সঙ্গে কৈলাস যাবে, ঠিক করে রেখেছি। এর আগে দুবার কৈলাস ঘুরে এসেছে। রান্নাবান্নাতেও বেশ করিতকর্মা।

এতক্ষণ জিনিসপত্র নামাবার ও গোছগাছ করার অবসরে লোকটির কর্মকুশলতার পরিচয় পেয়েছি। শুনি, আলমোরার নিকটে বাড়ি। এ-অঞ্চলের পাহাড়ীদের মত দেখতে। ছোটখাটো। মোটাও নয়, রোগাও নয়। পরিষ্কার বাঙ্‌লা বোঝে। এক মিলিটারী অফিসারের কাছে চাকরি নিয়ে কলকাতায় কিছুদিন কাটিয়ে গেছে।

অনুভবানন্দজি আমাদের থাকবার সব কিছু ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের কাজে তখনি আবার হন্‌হন্ করে চলে গেলেন। বললেন, আবার আসব। ওদিকে কাজ ক'টা সেরে আসি।

'রয়াল ফ্যামিলি'র জন্য 'রয়াল' হোটেল নয়। ছোট দেশী হোটেল। রাস্তার উপরে দোতলার ঘর। আমাদের ঘরটি থাকবার পক্ষে ভালই। খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিলে অনেক সুবিধা।

হোটেলের ঘরভাড়া দৈনিক বারো আনা। প্রত্যেক বেলার খাওয়ার জন্যও প্রত্যেকের কাছে বারো আনা করে নেয়।

বিকালে অনুভবানন্দজি আবার আসেন। তাঁদের আশ্রম দেখতে চলি। রামকৃষ্ণ কুটির। শহর থেকে কিছু দূরে। ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট এলাকার মধ্যে। নির্জন শান্ত পরিবেশ। আশ্রমের প্রাঙ্গণ থেকে বহুদূর অবারিত দৃষ্টি চলে। পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ খেলে যায়। নীচে উপত্যকায় আঁকাবাঁকা কোশীনদীর ক্ষীণ রেখা।

আশ্রমের অন্যান্য স্বামীজীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। বৃদ্ধ স্বামীজী শ্রীমৎগুরুদাস মহারাজজিরও দর্শন মেলে। মুখে শিশুর মত সরল হাসি। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় রাম মহারাজজি আমাদের আশ্বাস দেন, যাত্রার আয়োজন সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় স্যর্ জগদীশচন্দ্র বসুর শিষ্য শ্রীবোশী সেন ও তাঁর আমেরিকান্ বিদুষী স্ত্রী শ্রীমতী গার্‌ট্রুড্ ইমার্‌সন্ সেনের সঙ্গেও পরিচয় হয়। গাছপালা,

ফুল-ফল, ফসলের উন্নয়নের গভীর গবেষণায় শ্রীযুক্ত সেন আত্মনিয়োগ করেছেন। আপন অগ্রজের মতন সস্নেহে আমাকে আলিঙ্গন করেন। বলেন, কৈলাস মানসসরোবর চল্‌লে? আমাদের এতদিন এখানে থেকেও দেখ্‌তে যাওয়া হোল না,—দেখে হিংসে হয়!—যাত্রার সব ব্যবস্থা ঠিকমত হচ্ছে ত?

সকলেই দেখি আমাদের কৈলাস তীর্থভ্রমণ যাতে সহজ ও সুগম হয় তার জন্য সাহায্য করতে উৎসুক। যাত্রার আনন্দের ভাগ তাঁরাও যেন পেতে চান।

রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি। কদিন একটানা ট্রেনে ও বাস্‌-এ এই দীর্ঘ পথ আসায় দেহে ক্লান্তি নামে।

॥ ৪ ॥

ব্রহ্মচারী গোপালচৈতন্যদেব এসে পৌঁছান।

সবল সুন্দর স্বাস্থ্য। মাথায় বিপুল গেরুয়া পাগড়ী। গায়ে দামী গরম কোট। একহাতের মণিবন্ধে দেখা যায় শিখেদের মত লোহার বালা। পরনে রেশমী গেরুয়া। পায়ে ভাল স্যু-জুতা, মোজা। হাতে পিতল-বাঁধানো প্রকাণ্ড এক হিল্‌-স্টীক্‌। মুখে ধূমায়মান পাইপ্‌। ঘন কালো দাড়িগোঁফ এবং পাগড়ীর বহর দেখে পাঞ্জাবী শিখ বলে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা।

চেহারা দেখে ভাবি, তাঁর উপর ভর করে আমরা দুজনে নির্ভয়ে ও অনায়াসে দুর্গম পাহাড় পার হয়ে যাব। পথে কারও কোন রকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তার জন্য যথাসম্ভব মালপত্র নিয়ে এসেছেন। বলেন, এই যে বড় ট্রাঙ্ক দেখছেন, শুধু ওষুধে ভরতি। দিল্লীতে আমার ওষুধের বড় বাক্সটা রেখে এলাম। দেড় হাজার টাকার ওষুধ তাতে থাকে। সে-বাক্স তৈরির নকশা দেখে অনেক বড় ডাক্তার তার নকল করেছেন। এখানে শুধু হাজার টাকার ওষুধ সঙ্গে এনেছি। আরও কিছু কলকাতা থেকে আমার এক কবিরাজ বন্ধু পথে ডাকে পাঠাবেন।

অনুভবানন্দজি মৃদু হাস্য-মুখে ঘাড় নেড়ে বলেন, তা বেশ করেছেন। কিন্তু, এত ওষুধ সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি করে—এ পথে, ব্রহ্মচারীজি? সব ভেঙে-চুরে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে যে। বিশেষ দরকারী ওষুধগুলো সঙ্গে নিয়ে, না হয় বাকি—

ব্রহ্মচারীজী গম্ভীর বদনে জানান, কোনও ওষুধ এখানে রেখে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পথে কার কখন কি অসুখ হয়ে যায়, বলা যায় না। সব রকম রোগেরই ওষুধ রয়েছে তাঁর কাছে।

যাক্। ভাবি, ভালই হোল। সঙ্গে ডাক্তার নেই, পথেও পাওয়া যাবে না। একজন কবিরাজও ত পাওয়া গেল।

সারাদিন অনুভবানন্দজির সঙ্গে জিনিসপত্র কিনতে ও যাত্রার বন্দোবস্ত করতে কেটে যায়।

পথে জেলা বোর্ডের ডাকবাংলো ও সহকারী বনবিভাগের বিশ্রাম-ভবনগুলিতে থাকবার অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা শ্রদ্ধেয় রাম মহারাজ ও অনুভবানন্দজির সাহায্যে হয়ে যায়। আলমোরার ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে পথে পাটোয়ারী (গ্রামের প্রধান)-দের নামে একটা সুপারিশ-পত্রও নিয়ে রাখা হয়, পরে কাজ দিতে পারে। সাহেব ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে রাম মহারাজের পূর্ব-পরিচয় থাকায় তিনি নিজেই আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। সেখানে এক ঘটনা ঘটে। কৈলাস চলেছি শোনামাত্র সাহেব গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করেন, আপনি কি দিল্লীর যোশী নামে এক ছোকরার দলে?

রাম মহারাজ আশ্চর্য হয়ে উত্তর দেন, দিল্লীর যোশী? সে আবার কে? ইঁনি আসছেন কলকাতা থেকে,—এঁর এক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে,—চলেছেন কৈলাস-মানস সরোবর তীর্থ করতে,—ক'বছর আগে কেদার-বদরী ঘুরে এসেছেন—

—বলে আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

সাহেব তখন জানান, যোশী নামে দিল্লীর এক 'ইয়ংম্যান্' দু'তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে--তিব্বতে এক্স্‌পিডিশন্-এ চলেছে বলে প্রচার করে। দিল্লী থেকে সরকারী নির্দেশ পেয়েছি, তাদের আটকাবার জন্যে,—আমি ভুল করেছিলাম, ইনিও বুঝি সেই দলের।

তারপর সহজেই কাজ সেরে ডেপুটি কমিশনারের চিঠি নিয়ে বেরিয়ে আসা হয়। রাম মহারাজকে তখন যোশীর গল্পটা শোনাই।

তিনি একগাল হেসে বলেন, ও! আপনার বুঝি ব্যাপারটা জানা? কি ভাগ্যিস্, ওর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন নি!

অনুভবানন্দজিকে কৈলাসপথে আমাদের সঙ্গে টানবার চেষ্টা করি। কিন্তু, কৈলাসপতি স্বয়ং না টানলে কি আর আমাদের টানে তিনি টলবেন? এখানে

তাঁর উপর নানা কাজের দায়িত্ব। শুধু আশ্রমের কাজই নয়। আলমোরা-প্রবাসী কয়েকটি বাঙালী রোগীদের দেখাশুনার ভারও তিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছেন। সারাক্ষণই সেবাব্রতে ব্যস্ত।

অতএব, তাঁর পক্ষে কোথাও যাওয়া অসম্ভব, বলেন।

পরশু—অর্থাৎ ৭ই জুন যাত্রার দিন ধার্য হয়েছে।

শুনছি, কৈলাস মানসসরোবর দর্শন করে আবার এখানে ফিরতে মাস দেড়েক লাগে। শুধু সময়ের দীর্ঘতাই নয়। পথের দুর্গমতাও আছে। হিমালয়ের একের পর আর-এক গিরিশ্রেণী। তারপর, তুষারাচ্ছন্ন গিরিবর্ত্ম। পার হয়ে, তিব্বতের চিররুক্ষ বিশুষ্ক মালভূমি। দুর্দান্ত শীত। প্রচণ্ড বাতাস। সে নাকি এক আজব দেশ। সেইখানে মানসসরোবর। আরও এগিয়ে কৈলাস।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে সুধীরের সঙ্গে এই নিয়েই আলোচনা চলে। তাকে সাহস দিয়ে মুখে বলি বটে,—'চল্ ত, পথে নামলে দেখ্‌বি কেমন ভাবে কোথা থেকে সব ব্যবস্থাই হয়ে যায়',—কিন্তু ভাবনার বোঝা মন থেকে নামতে চায় না, সিন্দবাদের সেই বুড়ার মত ঘাড়ে চেপে বসে থাকে।

॥ ৫ ॥

আজ উদ্যোগপর্বের শেষদিন। কাল সকালে আমাদের সত্যকার কৈলাস যাত্রা সুরু।

কিন্তু, এই অজানাপথে এগিয়ে চলার সব দুর্ভাবনা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে আজ রাত্রে শুতে চলি।

ভাগ্য-বিধাতা স্থির করে দিয়েছেন, অনুভবানন্দজিও আমাদের সঙ্গে যাবেন

আশ্রমের সকলে এ-বিষয়ে নানা আলোচনা করেও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তিনি নিজেও নয়। অবশেষে শ্রদ্ধেয় গুরুদাস মহারাজজির পরামর্শে লটারি করে ভাগ্য পরীক্ষা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা ভাঙে। আমাদের এই দুর্গম তীর্থপথের পার্থসারথি পেয়ে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করি।

অনুভবানন্দজি জানান, তাহলে আশ্রমের আর এক স্বামিজীও সঙ্গে যাবেন।

নাম শুনি, স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ—সুরেন্দ্র মহারাজ।

সাধুসন্তের তীর্থযাত্রা। তার আর আয়োজন কতটুকু? পা বাড়ালেই যাত্রা সুরু। একদিনেই তাঁরা ঝোলাঝুলি গুছিয়ে তৈরি। আর, আমাদের মালপত্রের বহর?

সারাদিন অনুভবানন্দজির নির্দেশ অনুযায়ী কিট্ ব্যাগ্-এ জিনিসপত্র সাজাতে কেটে যায়। কলকাতা থেকে বিদ্যুৎবাবুর পরামর্শে নতুন মজবুত কয়েকটা কিট্-ব্যাগ আনা হয়েছে। ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের তৈরি, মুখে রিং বসানো,—তালা লাগাবার ব্যবস্থা। বেশির ভাগ জিনিস এইসব কিট্ ব্যাগ্-এ যাবে। এ-পথে ট্রাঙ্ক বা স্যুট্‌কেস্ ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। যাত্রার মধ্যেই সেগুলি একেবারে ছিন্নভিন্ন, ভগ্ন, অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। দুর্গম পথের কঠোর জীবন ও মালবাহকদের অবশ্যম্ভাবী অযত্নের করুণ চিহ্ন সারা অঙ্গে এঁকে কদিনেই ট্রাঙ্ক ও ব্যাগগুলি অষ্টাবক্র মুনির অঙ্গরূপ ধরে।

তিব্বতে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। তাই সেখানে যা যা প্রয়োজন হতে পারে, তার অধিকাংশই এখান থেকে সঙ্গে চলে। পৃথক দুটি ব্যাগ্-এ সে-সব জিনিস ভরা হয়েছে। তিব্বতে পৌঁছুবার আগে সে-ব্যাগগুলি যাতে খুলতে না হয়।

পথে নিত্য ব্যবহারের জিনিসগুলির আলাদা ব্যাগ্ ও বাক্স।

এ ছাড়া আছে, জামা, কাপড়, ওয়াটারপ্রুফ্, টুপি, পেট্রোমাক্স, লণ্ঠন (কাঁচ না ভাঙে, তাই সরুতারের জাল দিয়ে ঘেরা), ক্যামেরা ও তার সাজসরঞ্জাম, 'সিনে' ক্যামেরাও, ঔষধপত্র ও অন্যান্য খুচরা জিনিস। প্রত্যেকের ছাতা, লাঠি ত আছেই। জুতারও একটা আলাদা ছোট বোঝা,—সকলের মিলে সতেরো জোড়া। চটি ছাড়া, প্রতিজনের দু জোড়া করে,—যদি পথে হঠাৎ ছিঁড়ে যায়, ভিজে ত যাবেই। ব্রহ্মচারীজির কাছে আরও দুজোড়া বাড়তি আছে। বলেন, কোথায় কখন কার দরকার হয়, কিছুই বলা যায় না। সুধীর বলে, ব্রহ্মচারীজি, আপনি থাকতে আমাদের কোন কিছুরই অভাব হবে না, দেখছি।

কলকাতা থেকে আনা বড় তাঁবুর বস্তাও আছে। তিব্বতে বালির মধ্যে ও প্রচণ্ড বাতাসে তাঁবু খাটাবার জন্য শক্ত লোহার হুক্-ও অনেকগুলি তৈরি হয়েছে, তার ভারও কম নয়।

সুধীরের ও আমার—দুজনের মোট সাতখানা কম্বল দেখে অনুভবানন্দজি হেসে বলেন, ও-তে কী হবে? এ-ধারের শীত অবশ্য কেটে যাবে, কিন্তু

তিব্বতের জন্যে দেখছি, আপনাদের থুল্‌মা (তিব্বতী ভেড়ার লোমের কম্বল) নিতে হবে। যাক্‌, সে-সব গার্বিয়াঙে পৌঁছে ব্যবস্থা হবে'খন।

সঙ্গে প্রকাণ্ড ওয়াটার্‌প্রুফ্‌ শীট্‌-ও—কলকাতা থেকে দুটা আনা হয়েছে। বিছানার তলায় বিছানোর কাজে লাগবে, ভারবাহকদের মাল বইবার সময় বৃষ্টি থেকে মালগুলিকেও কিছু বাঁচাবে।

জিনিসপত্র গোছগাছ হচ্ছে, সেন-দম্পতি এসে হাজির। মিসেস্‌ সেনের হাতে একরাশ অয়েল্‌-পেপার। বলেন, ব্যাগ্‌গুলার ভেতরে এগুলো বিছিয়ে দিন, দরকারী জিনিস সব—বিশেষতঃ ফটোর সাজসরঞ্জাম—এই দিয়ে জড়িয়ে ব্যাগ্‌-এ ভরুন। পাহাড়ের পথে কোথা দিয়ে জল ঢুকে সব নষ্ট করে, কেউ বলতে পারে না—এতে অনেকটা বাঁচাবে।

সঙ্গে চাপরাসীর হাতে ল্যাবরেটরীর কয়েকটা খালি পরিষ্কার শিশি। মানসসরোবর রাক্ষসতাল ও গৌরীকুণ্ডের জল চাই।

একটা বেতের মজবুত ঝুড়িও সঙ্গে দেন। মিস্টার সেনের জন্য গাছ-গাছড়া আনতে হবে।

জিজ্ঞাসা করি, কি গাছ আনব? আমি ত বোটানিস্ট নই।

যোশীদা বলেন, যা নতুন বা অদ্ভুত গোছের মনে হবে, তাই তুলে এতে ভরবে।

সুধীর হেসে মন্তব্য করে, শেষ পর্যন্ত কি গন্ধমাদন পাহাড় তুলে আনতে হবে?

মাল বইবার জন্য আলমোরা থেকে গার্বিয়াঙ্‌ পর্যন্ত—প্রায় দেড়শ' মাইল—পনেরোজন পোর্টার করা হয়েছে। প্রতিজন দৈনিক বারো আনা করে নেবে। প্রত্যেকে প্রায় ত্রিশ সের ওজন ভার বইবে। চারটি চড়বার ঘোড়ারও বন্দোবস্ত হয়। আমাদের তিনজনের তিনটি, স্বামিজী দুজনের জন্যে একটা,—যখন যাঁর দরকার হয়। আলমোরা থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে খেলাগ্রাম। সেই পর্যন্ত এই ঘোড়াগুলি যাবে। খেলা থেকে আবার নতুন ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পথে নোট্‌ ভাঙানো যায় না। খুচরা টাকা বইবার জন্যে শক্ত কাপড়ের থলি সমেত বেল্‌ট্‌ও দুটো নিতে হয়েছে।

বিকেলে অনুভবানন্দজি আমাকে নিয়ে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা করতে চলেন। ভান্‌ সিং সম্প্রতি তাঁর কাছে কাজ করছে।

তাঁর পরিচারককে আমাদের সঙ্গে যেতে দিতে রাজি হয়েছেন, তাই তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যাওয়াই উদ্দেশ্য। কিন্তু, পরে দেখি, না গেলেই ছিল ভাল।

ডাক্তারবাবু আমাদের দেখেই বলেন, আপনাদের যাওয়া কি একেবারে ঠিক? কয়েকদিন এখানে অপেক্ষা করে তারপর রওনা হোন্;—ওপথে যে খবর পেয়েছি, পঙ্গুর কাছাকাছি কয়েকটা গ্রামে বসন্তরোগ দেখা দিয়েছে।

বসন্তর আগমনবার্তা মনে পুলক জাগায় না। দুঃসংবাদ হলেও কোন উপায়ও নেই। বলি, কাল যাত্রার দিন। এখন আর পেছনো চলে না,—সব বন্দোবস্ত তৈরি।

ডাক্তারবাবু অগত্যা শুধু সতর্ক করে দেন্, সাবধানে যাবেন। পঙ্গুর কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকবেন না। ওখানকার জিনিসপত্র নিজেদের জন্যে ত কিনবেনই না, কুলিরাও না কেনে, বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। তাদের নিয়েই ভয়।

স্বামিজী বলেন, সঙ্গে তাঁবু আছে। দরকার যদি হয় গ্রামের বাইরে ও-অঞ্চলে থাকা যাবে।

হোটেলে ফেরবার পথে অনুভবানন্দজিকে বলি, এই 'সু'-সংবাদটি যেন আর কাউকে জানাবেন না। মিথ্যে শুধু তাদের দুশ্চিন্তার ভার বাড়িয়ে লাভ কি? আমরাও খবরটা যে পেয়েছি, ভুলতে চেষ্টা করি। কিন্তু, ভোলা কি আর যায়? কেবলি মনে হতে থাকে,—পথে আবার বসন্ত-রোগ দেখা দিল!

হঠাৎ পথের উপর দেখা যোশীর সঙ্গে। ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ বদন। সেই বিপুল উৎসাহ উবে গেছে। ম্লানমুখে জানায়, আপনারা কাল রওনা হচ্ছেন, আমি খবর পেয়েছি। ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছেন, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আলমোরা থেকে এগিয়ে যেন কোথাও না যাই। দেখুন দিকি, আমার তিব্বত যাওয়া বুঝি আটকেই গেল!

বলি, তোমার বড় প্রোগ্রাম ছেড়ে এইবার তীর্থযাত্রী বলে নিজেকে জাহির করো,—সাহেবকে সেইমত বোঝাও হয়ত তাহলে আর আটকাবে না।

(এরপর যোশীর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। পরে ১৯৫২ সালে সে কৈলাস যাত্রা করে আসে।

রাত্রে অনেক জায়গায় অনেকগুলি চিঠিপত্র লিখে শুতে বিলম্ব হয়। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া, কাল আমাদের যাত্রা সুরু। পথে কোথাও ডাকঘর পেলে আবার চিঠি দেব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলমোরা—গার্বিয়াঙ

(৭ জুন—২২ জুন, ১৯৩৪)

॥ ১ ॥

রাত্রি প্রভাত হয়।

জীবনের স্মরণীয় দিন।

আর কিছুক্ষণ পরেই হিমালয়ের অজানা নিভৃত অন্দরে পথিকের পথচলার অভিনব জীবনের আরম্ভ হবে। পরিচিত সভ্য-সমাজ থেকে এই স্বেচ্ছাবৃত আসন্ন নির্বাসন মনে পুলকিত কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

বেলা ৯টা ৫০ মিনিট।

মালপত্র ওজন করে পনেরো জন পোর্টার নিজ নিজ বোঝা পিঠে নিয়ে রওনা হয়। আহারান্তে আমরাও পাঁচজনে 'রয়াল হোটেল' থেকে যাত্রা করি। স্বামী অনুভবানন্দ, সুরেন্দ্র মহারাজ, ব্রহ্মচারী গোপাল চৈতন্য, সুধীর ও আমি।

অনুভবানন্দজি ও সুরেন্দ্র মহারাজের রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সাধুবেশ,—গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া পাঞ্জাবি, কোমরে জড়ানো গেরুয়া চাদর, মাথায় গোল গেরুয়া টুপি। ব্রহ্মচারীজিরও পরনে গেরুয়া কাপড়, কিন্তু গায়ে গরম কোট, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। সুধীরের মালকোচা-মারা ধুতি, খাঁকি হাফ্ সার্ট, মাথায় সোলা-হ্যাট্। আমার পরনে খাকি হাফ-প্যাণ্ট, খাকি হাফ-সার্ট, মাথায় সোলা-হ্যাট্। সবারই নিকট গরম সোয়েটার আছে। পথে যদি প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মচারীজির, সুধীরের ও আমার কাছে বর্ষাতিও রয়েছে। হিমালয়ের পথে কখন হঠাৎ বৃষ্টি নামে, বলা যায় না। স্বামিজী দুজনের হাতে ছাতা, বলেন, আমাদের এতেই চলে যায়। ব্রহ্মচারীজিরও ছাতা আছে। তাঁর মতে শুধু বর্ষাতি বা শুধু ছাতায় পাহাড়ের বর্ষা আটকায় না,—দুটোই থাকা ভাল।

এই সাজ-সজ্জা করে কৈলাস-তীর্থের পথ-চলা শুরু হয়। আপাততঃ পায়েজে।

চড়বার ঘোড়াগুলি শহরের বাইরে মাইলখানেক দূরে অপেক্ষা করে।

চারটি ঘোড়ার চারজন সহিসও সেখানে আছে। শহরের ভিতর ঘোড়া আনলে 'টোল'-এর টাকা দিতে হয়।

শহরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলি। গত কয়দিন কতবার এই পথে যাতায়াত করেছি, কিন্তু, আজ সেই চেনা পথ নতুন চোখে দেখি; নিজেকেও নবীন যাত্রী মনে হয়।

অনুভবানন্দজির পরিচিত স্থানীয় লোকেরা প্রশ্ন করেন, স্বামিজী, দল বেঁধে কোথায় চললেন? আবার কৈলাস নাকি?

মাথার উপর জোড়হাত তুলে স্বামিজী উত্তর দেন, তাঁর কৃপা। এখন দেখা যাক্।

শহর ছাড়বার আগেই বাঁদিকের পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি কটেজ্। শুনি, ক্ষয়রোগীদের জন্য। এখানকার অনেক রোগীর সেবার ও তত্ত্বাবধানের ভার অনুভবানন্দজি বহন করেন। তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি দেখেন, বলেন, করে এলাম ত কদিনের সবকিছু ব্যবস্থা; তারপর যা করবেন, দেখবেন—কৈলাসপতি,—টেনে ত নিয়ে চললেন আমাকে আবার।

আরও কিছুদূর এগিয়ে শীতলীর সুন্দর জঙ্গল। বড় বড় পাইন ও চীর্ গাছ। গুঁড়িগুলি থামের মত সোজা। সাধুভাষায় নামও তাই,—সরলদ্রুম। মাথার উপর সরু সরু সবুজ পাতাভরা ডালগুলি ছড়িয়ে থাকে। দেখায় যেন অরণ্যদেবের সভা-মণ্ডপে চাঁদোয়ার ঝালর দোলে। নীচে পাইনের ঝরা-কাঁটায় সমাকীর্ণ বন-পথ। যেন, গৈরিক গালিচা বিছানো। বাতাসে পাইনের স্নিগ্ধ সুবাস।

প্রত্যেক গাছের গুঁড়ির গায়ে টিনের বা মাটির গেলাসের আকারের পাত্র বাঁধা। টার্পিন তেলের জন্য গাছের আঠা সংগ্রহ হচ্ছে।

সুধীর দেখে বলে, এতক্ষণে বুঝলাম, আলমোরা আসবার পথে অত তেলের টিন্ দেখেছি কেন।

সরকারী জঙ্গল। প্রতি গাছের গুঁড়িতে নম্বর দেওয়া।

এই বনের ছায়াতলে প্রথম ঘোড়ায় চড়ি। এর আগে দার্জিলিঙে শখ করে দু'একবার ঘোড়ায় চেপেছি। সুধীরের অভিজ্ঞতা এর চেয়ে বেশি। গ্রামে দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে উঠে ছেলেবেলায় খেলা করেছে। ব্রহ্মচারীজি শুনি, 'এক্‌স্‌পার্ট' সওয়ার। মুঠার মধ্যে লাগাম ধরে, রেকাবে পা ঢুকিয়ে, আর এক পা ঘুরিয়ে ঘোড়ার পিঠে অক্লেশে উঠে পড়েন। প্রথম দিন,—

আমরা দুজনে সাবধানে ধীরে উঠি। ভরসার মধ্যে এইটুকু, ঘোড়াগুলি তেমন বড় নয়। পড়লে বিশেষ উপর থেকে পড়তে হবে না।

সুরেন্দ্র মহারাজ ধীর, স্থির, শান্তশিষ্ট প্রকৃতির। অতি মিষ্টি আচরণ। স্বল্পভাষী। কৃচ্ছ্রসাধনে, দেখায় যেন, শীর্ণদেহ। অনুভবানন্দজির নির্দেশে তাঁকেও ঘোড়ায় চাপতে হয়। স্বামিজী বলেন, আপনিও উঠে পড়ুন ঘোড়ায়,—রয়েছেই যখন আরও একটা। প্রথম দিনেই বেশি হাঁটবেন না। পাহাড়ে হাঁটা আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে, দেখছেনই ত প্রতিদিন আলমোরাতেই কম ঘোরাঘুরি করতে হয়?—বলে হাসিমুখে ছাতি মাথায় হন্ হন্ করে হেঁটে এগিয়ে চলেন।

শীতলীর জঙ্গল পেরিয়ে এসে মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যনিবাস। পাহাড়ের কোলে পাইন-ঘেরা পরিবেশে কয়েকটি বাংলো।

এগিয়ে চলি। বহু দূরে বরফের পাহাড় দেখা যায়। রোদের তেজ বেশি বোধ হয় না। কোথা থেকে হঠাৎ মেঘ আসে। সামান্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে মিলিয়ে যায়।

এবার উৎরাই পথ। নীচে ছোট নদী। অনেকখানি নেমে তারই পাশে আসা। পুল পার হয়ে অপর পারের পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে চড়াই ওঠা।

বেলা ২টা ২৫ মিনিট। বেরাচিনা পৌঁছুই। আলমোরা থেকে আট মাইল দূরে। প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। বনবিভাগের বাংলোতে উঠে দু ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়া হয়। বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে সবাই বসি। চারিপাশে পাইন গাছ। কিছু দূরে ছোট গ্রাম। কয়েকটি দোকানও আছে। পোর্টাররা বারান্দার নীচে বোঝা নামিয়ে চলে যায় দোকানে চা খেতে। বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের তত নয়, তাদের জন্যই বসা। ভানসিং নিজের কর্তব্য বোঝে, আমাদের জন্যও চা আনে। আলমোরা থেকে আনা খাবারও দেয়।

বাংলো থেকে জলের ধারা খানিক দূরে। গ্রামেও যাত্রীদের থাকবার জায়গা পাওয়া যায়, শুনি।

বিকাল ৪-৩০। আবার যাত্রা সুরু।

পাঁচ মাইল দূরে ধউলচিনা। শেষের দু মাইল কিছু চড়াই। পাইন গাছের সেনাদল যেন সঙ্গিন উঁচু করে সারা পাহাড় দখল করে থাকে।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি, আলমোরার বাস্-এর সহযাত্রী, সেই প্রশ্নকারী মাদ্রাজী ও তাঁর এক সঙ্গী আলমোরা অভিমুখে ফিরে চলেছেন।

সুধীর বলে, ব্যাপার কি ? যাবে কৈলাস, চলেছে উল্টোমুখে ?

জিজ্ঞাসা করে। তখন জানা যায়, সেরাঘাট পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু পথের নিদারুণ গরম অসহ্য বোধ হওয়ায় ফিরে চলেছে। তাঁদের অপর দুজন সঙ্গী কৈলাসপথে এগিয়ে গেছেন।

দেখি, এই দুদিনেই বেচারীর সেই বিপুল কলেবর চুপসাতে সুরু করেছে।

অনুভবানন্দজি বলেন, ব্যাপারটা তা নয়। ওদের দেশেও গরম কি কম ? জীবনে বোধ হয় পাহাড় দেখে নি। এত উঁচু পাহাড়—আর পথের চড়াই-উৎরাই দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। এরকম প্রতি বছরই কিছু হয়। শরীর হাতির মত হলে কি হবে ? এ-পথে যেতে হলে মনের বল থাকা চাই বুঝলেন, সুধীরবাবু।

সুধীর বলে, কেন ? পারব না আমি ?

স্বামিজী উৎসাহ দেন, নিশ্চয় পারবেন। চলুন ত। এখন বলুন একবার, —জয় কৈলাসপতিকী জয়।—সকলেই সমস্বরে যোগ দিই।

বেলা ৬টা ৪৫। ধউলচিনা আসে। ৬,০৬০ ফুট উঁচু। এখানে জেলা বোর্ডের ডাকবাংলো আছে। স্বামিজী ডাক দেন, ভানুসিং। আজ বাংলোতে থাকব না চল, নীচে ঐ ঝরনার ধারে দুতলা দোকানঘর, তারই ওপরের ঘরে রাত কাটানো হবে।

সেইমত ব্যবস্থাও হয়।

দোকানের সামনে পাথর-বাঁধানো উঠান। সেখানে পোর্টাররা মালপত্র নামিয়ে রাখে। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমরা উপরের ঘরে গিয়ে উঠি।

স্বামিজী জিজ্ঞাসা করেন, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয় ? কিন্তু কি খেতে দেবো ? আমাদের দেশে ঝরনার জল আর ঐ পাথর ছাড়া কি কিছু পাবার জো আছে। আচ্ছা, একটু জিরোন্ ত, দেখছি। বলে নীচে নেমে গেলেন। অথচ, আজ সারাদিন সমস্ত পথ তিনি নিজে হেঁটে এসেছেন, তবুও বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করেন না।

কিছু পরে উপর থেকে দেখি, উঠানের এক পাশে ভানুসিং-এর উনান জ্বলছে স্বামিজীর তত্ত্বাবধানে জিলাপি পাক হচ্ছে।

সন্ধ্যা নামে।

সুরেন্দ্র মহারাজ ঘরের এক কোণে স্থির হয়ে বসে আরাধনায় রত।

বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ করি। নীচে নেমে আসি।

উঠানের এক ধারে পোর্টার-পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রহ্মচারীজি ঔষধের বাক্স খুলে বসেছেন। চারিপাশে ঔষধপত্রের বাণ্ডিল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মচারীজি, কি হোল? সন্ধ্যেবেলায় এসব খুলেছেন?

শুনি, একজন পোর্টারের পায়ে সামান্য ব্যথা বোধ হচ্ছে, তাই ঔষধ চাওয়ায় আইওডেক্সের ক্ষুদ্র শিশির অনুসন্ধানে এই বিরাট পর্ব। বলেন, কোথায় যে রেখেছি মনে পড়ছে না। বলুন ত এতো ওষুধ, সব মনে রাখা কি সম্ভব?

সুধীর গম্ভীরমুখে বলে, কখনই না। দরকারই বা কি? এনেছেন ত? তাহলেই হোল।

কিছু দূরে কুলিদের রান্না চড়েছে। তিনটে উনান পেতেছে। আশ্চর্য হই। একসঙ্গে রাঁধলেই ত হয়, তিন জায়গায় রান্না কেন?

তখন জানতে পারি, তাদেরও জাতিভেদ আছে। এক জাতি অপর জাতির হাতে খায় না। কারণ, জাতিতে কে-যে উঁচু এবং কে-যে উঁচু নয় এ-প্রশ্নের মীমাংসায় এরা আজও পৌঁছুতে পারে নি।

রাত্রে আহারান্তে কম্বলশয্যায় শুয়ে পড়ি। পাশাপাশি সবারই কম্বল বিছানো।

পাথর ও মাটি দিয়ে গাঁথা প্রকাণ্ড লম্বা ঘর। শ্লেট পাথরের ছাদ। মাটি লেপানো মেঝে। দেওয়ালের গায়ে ছোট জানালা। তারই মধ্য দিয়ে বাইরের ঘনকালো পাহাড়ের মূর্তি উঁকি মারে। ঘরের ভিতর অন্ধকার। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। শুধু নীচে থেকে বাসন গুছাবার শব্দ আসে। কাল ভোরে যাত্রার জন্য ভান্‌সিং সব প্রস্তুত করে রাখে। দিনের শেষে এখনও বিশ্রামের অবসর তার আসে নি। কম্বলের উপর শুয়ে পায়ের দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেওয়ালের প্রতি তাকাতেই বাড়ির কথা মনে পড়ে। কলকাতা শহরে সেই চারতলা বাড়ি, ছাদের পাশে সে-ই শোবার ঘর! বহু নীচে রাস্তার ইলেকট্রিক আলোকে দেওয়ালের গায়ে বারান্দার রেলিঙের ছায়া সারারাত স্তব্ধ হয়ে থাকে। ভাবি, এ কোথায় এসেছি, কোথায়ই বা চলেছি? আপন ঘরের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পিছনে ফেলে অপরিচিতের সাথে অজানা পথে এ কোন্ অভিযান সুরু হল? জীবনযাত্রার পথে যাদের সঙ্গে এই ত

কদিন আগেও কিছুমাত্রও পরিচয় ছিল না, এই পথ-চলার নতুন জগতে এসে তাঁরাই ত একান্ত আপনার হয়ে উঠেছেন। একদিনের পরিচয়েই সারা জীবনের অপরিচয় ঘুচবার মত হোল। দেখি, এই প্রবাস পথেও নব-পরিচিতের আনন্দ দান আপন জনের নিঃস্বার্থ যত্ন ও অনাবিল স্নেহের রূপ ধরে ওঠে।

চোখ বুজতেই চোখে পড়ে, মনের আকাশপটে অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী। তারই বন-নীলিমার অন্তরালে উর্ধ্বমুখী ক্ষীণ-রেখা-পথ। হাত বাড়িয়ে সেই অজানা পথ যেন সুদূর-পিয়াসী পথিক-চিত্তকে বার বার ডাকতে থাকে।

॥ ২ ॥

ভোর ৪টা ২০ মিনিটে যাত্রা। রাত্রের অন্ধকার কেটে সবে উষার আলোক ফোটে। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে সোজা পথ। তারপর উৎরাই। নীচে নেমে কাঠের পুলে ছোট ঝরনা পার হওয়া। ঝরণার ধারে চালাঘরে ছোট দোকান। দোকানে দুধ পাওয়া গেল।

পথে এক জায়গায় বন্দুক হাতে এক পাহাড়ী শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়—বাঘ ভালুক শিকার নয়, বন্য কুক্কুটের সন্ধানে ঘোরে। নিরীহ প্রাণীর মানুষের হাত থেকে কোথাও নিস্তার নেই।

পাঁচ মাইল দূরে কানারীচিনার বন-বিশ্রাম ভবন। ৪০০০ ফুট্। সাতটার সময় পৌঁছুই। এখানেও বাংলো থেকে জলের ধারা কিছু দূরে। তবে, নিকটে দোকান থাকায় চা পাওয়া যায়। বাংলোয় বসে জলযোগের পর আবার পথে নামা।

পাহাড়ের গায়ে হাঁটার আনন্দ অনেক। কিন্তু, ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস করাও দরকার। তাই, ঘোড়ার উপর উঠে বসি। যদিও, তাতে আমোদও পাই না, আরামও দেয় না। বেশিক্ষণ একভাবে স্থির হয়ে বসে থাকায় কষ্ট বোধ হয়। তা ছাড়া, গতদিনের ঘোড়ায় চড়ে চড়াই-ওঠার মুখ ব্যথার রূপ ধরে সর্বাঙ্গে দেখা দিয়েছে।

সুধীর বলে, গা-ময় ফোঁড়া বার হচ্ছে নাকি?

এর উপর আরও এক আপদ। পথ বেশ প্রশস্ত। তবুও, রাস্তার যেদিকে পাহাড়ের ঢালু গা একেবারে সোজা নীচে নদীর ধারে নেমে যায়, সকলেরই ঘোড়া অনবরত পথের সেই খাদের ধার দিয়ে চলে। অথচ, পাশেই

চার-পাঁচ হাত চওড়া পথের নিরাপদ অংশ পড়ে থাকে। মূর্খ জানোয়ার ভুলেও সেদিকে চলবে না। লাগাম সজোরে টেনে ঘোড়ার মুখ সেদিকে ফেরাই। ঘোড়া আবার তখনই ফিরে এসে খাদের ঠিক ধার দিয়ে চলতে থাকে। যেন, সার্কাসের তারের উপর ব্যালান্স করে নাচ দেখায়। পাশে বহু নীচে তাকালে মাথা ঘোরে। হঠাৎ ঘোড়ার পা ফস্‌কালে ঐ নীচে একেবারে—। আর ভাবতে পারি না। তবুও, সাহস করে বসে থাকি। অভ্যাস করা প্রয়োজন। এখনও ত বড় বড় পাহাড়ের উপর পৌঁছুই নি। আরও পাঁচ মাইল এগিয়ে আসি। চড়াই নেই। কিছু উৎরাই আছে। তাই এখন হেঁটেই চলেছি। ১০টা ১০ মিনিট। পুণ্যতোয়া সরযূর ধারে পৌঁছুই। নাম শুনেই মনে কেমন এক পবিত্র ভাব জাগে। রামায়ণের কত মধুময় কাহিনীর স্মৃতি-ভরা সেই সরযূ! নদীর উপর লোহার ঝোলাপুল। ওপারে গিয়ে সেরাঘাট। কয়েকটি দোকানপাট। সেখানে যাত্রীরা আশ্রয় পায়। দু'একঘর মুসলমানও এখানে বাস করে দেখি।

আশপাশে কলা ও আমের বাগান। আম হয়েছে প্রচুর। কিন্তু পাকবার সময় আসে নি। এ-সব অঞ্চলে আম পাকে দেরিতে।

স্বামিজী বলেন, ফেরবার সময় এখানে পাকা আম পাবেন।

খানিক এগিয়ে বড় বড় গাছের স্নিগ্ধ ছায়াতলে শিবমন্দির। নিকটে সরযূ ও আর এক পাহাড়ী নদীর সঙ্গম।

তপোবনের মনোরম শান্ত পরিবেশ। এইখানেই দুপুরের বিশ্রাম। নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ সুশীতল জলে অবগাহন স্নান দেহ-মনে পরম তৃপ্তি এনে দেয়।

কিন্তু, ক্ষণস্থায়ী সে সুখভোগ। মধ্যাহ্ন-সূর্য যেন ঈর্ষাভরে রোষানলে জ্বলে ওঠেন। ঘরের মধ্যে তাপমান যন্ত্র বার করে সুধীর দেখে, বলে, একী! এ-যে ১০৮° ডিগ্রী। হিমালয়েও এমন গরম।

সেরাঘাট নদীর উপর, তবুও প্রচণ্ড গরম জায়গা। মাছিরও উপদ্রব যথেষ্ট। কেদার-বদরীর যাত্রাপথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার উচ্চতা ২০০০ ফুট্-এর বেশি নয়।

স্বামিজী জানান্, রোদের তেজ না কমা পর্যন্ত আজ আর বেরুনো নয়।

অতএব, যাত্রা করতে ছটা বাজে।

প্রায় মাইল তিনেক বেশ চড়াই। নরুয়াকাগলে উঠে (৬০০০ ফুট্) পথ আবার নামে।

সেরাঘাট থেকে ছয় মাইল দূরে গনাই বনবিভাগের বিশ্রামালয়। ৩০০০০ ফুট, উঁচুতে। পৌঁছতে রাত আটটা পঞ্চাশ হয়। গ্রাম থেকে দূরে, পথ ছেড়ে আধ মাইল গিয়ে তবে বাংলো। জলেরও অভাব। শুনি, একটি মাত্র ছোট ঝরনা থেকে সারা গ্রামের জল সরবরাহ হয়। গ্রামে দোকানঘর আছে। যাত্রীরা সেখানেও থাকতে পারে।

বাংলোতে আমাদের আজ প্রথম রাত্রিবাস।

বনবিভাগের এই বাংলোগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গ্রামের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন নিভৃতে। পাহাড়ের কোন টিলার উপরে। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। স্লেট-পাথরের ছাদ। সুমুখে সুন্দর টানা বারান্দা। দেওয়ালে আলনা টাঙানো। বারান্দার কোলে দুখানা ঘর। পাশেই বাথরুম। ঘর দুটিতে মাদুর বিছানো। একপাশে খাট। চেয়ার, ইজিচেয়ার, টেবিল, আয়না কোন কিছুরই অভাব নেই। বাসন ইত্যাদিও পাওয়া যায়। সময় কাটাবার জন্য র‍্যাক্‌-এ খানকয়েক বই-ও আছে। ঘরের জানলায় তারের জাল লাগানো। মশা-মাছির উপদ্রব না হয়। বাংলোর বাইরে ফুলের বাগান, চারিপাশে পাইন প্রভৃতি গাছ।

অসুবিধার মধ্যে পর্যাপ্ত জলের অভাব। প্রায় সব বাংলো থেকে জলের ধারা দূরে। গ্রামের দোকানপাটও নিকটে নয়, জিনিসপত্র কিনে আনতে সময় লাগে।

তবে, এ-সব অসুবিধা আমাদের মত লোকের। বাংলোগুলির অস্তিত্ব, সাহেবরা 'ট্যুরে' এলে থাকবার জন্য। তাঁদের জলের প্রয়োজন সামান্য, লোকজন চাপরাসী, পরিচালকের অভাব থাকে না।

স্বামিজী বলেন, বেলা করে বেরিয়ে পৌঁছুতে আজ রাত হোল। সমস্ত ব্যবস্থা করে রান্না তৈরি হতে দেরি হবে, আপনারা চা-টা খেয়ে ততক্ষণ বরং বিছানায় একটু গড়িয়ে নিন্‌।

তাই করা হয়। দুপুরের সেই দুর্দান্ত গরমের পর এখন রাত্রিকালের হিমালয়ের স্নিগ্ধশীতল মনোরম আবহাওয়া। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কজনে গল্প করি। কখন একে একে ঘুমিয়েও পড়ি। ঘুম ভাঙে ভান্‌সিং-এর ডাকে,—'স্বামিজী। ভোজন তৈয়ার'।—আড় ভেঙে সবাই বিছানা ছাড়ি। ঘড়িতে দেখি, রাত দুটা।

আশ্চর্যময় হিমালয়ের মহিমা। এই গভীর রাতে অসময়ে খেতে যাওয়ার

ভাক। তবুও, মনে কোনই বিরূপভাব জাগে না। ক্ষুধার্ত উদরও পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে।

॥ ৩ ॥

"উমাপ্রসাদবাবু, ক'টা বাজ্‌ল ?"

ঘুম ভাঙে এবার স্বামিজীর ডাকে। টর্চ জেলে ঘড়ি দেখি। বলি, সাড়ে চারটে।

"তবে আর কি ? উঠে পড়ুন—জয় কৈলাসপতি বলে। এখন কদিন রোদ-ভোগের কষ্ট আছে,—ভোরে যাত্রা করা ভাল,—যতখানি ঠাণ্ডা থাকতে এগোনো যায়।"

অতএব, তখনি উঠে বিছানা বাঁধতে হয়।

সুধীর জিনিসপত্র কিট্-ব্যাগে ভরে। বলে, অবাক কাণ্ড। মাত্র দুঘণ্টা ঘুম, অথচ শরীরে কোন অবসাদ নেই। বাড়িতে হোলে, অত রাত করে শুতে গেলে পরদিন বেলা নটার আগে বিছানা ছাড়ায় সাধ্যি কার ?

স্বামিজী হাসেন। বলেন, সুধীরবাবু, এই ত সবে যাত্রা শুরু, হিমালয়ের কত বিচিত্র প্রভাব—এখানকার আবহাওয়ার কী গুণ—যত দিন যাবে, বুঝতে পারবেন। হিমালয়ের তীর্থপথ—সেও এক সাধনাক্ষেত্র। ব্রহ্মচারীজিও গম্ভীর মুখে সায় দেন, ঠিকই বলেছেন অনুভবানন্দজি।

কিছু জলযোগ করে সাড়ে পাঁচটার আগেই আবার রওনা।

খানিক দূর সমান রাস্তা। তারপর উৎরাই। মাঝে মাঝে পথের পাশে দু একটা গ্রাম। কোথাও আমগাছের বাগানের মধ্যে ছোট মন্দির। কৈলাসের পথ, শিবঠাকুরেরই রাজত্ব। এত ভোরে গ্রামবাসী এখনও জাগে নি। পথ নদীর ধারে নামে। বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কয়েক দিক থেকে একাধিক জলধারা এসে মিশেছে। নদীর তীর ধরে পথ অনেক দূর এগিয়ে চলে। পথের অদূরে ও আশপাশের পাহাড়ের গায়ে—অনেক উপরেও—আরও গ্রাম দেখা যায়। দিকে দিকে পাহাড়ের গা কেটে স্তরে স্তরে চাষের জমি,—নদীর নিকটে ধানের ক্ষেত। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার মধুর মূর্তি। চতুর্দিক শান্ত নীরব। শুধু গাছের শাখায় হঠাৎ কখনো পাখির কাকলি,—কোথাও বা পাহাড়ী ঝরনার অস্ফুট কলধ্বনি।

প্রভাতের নির্মল সুনীল আকাশ। স্নিগ্ধ বাতাসের মধুর পরশ। পাহাড়-

রাজ্যে হেঁটে পথচলার অপার প্রেরণা আসে।

পায়ে মোজা ও ক্যাম্বিসের টেনিস্-স্যু। গায়ে গরম কোট। সামান্য যেটুকু শীতের আমেজ তাতেই কাটে। রৌদ্র-নিবারণের জন্যে সেই সোলা-হ্যাট এখন হাতে থাকে।

হিমালয়ের এইসব পথে হাঁটবার জন্যে কোন বিশেষ রকমের জুতা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখি না। তাতে নতুন জুতা-পরার দুর্ভোগই আনে। যে-জুতা চিরকাল পরার অভ্যাস, সে-জুতায় যেমন কাজ চলে যায়, তেমনি চরণযুগলও স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বোধ করে। কেদার-বদরীর পথেও এই টেনিস্-স্যু ভালই কাজ দিয়েছিল। তবে, কৈলাসের এই দীর্ঘ যাত্রা-পথ ত সবখানি এক ধরনের নয়। পথ যখন পিচ্ছিলতায় বা তুষারপাতে দুর্গম হয়ে উঠবে, তখন চামড়ার জুতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সে পথ পেতে এখন বিলম্ব আছে। তিব্বতেও ক্যাম্বিসের জুতায় সেখানকার প্রচণ্ড কন্‌কনে বাতাস বোধ হয় না। অতএব, সেই কয়দিনের জন্যেই চামড়ার জুতাও সঙ্গে নিতে হয়।

বেশভূষা সম্বন্ধেও এই একই নীতি। চিরন্তন অভ্যাসমত জামাকাপড় ব্যবহারে সাধারণতঃ দেহও স্বস্তি বোধ করে, মনও তৃপ্তি পায়। অবশ্য অতি-বেশি শীতের রাজত্ব এলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সে-রকম শীত পেতে এখনও কয়েকদিন দেরি।

ঘোড়া ছেড়ে হেঁটেই চলেছি। শুধু ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করলে ত চলবে না। পরে পথ এমনি দুর্গম হবে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া তখন সম্ভবই নয়। তাই পায়ে হাঁটার অভ্যাস রাখাও প্রয়োজন।

কেদার-বদরী থেকে ফেরবার পর পাহাড়ে দীর্ঘপথ হাঁটবার আর সুযোগ হয় নি। দু'বছর আগে নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনে যাওয়া,—সে ত মাত্র একদিনের হাঁটা! কিন্তু, দেখি, গত দুদিনেই পাহাড়ের সংস্পর্শে চরণ ও মন আবার কেমন জেগে ওঠে। চরণে সাবলীল গতি ফেরে, পথ-চলার উল্লাসে মন মাতে।

পথের পাশে ছোট গ্রাম। তারই অদূরে ঘন সবুজ বনের মধ্যে রক্তবরণ অবগুণ্ঠন টেনে কয়েকটি গাছ উঁকি মারে। লালফুলের আবরণে গাছগুলির পাতা ঢাকা পড়েছে। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে সন্দেহ হয়, বনে বুঝি বা আগুন লেগেছে।

স্বামিজী বলেন, ওগুলো বরাশ ফুল—রোডোডেনড্রন্। শিমুলের মত শুধু রূপ ধরে না, গুণও আছে। আমাশার খুব ভাল ওষুধ।

ব্রহ্মচারীজি বলেন, হাঁ, ঠিকই বলেছেন অনুভবানন্দজি। কিন্তু সুধীরবাবু, ও-ফুলগুলোর আর একভাবেও ব্যবহার চলে, জানেন? পাহাড়ীরা ওর চাট্‌নি বানায় চমৎকার। বেসন দিয়ে পকোড়াও ভাজে।

সুধীর বলে, ব্রহ্মচারীজি, খাওয়াতে হবে কিন্তু একদিন।

সুরেন্দ্র মহারাজ অস্ফুটে শুধু মন্তব্য করেন, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। কী রঙের খেলা।

সুরেন্দ্র মহারাজের সঙ্গে এই দু দিনেই আলাপ জমেছে। ধীর, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথাবার্তা কমই বলেন। আপন মনে পথ চলেন। চোখাচোখি হলেই মুখে মৃদু মিষ্ট হাসি ফোটে।

অনুভবানন্দজি সবারই কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। সুরেন্দ্র মহারাজের উপর ভাঁড়ারের ভার। চাবির গোছা তাঁর হাতে দিয়ে ভারমুক্ত হই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কোন্ ব্যাগ্-এর কোন্ কোণে কতখানি কি আছে, নখদর্পণে দেখে তিনি বলে দিতে পারেন।

সুধীরের উপর হিসাবপত্র রাখার ভার। অফিসেও তার হিসাব দপ্তর নিয়ে কাজ। তাই বলে, এ হোল ভাল। ঢেঁকি স্বর্গে এসেও ধান ভানে।

ব্রহ্মচারীজি বৈদ্যরাজ। দিনশেষের বিশ্রামস্থানে পৌঁছে তিনি ঔষধের বাক্স খুলে বসেন। সমস্ত শিশিপত্র চারপাশে ছড়িয়ে ডিস্‌পেন্‌সারি সাজান। এটি তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া। বলেন, সব আবার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি। দামী ওষুধ,—কোন কিছু ভাঙ্‌ল কিনা দেখি।

প্রতিদিন এই নতুন করে সাজানোয় তিনি আনন্দ পান্। রোগীও আসে কয়েকটি, তাদের চিকিৎসার সুযোগে তৃপ্তিও লাভ করেন।

এই যাত্রাপথের অগ্রণী অনুভবানন্দজি স্বয়ং। কোথায় আজ দুপুরে খাওয়া, রাতে থাকা,—আগে থেকে কাকে কোথায় পথে খবর পাঠানো দরকার, কোন্‌খানে কি ব্যবস্থার আবশ্যক,—সমস্তই তাঁর জানা, করেনও তিনি নিজে। এ নিয়ে আমাদের কারও কিছু ভাবনাও নেই, করবারও নেই। সারাক্ষণই তিনি কর্মব্যস্ত। হাঁটেনও হন্‌হন্ করে, পাহাড়ীরাও হার মানে। নিজে যা ন্যায় ও উচিত মনে করেন, স্পষ্টকণ্ঠে তখনি তা জানাতে সঙ্কোচ করেন না। অপরকে আদেশ করার ক্ষমতা ধরেন, হুকুম করে কাজও করিয়ে নেন্।

স্বামিজীকে বলি, আমার ওপর কিন্তু কোন কাজ চাপাবেন না, শুধু ফটো ও সিনেমা তুলতে তুলতে যাব। স্বামিজী স্নেহসিক্ত দৃষ্টিতে তাকান। টাকার থলির বেল্টটা হাতে দিয়ে বলেন, আচ্ছা, তাই হবে। শুধু এইটে কোমরে বেঁধে নিন্ দিকি।

খুচরা টাকার ভারে ভারবাহীতে রূপান্তরিত হই।

গণাই থেকে আট মাইল দূরে ছোট এক নদীর ধারে গদীগড়।

৮টা ৩৫ মিনিটে পৌঁছই। আজ এইখানেই দুপুরের স্নান, আহার। একটা দোকানের সুমুখে আস্তানা গাড়া হয়। নিকটে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার ধারা নামে। কলকল স্বর তুলে আরও নেমে গিয়ে নদীতে মেশে। নদীর দুপারে বহু আম ও কলাগাছ। শাক সব্‌জিও কিছু পাওয়া যায়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে নদীর ধারে গাছের ছায়াতলে শিলাসনে শুয়ে বিশ্রাম করি। মাথার উপর সবুজ পাতার চন্দ্রাতপ। তারি জালি পথে দেখা যায় ঘননীল আকাশের টুকরা টুকরা অংশ। কানে বাজে নৃত্যপরা নির্ঝরিণীর নূপুর কিঙ্কিনী। আবেশে অবশ চোখের পাতা আপনা থেকে বুজে আসে। হঠাৎ মনে হয়, যেন বেহালার সুর শুনি। গান গেয়ে কারা এগিয়ে আসে। একী স্বপ্ন, না সত্য? চমকে উঠি। এবার এসে পাশেই বাজে। তাকিয়ে দেখি, দুটি বালক দাঁড়িয়ে। পরনে ছেঁড়া, ময়লা জামা। শ্যামবর্ণ। মাথাভরা আলুথালু কালো কোঁকড়া চুল। হাতে বেহালার মত বাদ্যযন্ত্র। তাতেই সুর তুলে কৃষ্ণভজন গায়। অতিমিষ্ট কণ্ঠস্বর।

আশ্চর্য হই, ব্রজবুলি শিখল কোথা থেকে? চেহারাও পাহাড়ী ছেলের মতন নয়। টানা চোখ, টিকাল নাক, মুখের লম্বা গড়ন, রঙ্‌ও কালো। গান থামলে ভিক্ষার জন্য হাত পাতে। জিজ্ঞাসা করে জানি, অনুমান ঠিকই। কিছুদূরে তাদের গ্রাম। বাপ কাজ করত মিলিটারীতে। মথুরায় এদের জন্ম। এদের মায়ের দেশ সেই মথুরায়। বাপ হঠাৎ মারা যায়। মা এখন এই পাহাড়ের গ্রামের বাড়িতে কিছুকাল অবধি রোগশয্যা শায়িনী। মায়ের কাছেই তাদের এই ভজন শেখা। গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে ভিক্ষা করে এখন তাদের দিন চলে।

ভাবি, যমুনা পুলিনের গান গেয়ে ব্রজের রাখাল ঘোরে আজ হিমালয়ে? কৃষ্ণ কি এদের ডাক শোনেন না?

বিকালে সাড়ে তিনটায় আবার পথে নামা।

দুটি কাঠের পুলের উপর দিয়ে দুটি নদী পার হতে হয়। তারপর আসে বেরীনাগের খাড়া চড়াই। চড়াই ওঠার মুখে বৃষ্টি নামে। নিকটে গ্রাম পেয়ে পোর্টাররা আশ্রয় নেয়। ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ে। গাছের পাতায় পাতায় শব্দ ওঠে। পাহাড়ের গা বেয়ে কলস্বরে ধারা নামে। আমরা অপেক্ষা করি না। পাহাড়ের বৃষ্টি, কখন নামে, কখন থামে, কেউ জানে না। ওয়াটারপ্রুফ্ গায়ে, বর্ষাতি টুপি মাথায় ঘোড়ায় চেপে চড়াই উঠি। গত দুদিনই নজর করেছি, আজও দেখি, ঘোড়া যখন চড়াই-পথে ওঠে, পিছনে সহিসও তার লেজ ধরে আসতে থাকে। এতে কি তার চড়াই ওঠার ক্লান্তি কমে? প্রশ্ন করে উত্তর পাই না, হাসতে থাকে। গভীর জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পথ। বড় বড় ওক্, পাইন ও দেওদার গাছ। উঁচু পাহাড়ের ছ'সাত হাজার ফুট্ উপরে পৌঁছে ওকের বেশী দেখা পাওয়া যায়। পাইনও ভিন্ন জাতির হয়। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানীরা আশেপাশের বন জঙ্গল তরুলতা ও গাছের আকার দেখে অনেক সময় বলে দিতে পারেন, হিমালয়ের কতখানি উঁচুতে এসে পৌঁচেছেন। দু' মাইল এসে পাহাড়ের প্রায় মাথায় পৌঁছই। বেলা সাড়ে পাঁচটা। গ্রামের নাম বেরীনাগ বা বেণীনাগ। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রায় সাত হাজার ফুট্ উঁচুতে। এখানেও গ্রাম থেকে বন বিভাগের বাংলো অনেকখানি দূরে। অতএব, গ্রামের স্কুলবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়। এ-সব অঞ্চলে বড় বড় গ্রামে জেলা বোর্ডের স্কুল আছে, দেখি। স্কুলগৃহে যাত্রীদের রাত্রিবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। পাকা বাড়ি, তাই থাকারও সুবিধা।

স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড বটগাছ। গাছের গুঁড়ি পাথর-দিয়ে ঘিরে বাঁধানো। একপাশে নতুন ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল খোলা হয়েছে। রাস্তার অপর পারে ডাকঘর, দোকান প্রভৃতি। পৌঁছবার দশ মিনিটের মধ্যেই ভানুসিং কোথা থেকে গরম চা তৈরি করে এনে দেয়। আপাততঃ বৃষ্টি থামলেও সারাপথই আজ বৃষ্টির মাঝে আসা। কিসে আমাদের সুখ ও সুবিধা হবে, ভানুসিং-এর সদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

স্বামিজী বলেন, এ-অঞ্চলের মধ্যে সব চেয়ে ভাল চা জন্মায় এই বেরীনাগে, দেখুন কেমন লাগে।

আশেপাশে চায়ের বাগানও দেখা যায়। চা খেয়ে সুধীর বলে, যাই বলুন, স্বামিজী, আমাদের দার্জিলিঙ্-এর চায়ের সঙ্গে এর তুলনা চলে না।

যাত্রী আসার সাড়া পেয়ে ক'জন গ্রামবাসী আসে। অনুভবানন্দজীকে

দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে, আরে স্বামিজী! ফির ভি দর্শন মিল্ গ্যায়া!

দু একটা কথা বলেই তাড়াতাড়ি তারা ঘরে ফিরে গিয়ে কেউ কলা, মূলা আনে, কারো হাতে দুধ ভরা ঘটি, কেউ এনেছে বাটি করে ঘি।

স্বামিজীকে ঘিরে দাঁড়ায়। তিনিও প্রাণ খুলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের সুখদুঃখের খবর নেন্। যেন সব কতো আপন জনের মিলন। দেখেও আনন্দ পাই মনে।

গল্পের আসর জমে। গ্রামের কথা শুনি। পাহাড়ীদের মধ্যে নাগপূজার প্রচলন আছে। এখানে সর্প-দেবতার মন্দিরও রয়েছে। তাই থেকে বেরীনাগ নামকরণও।

এখানকার জঙ্গলে বহু ভালুকের বাস। গুক্ ফল তাদের প্রিয় খাদ্য। ফল পাকলে তাদের প্রায়ই দেখা যায়। গ্রামের ক্ষেতের ফসলের উপরও অত্যাচার বাড়ে।

সুধীর বলে, দু একটার দর্শন পেলে হোত।

স্বামিজী বলেন, দেখা দিলে আর দাঁড়িয়ে দেখতে হোত না। যা বিরাট্ চেহারা এক-একটা—হঠাৎ সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই। রেগে গেলে বা ভয় পেলে সামনের দু পা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তখনি দু হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন পাশ—তারপর আদর করে নখ দিয়ে মুখের চামড়া টেনে নেওয়া। ভীষণ চীজ্!

সুধীর বলে, তাহলে পথে মুখোমুখি পড়লে করার কিছুই নেই?

স্বামিজী বলেন, চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া, প্রভুর রাগ বা ভয় না জন্মায়। আপন মনে সে যদি তখন চলে যায়, ভালই। না হলে, একমাত্র উপায় থাকে, তার সুমুখে যে-কোন একটা জিনিস—লাঠি, ছাতি, টুপি, চশমা—যা হোক্ কিছু একটা ফেলে, বা তার হাতে ধরিয়ে দিতে পারলে সে তখন তাই নিয়েই মনোযোগের সঙ্গে দেখতে থাকে, গন্ধ শোঁকে—মানুষও ততক্ষণে চম্পট দেবার সুযোগ পায়।

সুধীর বলে, জেনে রাখলাম, মোক্ষম সময়ে কথাটা মনে পড়লে হয়।

ব্রহ্মচারীজি বলেন, আমার কাছে ভালো ভালো অ্যান্টিসেপ্টিক মলম আছে।

সুরেন্দ্র মহারাজ নীরবে বসে শুনছিলেন। হেসে মন্তব্য করেন, সে-সব ব্যবহারের সুযোগ না হলেই মঙ্গল।

এখান থেকে বরফের পাহাড়ের মনোহর দৃশ্য দেখা যায়,—চৌখাম্বা, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচুলি প্রভৃতি। এও আমাদের শোনা কথা। শুধু ছিন্ন মেঘের পর্দার ফাঁকে দু-একটা তুষারকিরীট গিরিশিখরের সামান্য ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া গেল।

বেরীনাগ উঁচু জায়গা, তায় বৃষ্টি-বাদল। রাত্রে এই প্রথম খুব শীত বোধ করি।

॥ ৪ ॥

স্কুলগৃহে রাত্রি কাটে।

আজ রবিবার। স্কুলের ছুটি। কিন্তু, আমাদের পথচলার ছুটি নয়।

৫টা ৪৫-এ আবার রওনা। কিছুদূর বনের মধ্য দিয়ে পথ। তার পর প্রায় সোজাই চলে। আশপাশে কখন ছোট গ্রাম আসে। এক জায়গায় ক্রিশ্চান মিশনারীর একটা বাড়িও রয়েছে দেখি।

পাহাড়ের উপরে পথ উঠে আসে। নীচে উপত্যকায় ও পাহাড়ের সবুজ গায়ে মেঘের খেলা অপূর্ব বোধ হয়। কোন্ এক অদৃশ্য ধুনুরী যেন বহু নীচে তুলা ধোনে এবং সেই সাদা পাঁজা তুলা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে ভেসে পাহাড়ের গা বেয়ে, গাছের মাথার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। পথও এবার নিম্নমুখী হয়।

সকালে হেঁটে চলার অসীম আনন্দ। পথও সরল। তাই ঘোড়ায় চড়ার প্রয়োজনও থাকে না। উৎরাই-পথে চড়ে নামা রীতিও নয়।

মনের আনন্দে এগিয়ে চলি। আট মাইল আসা হয়। আরও খানিক উৎরাই নেমে নীচে এক ছোট নদীর ধারে পৌঁছই। কাঠের পুল। পুলের উপর থেকে নদীর স্বচ্ছ জলধারার তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়। সূর্যকিরণে বালুকণা ঝিক্‌মিক্ করে। জলের মধ্যে ছোট ছোট মাছ। আনন্দে ঘোরে-ফেরে, খেলা করে। এদিক থেকে ওদিকে যায়, আবার চকিতে এধারে ফিরে আসে। মুক্ত প্রাণীর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিচরণ, স্থির হয়ে তাকিয়ে দেখি। মনে আনন্দ জাগে।

ভান্‌সিং চুরমা এনে হাতে দেয়। ভোরবেলায় রওনা হবার আগেই একবার উপবাস ভাঙা হয়েছে; কেন না, শূন্য-উদরে পাহাড়-পথে হাঁটা একেবারে নিষিদ্ধ, তাতে অসুখ হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু পথে আবার ক্ষুধা

জাগে। তাই, ভানুসিং-এর চুর্‌মা পরিবেশন। এ পথে খাদ্য-জগতে চুর্‌মা যাত্রীদের নিত্য-সহচর। স্বামিজীর নির্দেশে তৈরি হয়ে আলমোরা থেকেই থলি-ভরতি সঙ্গে চলেছে। সুজির বদলে আটা দিয়ে প্রস্তুত মোহনভোগ বা হালুয়া বিশেষ। এক ফোঁটাও জল দেওয়া হয় না। ঘিয়ে ভাজা আটা, কিশমিশ, বাদাম মেশালে খাদ্যের গুণও বাড়ে, আরও সুস্বাদু হয়। জল না থাকায়, পচবার বা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না, দিনের পর দিন খাওয়া চলে, ক্ষুধাও মেটে।

সেই চুর্‌মা খেতে খেতে মাছের খেলা দেখি।

গোপাল চৈতন্যদেব ব্রহ্মচারী, সুতরাং হঠাৎ মাছের প্রতি তাঁর নজর পড়ে। ঘোড়ার সহিসদের ডাক দেন, বলেন, বখশিশ মিল যায়গা, মছ্‌লি পাকড়ো।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করেন, আলমোরা ছাড়ার পর এ ক'দিন মাছ খাওয়া হয়নি, মশাই। বলেন কী।

বলি না কিছুই। তাকিয়ে দেখি, নদীর সেই নির্মল জল পাহাড়ীদের দাপটে ঘোলাটে হয়ে ওঠে।

সুরেন্দ্র মহারাজ মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, আর দাঁড়ায় না, চলুন্ এগুনো যাক্।

কিছুদূর উঠে বড় রাস্তা থেকে থলের বনবিশ্রাম ভবনের পথ পাওয়া যায়। সেই পথ ধরে চলি। পাইন গাছের নিবিড় বন। তারই মধ্য দিয়ে কেবলি এগিয়ে চলা। কোথাও কোন জনমানব নেই। থাকবার কথাও নয়। পথের উপর লোকচলাচলের চিহ্নও দেখা যায় না। মনে সন্দেহ জাগে, ভুল পথেই কি চলে এলাম? স্বামিজীর গলা শোনা যায়। মনও আশ্বস্ত হয়।

বেলা দশটায় বাংলোতে পৌঁছই। ৩,৪০০ ফুট উঁচুতে। আজ সকালে এগারো মাইল পথ হাঁটা হয়েছে। কিন্তু, সে-পরিশ্রমের মূল্য পাওয়া যায় বাংলোর বারান্দায় বসে। নগাধিরাজ হিমালয়ের শোভা দেখে। স্তরে স্তরে স্তব্ধ মৌন গিরিশ্রেণী দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। যেন, ধ্যানমগ্ন মহাদেবের আলুলায়িত জটাভার। নিকটের পাহাড়গুলির স্নিগ্ধ সবুজ রঙ্। আরও দূরের পাহাড়ের স্বচ্ছ নীল আভা। সকলের পিছনে গগনস্পর্শী শৈলশিখরে তুষারের উজ্জ্বল শুভ্র দীপ্তি।

অনুভবানন্দজি ঘর থেকে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়ান। উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, দেখছেন হিমালয়ের রূপের ছটা? এখন ত দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখা। যেতে হবে ঐ সব পাহাড় এক এক করে পার হয়ে। একদিক দিয়ে পাহাড়ের ওপর ওঠা, আবার অপর দিকে নামা। তারপর পৌঁছনো বরফের পাহাড়ের ঐ ওখানে,—দুটো চূড়োর মাঝখানে সামান্য নীচুমত দেখাচ্ছে—ঐ হোল লিপুলেখ পাশ্। বরফের পাহাড় ঐখান দিয়ে পার হয়ে ওপারে তিব্বতে নামা। দেখি একবার দুরবীনটা।—সুধীরের হাত থেকে দুরবীন নিয়ে চোখে লাগিয়ে ফোকাস্ করেন। একমনে দেখতে থাকেন। মুখে হাসি ফোটে। কথা বলেন যেন লিপুপাশ-এর উপর দাঁড়িয়ে—অ-সুধীরবাবু! এ-যে এখনও বেশ বরফ রয়েছে দেখছি!—তা থাক্। আমাদের পৌঁছুতে এখনও ত কদিন দেরি; তার মধ্যে গলে যাবে অনেকখানি ঠিক পার হয়ে যাবেন,—কৈলাসপতির কৃপায়,—কি বলেন, সুধীরবাবু? দেখুন, কি সুন্দর দেখাচ্ছে দুরবীনে,—যেন হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়।

এখানে দাঁড়িয়ে লিপুলেখের বরফ দেখতে ও স্বামিজীর মুখে সেই তুষারাবৃত গিরিসঙ্কটের বর্ণনা শুনে মনে যেন হিমশীতল স্পর্শ বোধ করি।

সুমুখের পাহাড়ের বুক চিরে আমাদের বিকালের যাবার পথ এঁকে বেঁকে উঠে যায়, যেন সেই অচেনা সুদূর তুষার-রাজ্যের সঙ্গে পরিচিত নিকটের সেতুবন্ধন রচনার চেষ্টা করে।

থল বাংলো থেকে গ্রাম অনেকখানি দূরে। নীচে নদীর ধারে। নিকটে জলের ধারারও অভাব। যাবার পথে বাংলোগুলি ব্যবহার করতে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আলমোরা থেকে যাত্রার আগে সময় সংক্ষেপ বশতঃ বাংলোর চৌকিদারদের আগে থেকে সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয় নি। তাই, বাংলোয় পৌঁছে জল, কাঠ, দুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা হতে বিলম্ব হয়। চৌকিদারকেও কোথাও কোথাও খুঁজে পেতে সময় লাগে। স্বামিজী এখন থেকে চৌকিদারদের জানিয়ে রাখছেন, ফেরবার পথে আগে থেকে খবর দেব।

বাংলোয় পৌঁছনোর কিছু পরে ব্রহ্মচারীজি এলেন। তাঁর সহিসের হাতে দুটি মাছ। ব্রহ্মচারীজির মুখে বিজয়ী বীরের হাসি।

উৎসাহের বশে নিজেই পাক করতে বসলেন। বললেন, যেবার গঙ্গোত্রী যাই, সঙ্গে উনিশজন যাত্রী ছিল, পনেরো জন মেয়ে। তবুও তাদের সকলকার রান্না আমি একাই করে খাওয়াতাম।

আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি মাছ খান্ না। তাতে কী। নিরামিষ তরকারিও এমন রাঁধব, খেয়ে ধরতে পারবেন না, মাংস কি আর কিছু। সব রকম মশলাপাতি সঙ্গে এনেছি।

ব্রহ্মচারীজি প্রকৃতই রন্ধনে সিদ্ধহস্ত। রান্না খেয়ে সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করি, চমৎকার হয়েছে। গুরুপাক হলেও অতি মুখরোচক।

সুধীর গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্রহ্মচারীজি, অজ্ঞাতবাসের সময় আপনি নিশ্চয় বল্লব সেজে ছিলেন ?

ব্রহ্মচারীজির মুখের দাড়ি গোঁফের মাঝে সলজ্জ গর্বের মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

বিকাল ৫-৪৫-এ আবার যাত্রা।

অনেকখানি উৎরাই নেমে গ্রামের মাঝ দিয়ে পথ। পাশেই রামগঙ্গা। প্রশস্ত নদী। নদীর উপর লোহার ঝোলা পুল। ওপারেও থলগ্রাম। অনেক লোকের বাস। দোকানপাট, স্কুল, ডাকঘর। আম, কলা প্রভৃতি ফলের গাছ। কিছু দূরে দেবালয়। প্রাচীন শিব মন্দির। পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে। খানিক ওঠার পর পথের অল্প দূরে আর একটি মন্দির দেখা যায়। নাম শুনি, এক-হাতিয়া দেউল। এক হাত-বিশিষ্ট শিল্পীর তৈরি,—একখানা পাথর কেটে। মবাবলীপুরমের প্রসিদ্ধ রথ-মন্দিরের কথা মনে পড়ে। সেই শিল্পি-গোষ্ঠিরই কেউ কি এসেছিলেন এই কৈলাস তীর্থ পথে ?

দেউলের নিকটে ঝরনা,—সুন্দর ছোট জলপ্রপাত। কিন্তু ভাবনা জাগায় সুমুখের পথ। মাথা তুলে দেখি, পাহাড়ের গা বেয়ে পথ উঠে যায় এঁকে বেঁকে আকাশ স্পর্শ করার লোভে। এদিকে বেলা পড়ে আসে। অতখানি চড়াই শেষ করার আজ সময় নেই, সামর্থ্যও নেই। তাই মাইল তিনেক মাত্র এগিয়ে পথের পাশে একটি দোকানঘরের নিকটে তাঁবু খাটানোর আয়োজন হয়।

সুধীর বলে, এ ভালই হলো। তাঁবুতে এই প্রথম রাত কাটানো,—নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

ভানসিং সাহেবদের নিকট চাকরি করেছে, তিব্বতও গেছে। তাঁবু সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। তাঁবু খাটাতে গিয়ে এসে বলে, বাবুজি, এ-তাঁবু ত ঠিক নেই। ডবল-ফ্লাই তাঁবু, একটা অংশ সঙ্গে আসে নি। তাঁবুর মুখ যে খোলা থাকবে, ঠাণ্ডা ঢুকবে। গ্রাউণ্ড শীট্-ও দিতে ভুলে গেছে, জমীন্ পর

শোবেন কি করে ?

এ-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই। যাঁরা দয়া করে ব্যবহার করতে দিয়েছেন যেমন তাঁরা প্যাক্ করেছিলেন, তেমনি এনেছি। কী আছে, কী নেই, কিছুই জানি না। শুধু জানি, এ-পথে যা সঙ্গে থাকে, যা যখন যেমন পাওয়া যায় তাই দিয়েই খুশিমনে কাজ চালাতে হয়,—তার বেশি কিছু পেলে আরও ভাল হোত, কখনো ভাবতে নেই। হিমালয়ের পথে এও এক শিক্ষা। তাই তাকে বলি, কুছ পরোয়া নেই। যেমন আছে তেম্‌নি টাঙ্গাও। ওতেই কাজ চলে যাবে।

প্রকাণ্ড তাঁবু। আমাদের পাঁচজনের বিছানা পেতেও প্রচুর খালি জায়গা,—মালপত্র সেইখানে রাখা হয়।

কাছে গ্রাম নেই। ঐ একটিমাত্র দোকানের চালাঘর। দোকানদার এসে বিনীতভাবে অনুরোধ জানায়, স্বামিজী! আপনারা আমার দোকানঘরেই থাকবেন চলুন। বাইরে শোবেন কেন ?

'পিশু'র ভয়ে দোকানে থাকার ভরসা হয় না। পিশু এক ধরনের অতি ছোট পোকা—এদের প্রায় দেখাই যায় না। হিমালয়ের গ্রামের ঘরে ঘরে এদের বাস। ছোট হলেও এদের আক্রমণ অসহনীয়—কামড়ে সারা অঙ্গে ঘা করিয়ে দিতে পারে। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থেকে, একা বাণ বর্ষণে রামলক্ষ্মণকে হয়রান করেছিলেন, আর এইসব পাহাড়ীদের ঘরে ঘরে দেওয়ালে, মেঝেতে ও বিছানাপত্রে আত্মগোপন করে অক্ষৌহিণী পিশু বাহিনী অসহায় পর্যটকের দেহ আক্রমণ করে। হিমালয়ের পথে বাঘ-ভালুকের ভয় নয়, গ্রামের বাড়িগুলিতে রাত কাটাতে হলে পিশুর কামড় এড়ানোই দায়।

পোর্টাররা কিন্তু নিঃসঙ্কোচে নির্ভাবনায় দোকানে আশ্রয় নেয়। সুধীর বলে, ওদের গায়ের চামড়া বোধ হয় 'পিশু-প্রফ্'।

স্বামিজী হেসে বলেন, ওদেরও জামা-কাপড়-কম্বল পিশু-ভরতি, পিশু ওদের নিত্য সঙ্গী। তবুও দেখবেন, এ-অঞ্চলের পাহাড়ীরা রোজ রান্না করতে বসার আগে স্নান করে, কিন্তু ঐ ছেঁড়া জামা কাপড় কম্বল কাচবার আর সুযোগ পাবে কোথায় ?—ঐ এক-বস্ত্রই সর্বস্ব। বড় গরীব দেশ,—তাই-ই বোধ করি অতি-সৎ সরল মানুষগুলি। পিশুর কামড়কে ওরা ভয় করে না।

দোকানদার তার সামান্য যা জিনিসপত্র রাখে, তাই বিক্রী করে। তার

ব্যবসাও চলে, কৈলাস-তীর্থযাত্রীর সেবার সুযোগ পেয়েছে ভেবে মনে আনন্দও পায়।

কলকাতা থেকে সঙ্গে আনা 'পেট্রোমাক্স' আজ প্রথম ব্যবহার করা হয়।

তার আলোর কী প্রখর দীপ্তি! তাঁবুর ভিতর আনতেই মনে হয় যেন বাইরের তরল আঁধারকে ঘনীভূত করে দুহাতে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। অথচ দিনশেষের ঐ স্বচ্ছ আবছা অন্ধকারই ত এই পাহাড়ী দেশের নিজস্ব চিরন্তন শোভা। সভ্য জগতের এই বিদেশী আলোকের তীব্রতা উদ্ধত ও নিষ্ঠুর মনে হয়। ভান্‌সিংকে বলি, তোমার কাজ শেষ হলেই বাতিটা নিবিয়ে দিও। আপাতত: চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ওদিকে আড়ালে রাখো।

ব্রহ্মচারীজিকে তাঁবুর মধ্যে দেখি না।

বাইরে এসে দেখি, কিছু দূরে পাথরের উপর স্থির হয়ে বসে আছেন। ভাবি, প্রকৃতির প্রশান্ত আবেষ্টনে নিবিষ্ট মনে নিভৃত চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন। তখন বুঝি নি, মনের অশান্তির কালো ছায়া বাইরের আঁধারের অন্তরালে লুকাবার চেষ্টা চলেছে।

অল্প পরেই অনুভবানন্দজির কাছে ঘটনাটি শুনি। ব্রহ্মচারীজিকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন! আজ বিকালে উৎরাই-পথে নামবার সময়ও ব্রহ্মচারীজি ঘোড়ায় চেপে নামতে থাকেন। অথচ, উৎরাই-পথে হেঁটে নামলে দম্ ত লাগেই না, বরং মনে স্ফূর্তি জাগে। উপরন্তু, সওয়ার-সমেত নিম্নমুখী পথে ঘোড়ার নামতে অসুবিধা হয়, অযথা কষ্টও বাড়ে। সহিস ব্রহ্মচারীজিকে এই যুক্তি দেখিয়ে ঘোড়া থেকে নামতে বলায় ব্রহ্মচারীজি তখনি তাকে শুনিয়ে দেন, ঘোড়া ভাড়া করা হয়েছে চড়বার জন্যে, খালি-পিঠে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নয়।

এখানে পৌঁছে সহিসের অভিযোগ শুনে অনুভবানন্দজি ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন নি, ব্রহ্মচারীজিকে বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকটা শক্ত কথা বলে ফেলেছেন।

স্বামিজীকে বলি, এতটা না করলেই পারতেন। ওঁর মনে নিশ্চয় লেগেছে।

স্বামিজী হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, বেশ যা হোক্, এতটুকু বুদ্ধি ওঁর হবে না? সহিস ত উচিত কথাই বলেছিল। আচ্ছা, এখনি আমি ওঁর মান ভঞ্জন করে আনছি।

তাঁকে নিষেধ করে আমিই যাই।

ব্রহ্মচারীজির গলা ভার। মনে খুবই ব্যথা পেয়েছেন। সরল মনে বলেন, আমাকে উনি বকবেন কেন ?

আমি বলি, স্বামিজীর অন্যায় হয়েছে। রাগের বশে করে ফেলেছেন। এখন চলুন দুজনের মিলন ঘটিয়ে দিই।

ব্রহ্মচারীজির হাত ধরে তুলে তাঁবুতে স্বামিজীর কাছে দিয়ে আসি। সুধীর উলুধ্বনি দিতে থাকে।

আহারান্তে তাঁবুর ভিতর ভূতলে কম্বলশয্যা পেতে শুয়ে পড়ি। ঠাণ্ডা লাগার কথা মনেও জাগে না, লাগেও না।

তাঁবুর মুখ খোলা। বাইরে প্রকৃতির অন্ধকার রূপ চোখে পড়ে। কালো পৃথিবীর উপর কালো আকাশ। তারই মাঝে অগণিত তারার অজস্র দীপ-শিখা।

চারিদিক শব্দহীন, নিথর, নিস্পন্দ।

হঠাৎ হাত ছড়াতেই মাটির উপর হাত পড়ে। কী স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ !

নিদ্রালসা প্রকৃতির হৃদ্‌স্পন্দন যেন অনুভূত হয়।

অস্ফুটস্বরে কত গানের কত সুর যেন কানে ভেসে আসে। ধীরে ধীরে চোখেও ঘুম নামে !

॥ ৫ ॥

স্বামিজীর ডাকে আবার জেগে উঠি। ঘড়িতে দেখি, এখনও চারটে বাজে নি। বাইরে রাত্রির অন্ধকার তেমনি রয়েছে। আকাশের তারাগুলি বিনিদ্র নয়নে মিটমিট করে তাকায়।

স্বামিজী বলেন, উঠে পড়ুন, এখনি রওনা হওয়া ভাল। সুমুখে কালকের সেই বড় চড়াই। ভোরবেলায় উঠতে কষ্ট অনেক কম হবে।

'জো হুকুম' বলে প্রস্তুত হতে থাকি।

লণ্ঠন ও টর্চের আলোর সাহায্যে বিশৃঙ্খল জিনিসপত্র আবার ব্যাগ্-বন্দী হয়। ভান্‌সিং এরই মধ্যে ঠিক চা তৈরি করে হাজির। সঙ্গে রাত্রে-করে-রাখা একখানা করে রুটি।

দশ মিনিটের মধ্যেই তাঁবু মাটিতে লোটায়। থলে ভর্তি হয়ে পোর্টারের পিঠে আশ্রয় নেয়।

যন্ত্রচালিতের মত সকলেই সাজসজ্জা করে তৈরি। আলস্যের অবকাশ

কোথাও নেই। পথের ডাকে সাড়া দিতে সবাই উদ্‌গ্রীব।

৪টা ২৫ মিনিট। টর্চ হাতে পথ চলা সুরু। যেন, অন্ধকারের বুকে আলোকের বর্শা হেনে সৈন্যদল চলে।

কিন্তু কতোক্ষণই বা? দেখতে দেখতে আঁধার কাটে। ভোরের আলো ফোটে। বনদেবীর ঘুম ভাঙে। গাছে গাছে পাখির ডাক শোনা যায়। গিরিরাজের রাজপ্রাসাদে যেন নহবত বাজে। তারই মাঝে হঠাৎ 'বৌ-কথা-কও'-এর পরিচিত কণ্ঠ বঙ্গজননীর মধুর স্মৃতি মনে টেনে আনে।

দিনের আলো সুস্পষ্ট হলে যে যার ঘোড়ায় উঠি। চড়াই-পথের ক্লান্তি অনেকখানি লাঘব হয়। যথারীতি পিছু পিছু সহিস আসে ঘোড়ার লেজ ধরে। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছাতা আছে, কিন্তু হাতে বয় না, পিছনে পিঠের উপর জামার কলারে ছাতার হ্যাণ্ডেল লাগিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে চলে। এরা পোর্টারদের সঙ্গে মেশে না। হয়ত আত্মসম্ভ্রমে বাধে। এদের পরনে রঙ্গীন পা-জামা, সার্ট, বুক খোলা কোট। নিজেদের ঘোড়ার তদ্‌বিরেই ব্যস্ত থাকে।

কিছুদূর উঠে দেখি, মালবাহকের দল এগিয়ে চলেছে। পিঠের উপর বোঝা। কপালে দড়ি লাগিয়ে পিছনে ঝুলিয়ে দেয় এবং তারই টানে বোঝা-গুলির স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে না। হাতে ছোট লাঠি—ইংরেজি *T* অক্ষরের আকারে। চলবার সময় মাঝে মাঝে তার উপর ভর দেয়। কখন বা পিছন দিকে রেখে বোঝার ভার তার উপর কিছুক্ষণ রাখে, নিজে একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়—এতেই যেটুকু বিশ্রাম পায়। প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল বায়ু। তবুও সারা দেহ তাদের ঘর্মাক্ত। একে পিঠের বোঝা, তায় আবার পাহাড়ের চড়াই। অথচ, চলার মাঝেই মাথা ঘুরিয়ে চোখের তারা বেঁকিয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে, স্বামিজী! আজ সকালে কতো দূর?

অমৃতভবানন্দজি উত্তর দেন, ডিডীহাট। চল স্ফূর্তিতে।

ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ি। সুধীরও নামে। পকেট থেকে এক রাশ সিগারেট বার করে তাদের সকলের হাতে দেয়। আলমোরা থেকে শুধু তাদেরই জন্য বহু প্যাকেট সঙ্গে আনা হয়েছে।

সামান্য সিগারেট। তাই পেয়েই তারা যেন হাতে স্বর্গ পায়।

অনাবিল আনন্দে ও কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে তাদের মুখে কথা ফোটে না। পিট্‌পিট্‌ করে তাকায়। দাঁত বার করে হাসে—শিশুর মত। পিঠের বোঝা

নামিয়ে পাথরের উপর বসে। সিগারেট ধরায়।

স্বামিজী হুঁশিয়ার করেন, দেরি করিস না যেন।

তাদের পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলি।

মালের সঙ্গে থাকা? এ-সব প্রশ্নই ওঠে না। হিমালয়ের পথে মানুষে মানুষে কী অটুট বিশ্বাসের বাঁধন।

চড়াই শেষ হয়।

চড়াই ওঠার পারিশ্রমিকও মেলে। দূরে আকাশের সুনীল সরোবরে তুষার শিখররাজি শ্বেতপদ্মের মত বিরাজ করে। দেখে চোখ জুড়ায়। জায়গার নাম শুনি সন্‌দেও। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু। পাহাড়ের একেবারে মাথা বেয়ে প্রায় সমতল রথ। যেন কেশ বিন্যাস করে সিঁথি কাটা গিরিশিরা। দু পাশে বহু নীচে উরত্যকায় নদীর রেখা দেখা দেয়। অনেকখানি চওড়া পথ। ভয়ের কারণ নেই। মনের আনন্দে হেঁটে চলি।

পথের পাশে দুটি ছোট স্তম্ভ। প্রায় মানুষ সমান উঁচু। একখানা পাথর কেটে তৈরি। থামের চারিদিকের গায়ে পাথরে-খোদা অস্পষ্ট মানুষের মূর্তি। মনে পড়ে, সতী-স্তম্ভের কথা। কিন্তু এখানে কেন? কিংবা হয়ত কোন অজ্ঞাতনামা বিজয়ী বীরের জয়যাত্রার নির্বাক কাহিনী প্রচার করে।

প্রায় মাইল দুই এসে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি। শুনি, একঘর দেশীয় ক্রিশ্চান বাস করেন। ধর্ম-পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার মনোভাব লাভ করেছে, দেখি।

সাত মাইল দূরে ডিণ্ডীহাট বনবিশ্রাম ভবন। প্রায় ৬০০০ ফুট্ উঁচুতে। শেষের খানিকটা পথ উৎরাই। বেলা সাড়ে আটটা বাজে। চির্ ও ফার্ গাছের বনের মধ্যে অতি শান্ত রমণীয় পরিবেশ। বাংলোর সুমুখে কয়েকটি বড় গাছ, কেন জানি না, কেটে দিয়েছে, কাটা গুঁড়ির অংশগুলি ক্ষতদেহে তারই যেন অভিযোগ জানায়।

বাংলোর বারান্দায় বসে বিশ্রাম করি। সুমুখে প্রসারিত হিমালয়ের বিচিত্র শোভা। যতদূর দৃষ্টি যায়, পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ খেলে দিগন্তে মিশে থাকে।

সুধীর অদূরে গাছের ছায়াতলে বসে। আপন মনে গান ধরে।

বেলা চারটায় আবার চলা সুরু। পথ চলতেই যেন আসা। চলার পর ক্ষণিক বসা। বিশ্রামান্তে আবার চলা।

নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। লোকে বলে, বাঘ ভালুকের আস্তানা। বনের পশু বনে থাকে, বিচিত্র কি? ভয় জাগে না মনে। প্রাণীর হিংসাবৃত্তির কথা স্মরণই হয় না এ-পথে। কেমন যেন মনে হয়, এই অরণ্যই আদিম মানবের বাসভূমি, এই হিমালয়ই ত সাধুমহাত্মার তপস্যা-ক্ষেত্র। এখানে দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দের সন্ধান নয়, অপার শান্তির অপার্থিব পরিতৃপ্তি।

ভাবের আবেগে ধীরপদে এগিয়ে চলি। পথে চড়াই নেই। পাহাড়ের মাথা বরং অল্প নেমে যায়। কখন বা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। আনন্দ পাই হাঁটতে। মন মিশে যায় প্রকৃতির মাঝে। এ যেন সকল ভুলে উজাড় করে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া।

কিছুদূরে গ্রাম দেখা যায়। ঐ শুনি ডিণ্ডীহাট। বাংলো থেকে অনেকখানি দূরে। বড় গ্রাম। প্রাচীন এক মন্দিরের চূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

পথের ধারে কয়েকটি বাড়ি। ক্রিশ্চান মিশনারীদেরও একটি বাসগৃহ পরিচ্ছন্নতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপন মর্যাদা ঘোষণা করে।

দু মাইল গিয়ে কানা-ধর। খানিক চড়াই পথ ছাড়িয়ে আসা। তাই শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামযোগ্য স্থান। নিকটে জলের ধারা। পথের পাশেই দোকান।

এবার উৎরাই নামা। মাইল তিনেক নেমে দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে সাজানো সুন্দর শহর। আসকোট। ৫,০০০ ফুট উঁচু। সহরে পৌঁছবার আগে রাস্তা ছাড়িয়ে অল্প উপরে বন-বিশ্রাম-গৃহ।

স্বামিজী বলেন, কৈলাসের পথে বনবিভাগের বাংলো এর পর আর নেই। ধারচুলা ও গার্বিয়াঙে বাংলো আছে, সে দুটি জেলা পরিষদের।

সুধীর প্রশ্ন করে, কতো মাইল আসা হোল আলমোরা থেকে?

স্বামিজী জানান, মাইল সত্তর হবে। গার্বিয়াঙ-এর প্রায় অর্ধেক পথ চলে এলেন, দেখছেন কি সুধীরবাবু! আসকোটে আসবার আর একটা পথও আছে —পিথোরাগড় হয়ে। মাত্র ২৫ মাইল দূর পিথোরাগড় এখান থেকে।

সন্ধ্যা সাতটা বাজে। আজ এইখানে রাত কাটানো। বাংলোর বারান্দায় উঠি। সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি নামে। যেমন হঠাৎ আসে, তেমনি হঠাৎ-ই থামে। আকাশ মেঘমুক্ত হয়, দু একটা তারা ফোটে। বাংলোর আশেপাশে কয়েকটি ওক্ গাছ। গাছের পাতার একদিক সাদা। সন্ধ্যার আবছা আঁধারে জলসিক্ত পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্ করে। গগনপ্রান্তে নন্দাদেবী

ও নন্দাকোটের তুষারশিখরগুলিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আসকোট কৈলাস-পথে বড় শহর। নামের মাঝেই তার প্রমাণ ধরে। আশি কোট বা আশিটি দুর্গ থেকে নামকরণ। আশিজন রাজা বা জমিদারের প্রতিপত্তি এখানে এককালে ছিল। স্বামিজী বলেন, এখন সে-সব রাজাদের দিন গেছে। তবুও, এখানকার যে জমিদার তাকে বলা হয় রাজওয়ারা। কৈলাস তীর্থযাত্রীদের যথাসাধ্য সাহায্য করা এঁরা ধর্মের অঙ্গ বলে গণ্য করেন। আমরা এসে পৌঁছেচি সন্ধ্যাবেলায়, তবুও কোন রকমে তার কানে খবরটা পৌঁছে গেলে কাল সকালেই দেখতেন, চাল, ডাল, ঘি, সব্‌জি ইত্যাদির ডালি এসে যেত।

এখান থেকে পিথোরাগড়ের তারঘরে টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা হতে পারে জেনে কলকাতায় একটা তার পাঠাই,—নির্বিঘ্নে ভালভাবে যাত্রা চলেছে।—মা নিশ্চয় ভাবছেন। আমার মনে কিন্তু কোন ভয়-ভাবনা নেই। শরতের সুনীল আকাশে যেন সাদা মেঘের মত ভেসে ভেসে চলি।

রাত্রে কম্বল শয্যায় শুয়ে গল্প হয়। সুধীর বলে, স্বামিজী, আসকোট বললেন আলমোরা থেকে মাইল সত্তর দূরে, গার্বিয়াঙ-এর প্রায় অর্ধেক পথ এসে গেছি,—এলামও পাঁচদিন। কিন্তু সেই যে কৈলাসে আঠারো হাজার ফুটেরও ওপর যেতে হবে, সেদিক থেকে ত কিছুই এগুনো যায় নি। আলমোরা সাড়ে পাঁচহাজার ফুট্ উঁচু, আর আজও রয়েছি আসকোটে,—পাঁচ হাজার ফুট্ উঁচুতে!

সুরেন মহারাজ হেসে বলেন, সুধীরবাবু পাকা অ্যাকাউন্‌টান্‌ট,—হিসেবটি কেমন রাখেন! অনুভবানন্দজি উত্তর দেন, সুধীরবাবু এই কৈলাসপথের রহস্যটা ঠিকই ধরেছেন। প্রতিদিন আমরা যেমন রোজগার করেছি, তেমনি খরচও করেছি,—এখনও লাভের অঙ্ক শূন্য। এই পথের বৈচিত্র্য হল চড়াই উৎরাই-এর যেন শেষ নেই। চারদিকে পাহাড় আর খদের জালবোনা। আলমোরা ছাড়া অবধি প্রতিদিনই ছয় হাজার সাত হাজার ফুট্ উঁচুতে ওঠা, আবার অপর দিকে তিন চার হাজার ফুট-এ নেমে যাওয়া।

সুধীর গুন্‌গুন্ স্বরে আবৃত্তি করে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি।

স্বামিজী বলেন, হিমালয়ের এই গাড়োয়াল-কুমায়ুনের বর্ণনা নিয়ে একটা কিংবদন্তীর প্রচার আছে, শুনবেন সুধীরবাবু? গাড়োয়াল রাজ্য সে-সময়

আকবর বাদশাহের অধীনে। গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগর। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ শ্রীনগর নয়। বদরীনাথের পথে গাড়োয়াল শ্রীনগর। আকবর শ্রীনগরের রাজাকে দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, তার অধীনস্থ রাজ্যের আর্থিক অবস্থা কেমন এবং জায়গাটিই বা কী ধরনের? সুরসিক শ্রীনগর-রাজ পরদিন রাজদরবারে হাজির হলেন,—সঙ্গে এক অতি শীর্ণকায় উট! সবিনয়ে নিবেদন করলেন, সম্রাট, আপনি যা জানতে চেয়েছেন, সঙ্গে করে তার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি এই নিয়ে এসেছি। আমার অধীনস্থ দেশের এই হোল প্রকৃত অবস্থা,—যেমন উঁচু-নীচু, অসমতল,—তেমনি দীনহীন বুভুক্ষু!

রসগ্রাহী সম্রাট সন্তুষ্ট হন। শ্রীনগররাজের কাছ থেকে কোনও রকম কর আদায় নিষিদ্ধ হয়। বুঝলেন সুধীরবাবু, আমরা এখন সেই উটের পিঠের কুঁজের ওপর দিয়ে চলেছি, মাথায় চাপতে এখনও দেরি!

॥ ৬ ॥

৫টা ৪৫ মিনিট।

ভোরের আলো-আঁধারের মধ্যে আবার পথ চলা সুরু। শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়া। বেশ বড় শহর। কাল সন্ধ্যায় পৌঁছে ভালভাবে দেখা যায় নি। এখনও আব্‌ছা আলো। তারই মধ্যে দেখি, বাঁদিকে আসকোটের রাজওয়ারার প্রাসাদ। অনতিদূরে আর একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। খড়্গ সিং বাহাদুরের। এখানকার এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। একপাশে আসকোটের রাণীজির দানশীলতার প্রতীক সুন্দর ধর্মশালা। স্বামিজী বলেন, যাত্রীরা এসে এইখানেই ওঠে। পথের দুধারে নানা রঙের ফুল ও ফলের গাছ। পাহাড়ী দেশ। এতো সকালে শহরের ঘুম ভাঙে না। জনশূন্য শহরের পথ ছেড়ে কিছুক্ষণ যাবার পর দিনের পরিষ্কার আলো ফোটে। পাশের পাহাড়ের উপর থেকে আসকোট জনপদের দৃশ্য আঁকা ছবির মত দেখায়।

আবার বনমধ্য দিয়ে পথ। অরণ্য ও লোকালয়—এরি যেন মালা পরে বসে থাকেন হিমালয়। এবার পাহাড়ের উপর থেকে আবার হুড়হুড় করে নেমে চলা। বৃষ্টি হলে এ-পথ নিশ্চয় অতি পিচ্ছিল ও দুর্গম হয়ে ওঠে। এখন নির্ভয়ে নামা। উৎরাই-পথে নামতে দম্ লাগে না। চলায় স্ফূর্তি আসে, গতিবেগও বাড়ে,—সবই ঠিক। কিন্তু পায়ের উপর জোর বেশি পড়ায়, ওঠার চেয়ে নামায়

পায়ে ব্যথা হয় বেশি! প্রায় মাইল তিনেক নেমে আড়াই হাজার ফুট্ নীচে গোরী নদীর ধারে আসি। নদীর খরস্রোত গম্ভীর গর্জন তুলে ছুটে চলে। নদীর তীরে বড় বড় শিলাখণ্ড। যেন, কালো পাথরের বেদি বিছানো। তারই উপর আসীন হয়ে সবাই মিলে ফ্লাস্কে-ভরে-আনা চা নিঃশেষ করি। এপারে পাহাড়ের মাথা থেকে সুদৃশ্য এক জলপ্রপাত সবেগে লাফিয়ে পড়ে, গোরীনদীর স্রোতে আত্মোৎসর্গ করে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে নদীর উপর মানবসৃষ্ট লৌহসেতু। পুলের উপর দাঁড়িয়ে নদীর উন্মত্ত প্রবাহের তাণ্ডব নৃত্য দেখি।

সুধীর হঠাৎ ভয়-চকিত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, আরে! আহা,— পাখিটা গেল একেবারে! দেখি, একটা নর, দুটো পাখি নদীর দুরন্ত স্রোতের মধ্যে পড়ে নিমেষে জলতলে অদৃশ্য হয়। কিছু দূরেই আবার তাদের দেহ ভেসে ওঠে। স্রোতের বিপরীত মুখে চলবার তাদের কী আপ্রাণ নিষ্ফল চেষ্টা! চক্ষের পলকে স্রোতমুখে জলের-মধ্যে-থেকে মাথা-উঁচু একটা পাথরের কাছে আসতেই পাথরটির উপর তারা জল ছেড়ে উঠে বসে। ঝট্‌পট্ করে ডানা ঝাপটায়। থরথর করে কাঁপে। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। সুধীর বলে, উঃ! পাখি দুটো কি আশ্চর্য রকম বেঁচে গেল! একেই বলে, রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?

ব্রহ্মচারীজি উল্লসিত হয়ে বলেন, দেখুন দেখুন,—এ আবার কাণ্ড দেখুন!

পাখি দুটি পাথর থেকে উড়ে গিয়ে আবার নদীর কিছু উপরে স্রোতের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর,—আবার সেই স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া, স্রোতের আবর্তে পাক খাওয়া, জলতলে অদৃশ্য হওয়া, স্রোতের প্রতিকূলে যাবার বিফল প্রয়াস,—সব কিছুর পুনরাবৃত্তি করে আবার সেই পাথরের উপর নিরাপদ উপস্থিতি। আবার ক্ষণিক বিশ্রাম, আবার উড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ। এ-যেন মরণের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা।

স্বামিজী বলেন, সুধীরবাবু! এ আপনারা নতুন দেখছেন। এ-অঞ্চলের এই ধরনের পাখি মাঝে মাঝে এমনি অদ্ভুত খেলাই দেখায়। এ তো আর বাংলা দেশের পুকুরের শান্ত হাঁস নয়,—নিঝুম দুপুরে স্তব্ধ জলে গা ভাসিয়ে স্থির হয়ে ভেসে থাকবে। যেমনি পাহাড় দেশ, তেমনি পাহাড়ী পাখির পাহাড়ে খেলা।

তাকিয়ে দেখি, পাখি দুটি তখনও তেমনি খেলে চলে। জল ছেড়ে ওঠে,

ডানা ঝাপটে জল ঝরায়। মাথা নেড়ে এদিক ওদিক তাকায়। মাথা দোলায়। যেন, সার্কাস দেখিয়ে প্রশংসার অভিবাদনের প্রত্যাশা করে। পাখিগুলির গায়ের রঙ্ বাদামী—চকোলেট। গলা ও বুকের কাছে ধব্ধবে সাদা। এদেরই নাম কি Dippers ডুবুরি ?

নদীর অপর পারে আসি। পথের পাশে ছোট দোকান। পোর্টাররা বিশ্রাম করে। আমাদের দেখে একগাল হাসে। সুধীর অর্থ বোঝে। সিগারেট বিলি করে।

জায়গার নাম শুনি গর্জা। নামের মধ্যেও যেন নদীর গর্জনের প্রতিধ্বনি।

নদী পার হয়ে রাস্তা দু'দিক পানে যায়। বাঁ দিকের পথ, নদী যে দিক থেকে নেমে আসে, সেই দিকে এগিয়ে যায়। স্বামিজী বলেন, সুধীরবাবু, যাবেন নাকি ঐ পথ ধরে ? ওদিক দিয়েও তিব্বতে পৌঁছনো যায় - মুন্সিয়ারি, মিলাম হয়ে। ও-অঞ্চলের নাম জোহার পট্টি। ওদিকের ভোটিয়া বাসিন্দাদের বলে জোহারী। সেদিক দিয়ে মানস সরোবর-কৈলাস দর্শনে গেলে অনেকখানি ঘুর হয়,—উন্টাধুরা (১৭,৯৫০ ফুট্), জয়ন্তী (১৮,৫০০ ফুট্), ও কুংরিবিংরি (১৮,৩০০ ফুট্)—তিন তিনটে পাশ্ পার হতে হয়—এক দিনে একের পর এক। বিকট দুর্গম পথ। তার তুলনায় আমাদের লিপু পাশ্ (১৬,৭৫০ ফুট্) অনেক সোজা। আমাদের পথ গেছে এই ডান দিকে ;—গোরী নদী, যাঁকে লোকে গৌরী বলে, আমাদের সাথী নয়। এগিয়ে চলুন এই পথ ধরে, অল্প গিয়েই দেখতে পাবেন আমাদের লিপুলেখ যাত্রা-পথের নতুন সাথীটিকে—কালীনদীকে। ঐ নদীকেই লক্ষ্য রেখে আমাদের লিপু পৌঁছানো।

সুধীর বলে, হিমালয়ে তাহলে গৌরীদেবীর দর্শন পেয়েও আমাদের কালী-মায়ের শরণ নেওয়া ?

স্বামিজী হেসে বলেন, তাই। তবে কালীনদীরও আর এক সুন্দর নাম আছে,—সর্দা অর্থাৎ সারদা।

খানিক পাহাড় বেয়ে উঠে এগোতেই নীচে দেখা যায় শৈলশ্রেণী ভেদ করে দুই দিক থেকে দুই নদী এসে মিলিত হয়,—গোরী ও কালীর সঙ্গম। গৌরী লুপ্ত হন্ কালীর কোলে।

সুধীর বলে, এরপর ওদিক দিয়ে কালী কোথায় নেমে গেলেন ?

স্বামিজী বলেন, আরও দক্ষিণে নেমে কালীর সঙ্গে সংযোগ হোল সরযূর

—যে-সরযূ আমরা চারদিন আগে সেরাঘাটে পার হয়ে এলাম। তারপর টনকপুরের কাছে এ-নদী সমতলে পড়ল। নাম রইল সারদা। ওদিকে মানস সরোবরের নিকটে যে-কর্ণালী নদীর জন্ম,—খোজরনাথে যান্ ত সে-নদী দেখতে পাবেন—সেই কর্ণালী নেপালের মধ্যে দিয়ে এসে ভারতের সমতলে পেঁাছে নাম পেল গোগরা বা ঘর্ঘরা। সারদার সঙ্গে তার মিলন হোল উত্তরপ্রদেশের চৌকাঘাটে। নদীর তখন আবার নাম হয়ে গেল—সরযূ বা ঘঘরা। অযোধ্যা সেই সরযূর তীরে। গঙ্গায় সে-নদী মিলেছে বেহারে ছাপ-রার নীচে।

ব্রহ্মচারীজি মন্তব্য করেন, এ-সব অঞ্চলের ভূগোল আমাদের অনুভবানন্দজির নখদর্পণে।

স্বল্পবাক্ সুরেন্দ্র মহারাজ জানান, তা হবে না কেন বলুন? এই ত কাল আমরা পেঁাছুব ধারচুলায়—তাই না অনুভবানন্দজি? সেইখানে উনি ছিলেন ক'বছর,—কৈলাসের পথে এই পাহাড়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম গড়ে।

আমি বলি, শুধু পাহাড়-পর্বতের ভূগোল জ্ঞান কেন? পথ চলতে রোজই দেখা যাচ্ছে, এ-অঞ্চলে অনুভবানন্দজির সর্বত্রই পরিচিত লোকজন। স্বামিজী যেখানেই থাকেন, সবাইকে নিয়ে মিলে মিশে। সারাক্ষণই ব্যস্ত, কি করে মানুষের সেবা করা যায়। তাই লোকেও মনে রাখে।

স্বামিজী হাসেন। বাধা দিয়ে বলেন, ও-সব বাজে কথা রাখুন দিকিনি। কোথা দিয়ে চলেছেন, সেইটে এখন দেখুন। সঙ্গমের ওপর ঐ যে প্রকাণ্ড গ্রাম দেখছেন,—জায়গাটার নাম হোল জৌলজীবী। ২০০০ ফুট উঁচু। এ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান। সঙ্গমের নিকট আমবাগানের মধ্যে ঐ শিবমন্দির। পাশেই ওটা আশ্রম। ওখানে যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। এখন নির্জন শান্ত দেখছেন, ভাবছেন, এ-পথে এ তো স্বাভাবিক দৃশ্য। কিন্তু, আসেন যদি শরৎকালে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে—তখন দেখবেন এখানে কী বিরাট মেলা বসে। বসবার কারণটা বলি,—এ-সব অঞ্চলের লোকজনের জীবনধারার ইতিহাস তাহলে কিছু জানতে পারবেন। পাহাড়, নদী, লোক, লোকালয়, —এসব নিয়ে হোল ভূগোল। আর মানুষের প্রয়োজনে হোল হাট, বাজার, মেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য। এখন এই জৌলজীবীর অবস্থান কোথায় দেখুন। ঐ যে কালীনদী—ওর অপর পারেই নেপাল।

সুধীর বলে, ওপারে যাবার একটা পুলও রয়েছে দেখছি?

স্বামিজী বলেন, ঠিকই দেখছেন, অর্থাৎ নেপালের সঙ্গে এ-জায়গাটার সংযোগ রয়েছে। তবে, ও-সব সাময়িক পুল, বর্ষা নামলে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়,—বর্ষা থামলে আবার তৈরী করে। এখন এই যে কালীনদী আমরা পেলাম, লিপুলেখ পর্যন্ত ইনি সঙ্গে থাকবেন। এই নদী হোল ভারত আর নেপালের মধ্যবর্তী সীমানা। আমরা চলব এপারে ভারত সীমান্ত দিয়ে,—শেষের দিকে অবশ্য দু'এক জায়গায় ওপার দিয়েও আমাদের খানিকটা পথ যাবে—

সুধীর উৎসাহিত হয়ে বলে, তা হলে আমাদের নেপাল-ভ্রমণও হবে?

স্বামিজী বলেন, নেপালের মাটি ছুঁলেই যদি নেপাল-ভ্রমণ হয়, তা হলে তা হবে বইকি। এখন শুনুন, ঐ গৌরীনদীর উপত্যকার ওপর-অংশে যেমন জোহারী ভোটিয়াপট্টি, তেমনি এই কালীনদীর উপত্যকাতেও এগিয়ে গিয়ে ভোটিয়াদের পট্টি পাব—প্রথমে চৌদাস, পরে বিয়াস্‌পট্টি। আবার, খেলার পর দেখতে পাবেন ধৌলী নদী,—কালীতে এসে মিশেছে। সেই নদীরও উপর-উপত্যকায় হোল দর্‌মাপট্টি—দর্‌মা ভোটিয়াদের বাস। এইসব অঞ্চলের ভোটিয়ারা জাত-ব্যবসায়ী। তিব্বত ও ভারতের মধ্যে এরা ব্যবসা চালায়। এই ভোটিয়াদের সম্পর্কে পরে একদিন গল্প করব।—এইবার বুঝতে পারছেন, জৌলজীবীতে গৌরীনদীর উপত্যকা থেকে জোহারীরা নেমে আসে, কালী নদীর দিক থেকে আসে চৌদাস, বিয়াস আর দর্‌মার ভোটিয়ারা; আবার ও-পার থেকে চলে এল নেপালীরা, আর আমাদের ভারতের সমতলের ব্যাপারী? তারা ত আসেই। অতএব, জৌলজীবী ব্যবসার একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে, আশ্চর্য কি?

সুধীর প্রশ্ন করে, কি ধরণের মালপত্র নিয়ে এত ব্যবসা চলে?

স্বামিজী বলেন, যে দেশে যা জন্মায় বা তৈরী হয়,—আর মানুষের যার যেটা কাজে লাগে—তারই বেচা-কেনা চলে। ভোটিয়ারা নিয়ে আসে তিব্বতী কার্পেট, নানা ধরণের কম্বল, চাদর, উল-পশম, বাঘ হরিণ ভালুক—এসবের চামড়া, চামর, মৃগনাভি, পাহাড়ী লবণ, সোহাগা, শিলাজতু ইত্যাদি। পাহাড়ীরা আনে ঘি, মধু, মাখন—এইসব। তাছাড়া ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গরু, মহিষেরও হাট বসে। সমতল থেকে আসে চাল ডাল চিনি মিছরী গুড় ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য, মিলে-তৈরি জামা-কাপড়, সভ্যজগতের বহু সামগ্রী,—

মেলার শৌখিন নানান্ সাধারণ মালপত্র ত আছেই। তাহলে এখন বুঝতে পারছেন, এই যে হিমালয়ের মধ্যে সব বড় বড় নদীর উপত্যকা,—বরফের পাহাড় ডিঙিয়ে তিব্বত যাবার কয়েকটা পাশ্,—গিরিপথ,—এ শুধু কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার তীর্থপথই নয়,—তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা চলা-চলেরও অতি প্রাচীন রাস্তা।

সুধীর বলে, এতক্ষণে বুঝলাম,—যে-পথ ধরে চলেছি ধর্ম মোক্ষ এবং অর্থ সব কামনা মেটাবারই পথ।

সবাই হেসে ওঠেন।

সুরেন্দ্র মহারাজ বলেন, সুধীরবাবু এক একটা কথা ছাড়েন বেশ! চলুন এখন এগোনো যাক্। কালীমায়ের প্রথম দর্শন পাওয়া গেল—প্রণাম করে মায়ের আঁচল ধরে নির্ভয়ে এগিয়ে চলুন।

কালীনদীর অনেক খ্যাতি এতদিন লোকমুখে শোনা। এইবার চোখে দেখি, কী প্রচণ্ড বেগে উন্মাদিনী বেশে ধেয়ে নামেন দুই দিকের পাহাড় ছিন্ন-ভিন্ন করে। খড়্গহস্তা কালীমূর্তিই বটে!

আজ আর চড়াই উৎরাই বেশি নেই। মামুলী পাহাড়ী রাস্তা। মাঝে মাঝে অনেকখানি সমান পথ।

একটি ছোট গ্রাম ও ঝরনা পার হয়ে বালুয়াকোটে পৌঁছুই। আসকোট থেকে দশ মাইল আসা হোল।

বেলা ১১টা ২০।

চারদিকে মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর রৌদ্র পাহাড়ের বুকে আগুনের শিখা জ্বালায়। দীপ্ত রৌদ্রের মাঝে শেষ পথটুকু চলতে সকলেরই ক্লান্তি বোধ হয়।

বালুয়াকোট গরম জায়গা, যদিও তিন হাজার ফুট্ উঁচু। পাশেই কালী-নদী। প্রশস্ত ধারা। জলের ঘোলাটে রঙ্ দেখে স্বামিজী বলেন, ওপরে নিশ্চয় খুব বরফ গলছে। দেখবেন লিপুলেখের কাছে এই কালীরই আর এক রূপ,—শীর্ণ শান্ত ধারা। নদীর এই বরফগলা জল—অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ত হবেই, তবুও মিষ্ট স্বাদ। তা বলে, এখনি হেঁটে এসে খাবেন না যেন। খানিক বিশ্রাম নিন্।

নদীর অপর পারে নেপাল রাজ্যে একটা ঘর দেখা যায়।

বালুয়াকোটে বিশেষ লোকজন দেখি না। শুনি, প্রকৃত গ্রাম আরও কিছু দূরে। পাহাড়ের একটু উপরে। পথের ধারে বিরাট পিপল গাছ। গুঁড়ি

ঘিরে পাথর দিয়ে বাঁধানো বেদির মত,—চবুতর। গাছের স্নিগ্ধ ছায়াতলে সবাই বিশ্রাম করি। নিকটে মুসলমানের একটি দোকান। ভানুসিং এসে জানায়, চাল ও ডাল ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। স্বামিজী বলেন, ঠিক আছে। খিচুড়ি হোক্,—কি বলেন সুরেন মহারাজ ?

অদূরে স্কুলগৃহ। অতিশয় অপরিচ্ছন্ন।

একপাশে একটি ছোট চালাঘরে একঘর পাহাড়ী পরিবার বাস করে। স্বামী, স্ত্রী ও ছোট দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। ঘরের বাইরে উনানের উপর স্ত্রী রান্না চড়িয়েছে। তারই আশপাশে কয়েকটা মুরগি খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। বোধ করি তাদেরই একপাল ভেড়াছাগল রৌদ্রের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গাছের ছায়ায় জড় হয়ে বসেছে। বড় মেয়েটির বয়স ছ'সাত বছরের বেশি হবে না। তার ছোট ভাইটিকে কাপড়ের বাঁধন দিয়ে অক্লেশে পিঠের উপর ঝুলিয়ে আমাদের কাছে এসে কৌতূহলী নয়নে দাঁড়ায়। পকেট থেকে কিস্‌মিস্, বাদাম ও লজেন্স বার করে তাদের হাতে দিই। ছোট ছেলেটি একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে দিদির পিঠের উপর থেকে তার শূন্য হাতখানি আবার বাড়িয়ে ধরে। সলজ্জ দিদি মুখ ঘুরিয়ে তাকে শাসন করে এবং ছুটে গিয়ে নিজঘরে প্রবেশ করে দেওয়ালের পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখতে থাকে।

গৃহস্বামীরও নবাগতদের সম্বন্ধে কৌতূহলের অবধি নেই। দোকানদারের সঙ্গে গবেষণা করে, ভারতের কোন্ প্রদেশ থেকে আমরা আসছি। বৈচিত্র্যবিহীন দিনগুলি তাদের শান্তভাবে কাটে। স্বল্প পরিসর জগৎ তাদের। তবুও তারই মাঝে আপনভাবে তারা সুখী। আধুনিক সভ্যতার জটিল সমস্যাবলী হিমাচলের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেদ করে এখনও তাদের শান্তিময় গৃহব্যবস্থা দুর্বিষহ করে তোলে নি। এই অকিঞ্চন জীবনযাত্রার নিস্তরঙ্গ প্রবাহ তৃপ্তি ও অনাবিল আনন্দের সাক্ষ্য স্বরূপ বহে চলে। কয়জন পরদেশী পথিকের ক্ষণিক বিশ্রামেই তাদের দৈনন্দিন জীবনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

পথের অপর প্রান্তে সারি সারি কয়েকটি ছাদবিহীন গৃহ। ঘরের চারিপাশের পাথর-গাঁথা শুধু দেওয়ালগুলি কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে।

সুধীর আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, বাড়িগুলোর অমন দুর্দশা কেন ?

স্বামিজী উত্তর দেন, আবার সেই ভোটিয়াদের কথাই এল। শীতকালে এই দিকের বিয়াস্, চৌদাস্, দর্‌মার ভোটিয়ারা যাদের গ্রাম পাহাড়ের খুব উঁচু জায়গায়—তাদের সেখানকার বাসস্থান ছেড়ে সংসার নিয়ে নেমে আসে

পাহাড়ের এই সব নীচের দিকে। এই ধারচুলাতেও আসে, শীতকাল কাটিয়ে আবার ওপরে স্বগ্রামে ফিরে যায়। এ-সব হোল তাদেরই কারও কারও ঘর। শীতের সময় তারা এলে এই দেওয়ালগুলোর ওপর ছাদের ছাউনি পড়ে, ঘরে ঘরে সংসার পাতে। সে-সময়ে অনেক ভোটিয়া ব্যাপারী পাহাড় ছেড়ে একেবারে সমতলেও নেমে যায়। সেখানে এই কালীনদীরই ধারে টনকপুর—ওদিকের শেষ রেল স্টেশন—সেইখানেও ভোটিয়াদের শীতকালীন একটা ব্যবসা কেন্দ্র।

ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাই। নীচে থেকে ডাক হরকরা আসে। মাথায় গোল কালো টুপি। গায়ে হাত কাটা সার্ট। পরনে হাফ্‌প্যাণ্ট। পায়ে শক্ত চামড়ার প্রকাণ্ড জুতা। পিঠের বিপুল থলির ভারে শরীর ধনুকের আকার নিয়েছে। দুপুরের নিদারুণ রৌদ্রে মুখের উজ্জ্বল কান্তি রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে।

দশ মাইল দূরে ধারচুলা। সেই পর্যন্ত এই লোকটি ডাক নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আবার অন্য 'রানার'-এর ব্যবস্থা আছে। একই লোকের পক্ষে পাহাড়ের সারাপথ ডাক নিয়ে যাওয়া শুধু সময়-সাপেক্ষই নয়, দুঃসাধ্যও বটে। তাই আলমোরার পর থেকে পিয়নদের কিছুদূর অন্তর পথ ভাগ করা আছে, সেই একই রাস্তাটুকু দিনের পর দিন তারা ডাকের ঝোলা কাঁধে যাতায়াত করে। তাদের এই দৈনন্দিন অভিযানের পথ তাদেরই হাতের বল্লমের মাথায়-বাঁধা ঝুমঝুমিগুলির ঝুমঝুম্ শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। বন্যজন্তু সে-শব্দ শুনে লুকায়, সর্পও সভয়ে পথ ছাড়ে।

সুমুখের দোকানে বসে ক্লান্ত পিয়ন ক্ষণিক বিশ্রাম খোঁজে।

হঠাৎ স্বামিজীকে দেখে ছুটে আসে। পায়ের ধূলা নেয়।—"আরে স্বামিজী! আবার কৈলাস চলেছেন? পথে যদি কোন সেবায় আসতে পারি, হুকুম করুন।"

অনুভবানন্দজি তার কুশল সংবাদ নেন্। প্রাণ খুলে দুজনে আলাপ করেন। সবাই তাঁর আপন জন।

পিয়নের ব্যাগ দেখে বাড়ি-ছাড়া মন বাড়ির পানে ছুটে চলে। মনে পড়ে যায়, আলমোরা ছাড়ার পর পথে এখনও কোথাও বাড়ির চিঠি পাওয়া সম্ভব হয় নি। কাল রাত্রে খেলা পৌঁছুব। সেখানে এ-পথে প্রথম চিঠি পাওয়ার

কথা আছে। পোস্ট মাস্টারের কেয়ারে ঠিকানা দেওয়া। ভাবি, হয়ত সুমুখের ঐ থলিটির ভিতর বাড়ির সেই চিঠি চলেছে। বাড়ির চিঠি! মন আনচান করে ওঠে। কিন্তু, এখনি পাবার কোনও উপায় নেই। থলির মুখের সীলমোহর রক্তচক্ষু রাঙিয়ে বিরাজ করে!

আজ রাত্রে বেশি দূর যাওয়া নয়। মাত্র পাঁচ মাইল দূরে কালিকায় রাত্রিবাসের কথা। তাই সূর্যের তাপ কমলে বালুয়াকোট ছাড়ি। কিন্তু সুখ খুঁজলেই ত সব সময়ে সে আসে না। কালিকা পৌঁছুবার আগেই সন্ধ্যার ছায়া নামে। সহসা নিবিড় কালো মেঘে দিনের শেষ আলোটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলে। দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামে। সঙ্গে আলো নেই। পথে আশ্রয় পাবার মত স্থানও দেখা যায় না। তার উপর চড়াই পথও সুরু হয়। বহু নীচে কালীনদীর হুঙ্কার তীব্রতর হয়ে ওঠে। মেঘের গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগায়। অবিরত বিদ্যুতের ঝলসানি প্রকৃতির এই রুদ্র মূর্তিকে আরও কঠোর ও ভয়াবহ করে তোলে। পিচ্ছিল পথে সাবধানে অন্ধকারে পা ফেলে চলা সহজ না হলেও, কেন জানি না, প্রকৃতির এই প্রলয়মূর্তি মনে অদ্ভুত আনন্দ আনে।

মেঘ দেখে অনুভবানন্দজি ত্বরিত পদে কালিকায় এগিয়ে গেছেন। গ্রামে পৌঁছুবার কিছু আগে দেখি, তিনি লণ্ঠন ও লোকজন নিয়ে এই জলের মধ্যে আবার ফিরে আসেন। মুখে অভয় বাণী,—'কিছু ভয় নেই। এই দেখুন আলো এসে গেছে। সাবধানে পা ফেলে গ্রামের দিকে নেমে চলুন।'

গ্রামে প্রবেশ করে ছোট একটা চালাঘরে আশ্রয় নেওয়া হয়। রাত সাড়ে আটটা বাজে। ওয়াটারপ্রুফ্ ভেদ করে বৃষ্টির জল গায়ের জামাকাপড় কিছু কিছু ভিজিয়েছে। জুতা, মোজা জলে ভরতি। তার উপর পাহাড়ের সজল কন্‌কনে বাতাসে দেহে কাঁপন জাগায়। মালপত্র এখন কিছুই আসে নি। রাত্রের এই দুর্যোগের মধ্যে আসবে বলে আশা নেই। ভান্‌সিং কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রামবাসী একজনের কাছ থেকে গরম চায়ের ব্যবস্থা করে আনে। স্বামিজীও কোথা থেকে রাত কাটাবার মত কয়েকখানি কম্বলও যোগাড় করেছেন। নিকটে স্কুলগৃহ। বলেন, সেইখানে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে এলাম, চলুন ওখানে রাতটা কাটানো যাবে।

পাহাড়ের চারদিকে গা বেয়ে কল্‌কল রবে বৃষ্টির জল নেমে চলে। তারই শুধু অবিরল শব্দ কানে আসে। করিতকর্মা বুদ্ধিমান ভান্‌সিং এরই মধ্যে কখন

খানকয়েক রুটিও পাকিয়েছে। আজ রাত্রে তাই যথেষ্ট। পোর্টারদের জন্য মন দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে। এই জলে ও অন্ধকারে বেচারীরা না জানি কতো দুর্ভোগই ভোগ করছে। কোথাও কি একটু আশ্রয়ও মেলে নি ?

রাত প্রায় বারোটা।

স্কুলের বাইরের বারান্দায় শোরগোল শুনে টর্চ হাতে উঠে আসি।

এ কী। পোর্টাররা এসে হাজির হয়েছে। অবাক্ কাণ্ড।

কারও কোনও রকম বিপদ হয় নি শুনে নিশ্চিন্ত হই। জিনিসপত্র অনেক ভিজে গেছে। তা যাক্। ক্ষতি নেই। কারও যে আঘাত লাগে নি এই আনন্দের কথা। এমন দুর্যোগ মাথায় করে পিঠে বোঝা নিয়ে গহন অন্ধকারে এল কি করে ? কেবল দুজন আসতে পারে নি। পথে এক জায়গায় পাহাড়ের গুহায় নামমাত্র আশ্রয় পেয়ে সেইখানে থেকে গেছে, কাল ভোরে আসবে।

পোর্টারদের একজন ভিজা গায়ের জল মুছতে মুছতে বলে, স্বামিজী! আমরা সেখানে রাত্তিরে থাকতে রাজি হলাম না। আপনাদের জিনিসপত্তর সবই আমাদের কাছে,—না পেয়ে রাত্তিরে বাবুজিদের যদি কষ্ট হয়, তাই চলে এলাম। এ-বৃষ্টিতে আমাদের কী করবে ?—বলে হাসতে থাকে।

কথাগুলি শুনে, কি জানি কেন, আমার বুক ভরে ওঠে, চোখে জল নামে।

ভাবি, বিশ্ববাসীর এরাও কি নয় নমস্য মানুষ ?

॥ ৭ ॥

সকালে উঠতে আজ সামান্য দেরি হয়।

স্কুলের ছাত্রছাত্রী এরই মধ্যে হাজির। হাতে শ্লেট, খড়ি, দু-একখানা ছেঁড়া বই। জীর্ণ মলিন বেশ। আপেলের মত টুকটুকে মুখের রঙ্। কুতূহলী দৃষ্টি ফেলে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখে, তাদের স্কুল-ঘর দখল করে এ সব নতুন মানুষ কারা ?

বাইরে এসে দাঁড়াই। দেখি, মেঘহীন সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে চারিদিকে ধারাস্নাত সবুজ বনবেষ্টিত পাহাড়গুলি প্রভাতসূর্যের প্রথম কিরণ-সম্পাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ভানুসিং চা ও প্রাতরাশ নিয়ে উপস্থিত। সেই পোর্টার দুজনও ভোরেই এসে গেছে।

সাড়ে সাতটায় আবার যাত্রা। গ্রামের শেষে গাছের ছায়ায় কালিকা-

দেবীর দেউল। মন্দির পাশে বাঁধানো জলাধার। মন্দিরে প্রণাম করে এগিয়ে চলি।

কিছুদূর যাবার পর আবার কালীনদীর ধারে নেমে আসি। এখান থেকে ধারচুলা পর্যন্ত পথ আজ প্রায় সমান। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট নদী পার হই। নদীর উপর কাঠের পুল। নদীর ধারার মাঝে পানচাক্কি—watermill-এর ছোট ঘর। ঘরের ভিতর জলের স্রোতের মুখে কাঠের চাকা বসানো। স্রোতের বেগে চাকা ঘোরে,—তারই সাহায্যে গ্রামবাসীরা গম ইত্যাদি পিষে নেয়। বদরীনারায়ণের পথে এ ধরণের পানচাক্কিতে কাঠের বাটি, ঘটি ইত্যাদি পাত্রও প্রস্তুত করতে দেখা যায়।

পথের আশেপাশে আজ প্রায়ই গ্রাম আসে। গাছের ঘন ডালপালার মাঝে যেমন পাখিদের বাসা, পাহাড়ের মধ্যে নদীর উর্বর উপত্যকায় তেমনি মানুষের বসতি। সবুজ ক্ষেতের সমারোহ। মাঝে মাঝে ভোটিয়াদের শীতকালীন—এখন জনহীন আবাসগৃহগুলি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দেখি। মাইল পাঁচেক আসার পর ধারচুলার ঘরবাড়ি নীচে চোখে পড়ে। নিকটেই কালীনদী। নদীর তীরে সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, তারই মাঝে সমৃদ্ধ গ্রাম। ৩,০০০ ফুট উঁচুতে। চারিপাশে আম, পেয়ারা, কলা, শশা, লেবু ইত্যাদির বাগান। দেখেই মনে হয়, যেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এলাম। পথের দুপাশে আখ ও ভুট্টার ক্ষেতগুলি বিধাতার অপার করুণা ও মানুষের অদম্য উদ্যমের পরিচয় দেয়। নদীর উপর দড়ির ঝোলা পুল। ত্রিভুজাকৃতি একটা কাঠ লাগানো। তারই মধ্যে লোক ঝুলে বসে। ওপার থেকে দড়ি টানে। লোক পার হয়ে যায়। সুধীর তাকিয়ে দেখে। স্বামিজী হেসে বলেন, আমাদের পার হতে হবে না, এপার দিয়ে রাস্তা।

অপর পারে নেপাল রাজ্য। ঘন বসতি। স্বামিজী বলেন, নদীর ঐ ঝোলা পার হয়ে নেপাল থেকে এপারে বিশুদ্ধ ঘি চালান আসে। টাকায় এক সের, পাঁচ পোয়া পাওয়া যায়।

ধারচুলা বড় জায়গা। পাহাড়ী ব্যবসায়ী অনেকের বাস। বিয়াস্ পট্টির ভোটিয়ারা এখানেও শীতকাল কাটায়। গ্রামবাসীরা স্বামিজীকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে, শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করে। কতো লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, ভাবি। এখান থেকে আরও মাইল দুই দূরে রামকৃষ্ণ মিশনের "তপোবন" আশ্রমে তিনি অনেক বছর কাটিয়েছেন। স্বামিজীর সঙ্গে পাহাড়ী ভাষায়

তাদের কথাবার্তা চলে। বুঝতে পারি, তারা অনুরোধ করে, স্বামিজী, আবার এখানে ফিরে আসুন।

শুনি, আজ বছর তিনেক হোল রুমাদেবীর তত্ত্বাবধানে মিশন আশ্রমটি ছেড়ে দিয়েছে। রুমাদেবী পাহাড়ী মহিলা। অতি ভক্তিমতী, ধর্মপ্রাণা। মিশনের দীক্ষিতা। সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। কৈলাস তীর্থযাত্রীদের অশেষ প্রকার সাহায্যও করেন।

পথের পাশে দোতলা এক দোকানবাড়িতে ওঠার ব্যবস্থা হয়। জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর চৌকিদার এসে জানায়, বাংলোতেও সব প্রস্তুত আছে, পিয়নের কাছে খবর পেয়েছিল।

কিন্তু, আজ এখানে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে আবার রওনা হতে হবে, গ্রামের বাইরে বাংলোতে উঠে লাভ নেই।

দোকানদার জানায়, আজ সাত আট দিন হোল কৈলাসযাত্রী আর এক বাঙালী সাধুও এখানে এসে রয়েছেন। অনুভবানন্দজি আশ্চর্য হন। জিজ্ঞাসা করেন, বাঙালী সাধু? কৈলাস চলেছেন? কই, আলমোরায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয় নি ত?

সাধারণতঃ, কৈলাসযাত্রীগণ—বিশেষতঃ বাঙালী মাত্রেই—আলমোরায় পৌঁছে মিশনের আশ্রমে কৈলাসের পথ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন্। মাঝে মাঝে এই দুর্গম পথের সঙ্গীও আশ্রমে মিলে যায়।

দোকানের বারান্দায় এক কোণে দেখি, গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া ফতুয়া পরা এক প্রৌঢ় সাধু বসে। চোখে চশমা। ক'দিনের না-কামানো দাড়ি, গোঁফ মুখে ভিড় করে ঠেলে উঠেছে। কালো রঙ আরও কালো দেখায়। স্বামিজী নমো নারায়ণ বলে এগিয়ে যান। প্রশ্ন করেন, আপনি—ওঃ! মশাই দেখছি যে! তা গেরুয়া ভেখ ধরলেন কবে থেকে?

লোকটির তৈলবিহীন রুক্ষ মুখ আরও শুষ্ক দেখায়।

আমতা-আমতা করে বলে, না,—মানে, হাঁ—গেরুয়া! গেরুয়া—মানে কি জানেন? এটা পরলে পথে কাপড়-চোপড় ময়লা কম দেখায় কিনা—তাই আর কি।

অনুভবানন্দজি অন্যায় অনাচার দেখতে পেলে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন।

তিরস্কার করেন, গেরুয়া পরেছেন খালি? বাঙালী সাধু বলে চারদিকে জাহির করা হয়েছে—বেশ লোকটি ত মশাই!

সে অগত্যা স্বীকার করে, তা এরা যদি সাধু ভেবে খাতির করে, কি করব বলুন? কিন্তু দেখছি এইরকম বেশভূষা করে গেলে এ-পথে নানাভাবে ভা-রী সুবিধে হয়!—বলে একজোড়া পুরু ঠোঁটের ফাঁকে বড় বড় দাঁত বার করে হাসতে থাকে।

স্বামিজী ধমক দেন, হাঁ, মিথ্যের ভেখ নিয়ে আপনার নিজের সুবিধে হয় বই কি, কিন্তু পরে যে সত্যিকার সাধুদের অসুবিধেয় পড়তে হয়।

অনুভবানন্দজির কাছে লোকটির ছোট্ট ইতিহাসটুকু শুনি।

আলমোরার আশ্রমে গিয়েছিল। বাঙলাদেশের বাইরে চাকরি করে বলে পরিচয় দেয়। নানারূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করে। কৈলাস পথেরও খবর নেয়, কেউ যাচ্ছে কিনা, বাইরে থেকেই বা কারা কারা আসছে ইত্যাদি। নিজের সম্বন্ধে বলে, আমারও যাবার ইচ্ছে, কিন্তু হাঁপানিতে বড় ভুগছি। দেখি, কি হয়।

অসুখের কথা শুনে স্বামিজীরা নিষেধ করেন, ওরকম অসুখ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া, কথাবার্তার ধরণ থেকে তাঁদের সন্দেহ হয়, বৃটিশ সরকারের গুপ্তচর কিনা।

এর পর আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।

এখন এইখানে পুণ্যলোভী সরল গ্রামবাসীদের সাধুসেবার সুযোগ দিয়ে কদিন অবস্থান করছেন।

পোর্টাররা মালপত্র নিয়ে হাজির হয়। পিঠের বোঝা নামিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করে, বাবুজি, কাল রাত্তিরের বৃষ্টিতে সব ভিজে আছে। রোদে দিয়ে দিই?

উত্তরের প্রতীক্ষা করে না। বিছানাপত্রের দড়ির বাঁধন খুলতে থাকে। সুমুখেই বাঁধানো উঠান। সেখানে পাথরের উপর কম্বল, বালিশ, জামাকাপড় সব ছড়িয়ে রোদে দেয়।

দুজন কুলি ইতিমধ্যে কিছু দূরের ঝরনা থেকে বালতি করে জল নিয়ে আসে। উঠানের এক পাশে প্রকাণ্ড এক আমগাছের ছায়াতলে ভানসিং পাথর সাজিয়ে উনান পেতেছে। এরই মধ্যে চায়ের জল ফুটতে আরম্ভ করেছে। দোকানেও রান্নার ঘর আছে। কিন্তু গাছের ছায়ায় রান্নার আনন্দ অনেক।

গ্রামে কার গরু আছে, দুধের জন্য তার কাছে একজন পোর্টারকে স্বামিজী, কি জানি কখন, পাঠিয়েছিলেন; লোটা-ভরা দুধ নিয়ে সে হাজির।

ভাণ্ডারী সুরেন্দ্র মহারাজ কিট্ ব্যাগ থেকে রান্নার সাজ-সরঞ্জাম বার করতে ব্যস্ত। চিনির ছোট বস্তাটি তুলে ধরে বলেন, ঠাকুরের কৃপা! খুব বেঁচে গেছে। ভাগ্যে কাল বৃষ্টির জল এর মধ্যে যায় নি! এবার থেকে ব্যাগের মধ্যে এটা নিয়ে রাখতে হবে।

ব্রহ্মচারীজি গায়ের সব জামা খুলে ফেলেছেন। বলেন, বড্ড গরম লাগছে!—নাঃ, নাঃ,—এ শরীরে ঠাণ্ডা লাগার কোনও ভয় নেই। গুরুর কৃপায় লোহা দিয়ে গড়া এ-দেহ।

সুধীর বলে, লোহা কই, ব্রহ্মচারীজি? ও তো স্বর্ণবরণ তনু!

ব্রহ্মচারীজির গায়ের ফর্‌সা রঙের উপর গাঢ় লাল রুদ্রাক্ষের মালাটি দুলতে থাকে। রুদ্রাক্ষের ফাঁকে ফাঁকে সোনার চেন চিকচিক্ করে।

ভান্‌সিং-এর নিকট তিনি এগিয়ে যান। জিজ্ঞাসা করেন, আজ কি পাকাবে, ভান্‌সিং? আচ্ছা, তুমি গিয়ে আলুর খোসাগুলা ছাড়াও, আমিই আজ রাঁধব।

সমস্বরে আমরা বলে উঠি, নিশ্চয় ব্রহ্মচারীজি। কাল রাত্তিরে অতো ভেজা গেছে, আজ ভাল করে খেতে হবে।

ব্রহ্মচারীজি উনানের পাশে গিয়ে বসেন। একজন পোর্টার তাঁর জন্যে তামাকে সেজে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসে। এক হাতে গড়গড়ার নল, অপর হাতে খুন্তি ধরে ব্রহ্মচারীজি রান্না আরম্ভ করেন।

সুধীর অবাক হয়ে বলে, গড়গড়াটা এল কোথা থেকে? এ কদিন ত নজরে পড়ে নি।

ব্রহ্মচারীজি ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে বলেন, ট্রাঙ্কে ভরে সবই এনেছি। আজই প্রথম বার করলাম,—কদিন সিগার্-এই চলছিল।

কিছু দূরে আর এক গাছের তলায় অনুভবানন্দজি। চুপি চুপি স্থানীয় লোকেদের কাছে খবর নেন, পথে যে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছিল, ছড়িয়ে পড়ে নি তো?

আলমোরায় ডাক্তার সেনের সেই সতর্ক-বাণী।

পাহাড়ের এ-সব গ্রামে সংক্রামক কোন রোগ একবার দেখা দিলে সহজে রক্ষা থাকে না। নদীর বন্যার ন্যায় নেমে আসে মৃত্যু। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম উজাড় করে দেয়। বসন্তের প্রতিষেধক টিকা দেবার ব্যবস্থা পাহাড়ের এই দুরাঞ্চলে কে আর করে? রোগ হলে রোগীর

সেবাশুশ্রূষায় সতর্কতার প্রয়োজনীয়তাও অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা বোঝে না। ধর্মের দোহাই দিয়ে ভাবে, এ সবই বিধির বিধান।

এখন সুসংবাদ শোনা যায়, রোগ বন্ধ হয়েছে। তিনটি মাত্র লোকের মৃত্যু ঘটে। নতুন আর কেউ আক্রান্ত হয়েছে বলে খবরও নেই।

অনুভবানন্দজি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হন। পথ সম্বন্ধে অন্যান্য খোঁজখবরও নেন্, লিপুলেখ্ পাশ খুলেছে কি? ব্যবসায়ীরা যাতায়াত করছে? রুকুমসিং আমাদের গাইড হয়ে তিব্বতে সঙ্গে যাবে, খেলায় তার যোগ দেবার কথা, তার খবর কেউ রাখে?—ইত্যাদি নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করেন।

"এধারে ফিরে দাঁড়া একটু"—সুধীরের ডাকে ফিরে তাকাই। ক্যামেরা হাতে রাস্তার উপর থেকে ছবি তুলতে সে ব্যস্ত। চারদিকেই সজীবতা; কর্মময় জীবনের অপার আনন্দ। বিশ্রাম কেউ খোঁজে না, চায়ও না।

দোকানের কিছু দূরে ঝরণা। পাহাড়ের গা বেয়ে উপর থেকে জল নামে লাফিয়ে। তারই নির্মল শীতল ধারায় সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে স্নান করি।

তার পর ভুরিভোজন। সবাই তারিফ করি, ব্রহ্মচারীজির রাঁধবার হাত আছে বটে!

ব্রহ্মচারীজি প্রশংসিত বালকের মত সলজ্জ হাসেন।

এ সকল গ্রামে সাধারণতঃ চাল, ডাল, আলু, কিছু কিছু শাকসব্জি পাওয়া যায়। খুব ভাল ঘি ত থাকেই। শুনি প্রয়োজন হলে এখান থেকে পোর্টার ও তাঁবুরও বন্দোবস্ত হতে পারে।

বিকালে সাড়ে তিনটায় যাত্রার জন্য সকলে আবার প্রস্তুত।

দোকানদার হাত জোড় করে বলে, স্বামিজী, আজ রাত এখানেই কাটিয়ে যান। খেলা পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে যাবে, বর্ষারও ভয় আছে,—দশ মাইল পথ, চড়াই-ও কম নয়।

এ-সব শুনেও কেউই আমরা থাকতে রাজি হই না। একবেলাই বা বৃথা এখানে বসে কাটানো কেন? তাছাড়া, খেলাতে হয়ত একদিন বেশি থাকতেই হবে। সেখান থেকে আবার নতুন ঘোড়ার ব্যবস্থা। রুকুমসিং কি বন্দোবস্ত করেছে সঠিক জানা নেই। সুখবরের মধ্যে এইটুকু,—চিঠিতে সে স্বামিজীকে লিখেছে, 'বিলকুল সব তৈয়ার হায়।'

অতএব, টর্চ সঙ্গে রেখে আবার পথচলা সুরু। কালকের অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টির অভিজ্ঞতা ভুলি না।

দু মাইল সোজা গিয়ে তপোবন। এইখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সেই আশ্রম ছিল। দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয়ও খোলা হয়। অতি মনোরম পরিবেশ। হিমালয়ের কোলে শান্ত সুন্দর প্রকৃত তপোবনই বটে। সুমুখের পাহাড়ে সুরম্য জলপ্রপাত। একধারে কালীনদী। নিকটে দু'তিনটি উষ্ণ প্রস্রবণও আছে, শুনি। আশ্রমের প্রাঙ্গণের এক পাশে মন্দির। ফলফুলের বাগিচা। কিন্তু, দেখে মনে হয়, যথাযোগ্য যত্নের অভাবে এখন জঙ্গলে পরিণত। আশ্রমের গৃহগুলিও ভগ্নপ্রায়।

অনুভবানন্দজি কোন কথা বলেন না। গম্ভীর মুখে হনূহন্ করে এগিয়ে চলেন। ওদিকপানে যেন তাকাতেও চান না। হয়ত, তাঁর এখানকার বিগত দিনের স্মৃতি আজিকার এই দৃশ্য দুর্বিষহ করে তোলে।

আশ্রম ছাড়িয়ে এসে একেবারে কালীনদীর কিনারায় পৌঁছুই। নদীর প্রবাহ মত্ত হস্তীর মত দুর্দান্ত বেগে নেমে চলে।

পথের উপর দু'তিনটি ঝরণা পড়ে। রাশি রাশি বিপুল শিলাখণ্ড বেষ্টন করে কলস্বরে জলধারা নেমে আসে পাহাড় থেকে। পথরোধ করে এগিয়ে যায় কালীনদীর পানে। ঝরণার ধারার উপর পুল নেই। জুতা মোজা খুলে জলের মধ্যে দিয়ে পার হই। জলের গতিবেগ থাকলেও গভীরতা সামান্যই।

ধারচুলা ছাড়বার পর পথের প্রথম ছ'মাইল পাহাড়ী মামুলী উঁচু-নীচু। তারপর চার মাইল চড়াই, শেষের মাইল দুই খাড়া ওঠা।

পথে দেখি, একদল পেশোয়ারী মজুর ধীরপদে নীচে থেকে উপরে উঠে চলে।

আলমোরাতে আগে খবর শুনেছি, কৈলাসের পথে কুখ্যাত নির্পানির পাহাড়ে নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। আজ এখন দুঃসংবাদ পাই, দুদিন আগে সেখানে হঠাৎ পাহাড়ের ধস্ নামে, বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে তারই চাপে একটি মজুরের মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত ব্যক্তির সৎকার কার্য শেষ করে এই মজুরদল আবার নিজ কাজে ফিরে চলেছে। বিদেশে এই অকস্মাৎ মৃত্যু তাদের সকলের মুখে বিষাদের ঘন ছায়াপাত করে। কিন্তু, পথ-তৈরির কাজ বন্ধ থাকে না। পাহাড়ের বুকে মানুষের হাতের যন্ত্র আবার সশব্দে বিঁধতে থাকে। কালো পাথরের রূপ ধরে প্রকৃতির করালমূর্তি অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি তোলে। খেলার চড়াই উঠতে উঠতে সন্ধ্যা নামে। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পাই। গ্রামের শেষে পাটোয়ারীর বাড়ি। সেইখানে আগে

থেকে থাকবার ব্যবস্থা আছে। দোতলা সুন্দর বাড়ি। সারাদিনের যাত্রা শেষে দেখেই মনে আনন্দ আনে। কিন্তু, উপরে উঠে দেখা যায়, ঘর তালাবন্ধ। পাটোয়ারীজি গ্রামে নেই। তাঁর ভাই মুন্সী সাহেব বা পোস্ট মাস্টার মশায়-এর উপর বাড়ির বন্দোবস্তের ভার ছিল। তিনি দয়া করে সবই ব্যবস্থা করে রেখেছেন, কেবলমাত্র পাটোয়ারীর কাছ থেকে ঘরের চাবিটি চেয়ে রাখতে ভুলেছেন। হাতজোড় করে এসে তিনি দাঁড়ান। অতি বিনীতভাবে বলেন, কসুর নেবেন না, এই সামান্য ভুলটুকু হয়ে গেছে। আমার নিজের নতুন বাড়িতেই আপনাদের নিয়ে যেতাম, কিন্তু হঠাৎ আজ দুদিন হোল আমার নিজের কজন লোক এসে গেছে।

অগত্যা দোতলার ঘরের সুমুখের বারান্দায় থাকবার বন্দোবস্ত হয়। ছোট বারান্দা, তায় আবার তিনদিক খোলা। খেলা ৫,৫০০ ফুট উঁচু। শীত আছে। অতএব বারান্দার ধারে ওয়াটার প্রুফ সীট্ গুলি (sheet) টাঙিয়ে ঘরে রূপান্তরিত করতে হোল।

রুকুমসিং-এর এখনও দেখা নেই।

ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গে এই পর্যন্ত ব্যবস্থা। আলমোরা থেকে একশ' মাইল আসা হয়েছে। এখন থেকে আবার নতুন ঘোড়া নেবার কথা।

তাই, কালও এইখানে স্থিতি।

অনুভবানন্দজি পোস্ট মাস্টারের কাছ থেকে আমাদের চিঠিপত্র চেয়ে এনে দেন।

কদিন পরে আজ প্রথম বাড়ির চিঠি পাওয়া। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে ঝুঁকে বসে পড়তে থাকি। মনে অসীম আগ্রহ। চিঠির মধ্যে বহুদূর থেকে কাদের যেন কণ্ঠ শুনি।

॥ ৮ ॥

আজ পথ চলার ছুটি। শেষরাত্রে উঠে বিছানা বাঁধার নিত্যকর্ম আজ বন্ধ। নিশ্চিন্ত আরামে বেলা পর্যন্ত নিদ্রা যাই। ঘুম ভাঙলেও শয্যা ছাড়ি না। শুয়ে শুয়ে অর্ধ-নিমীলিত নয়নে সুমুখের পাহাড়ের পানে তাকিয়ে থাকি। সর্পিল আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের সবুজ বুকে আঁচড় কেটে নীচে থেকে একেবারে মাথার উপর উঠে যায়। শুনি, কাল এখান থেকে রওনা হয়ে উৎরাই পথে নীচে নামতে হবে এবং তারপর সুমুখের ঐ পাহাড় সোজা ডিঙিয়ে যাওয়া।

খেলা বড় গ্রাম। জিনিসপত্রও কিছু পাওয়া যায়। এখানকার গাওয়া ঘি উৎকৃষ্ট। তিব্বতের পথের জন্য সঙ্গে নেওয়া হয়। এর পর হয়ত পাওয়া যাবে না। এক টাকায় এক সের।

গ্রামের মধ্যে স্কুল-বাড়ি। আট-চালার মত প্রকাণ্ড একটা ঘর। সেখানেও যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা হতে পারে।

ঘোড়াওয়ালাদের বিদায় দেওয়া হয়। বখশিশ নিয়ে সেলাম করে তারা আলমোরায় ফিরে চলে। আবার যদি যাত্রী পায়, এ-পথে আসবে। এই উপার্জনই তাদের জীবিকা।

ঘোড়াগুলির উপর দৃষ্টি পড়ে। আমার সাদা ঘোড়াটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে চলে। দেখে মনে পড়ল, পরশু রাত্রের দুর্যোগের মাঝে বেচারীর পায়ে হঠাৎ আঘাত লেগেছিল। আমার সাদা ঘোড়া? 'আমার' বলবার অধিকার ত আর নেই। এইমাত্র তার মনিবের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসাব সাঙ্গ করে এই ক'দিনকার সম্বন্ধের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলেছে। কৈলাস থেকে ফেরবার পথে হয়ত দেখতে পাব নতুন যাত্রী নিয়ে আবার আসছে, কিন্তু তখন দেখলে কি আর চিনতে পারব? এই দুর্গম পথে পিঠে করে এতদিন যে প্রাণী নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে পাহাড়ের পর পাহাড় পার করে আনল, স্মরণের সিন্ধুপারে অকৃতজ্ঞতার মরুপথে এত সহজেই সে পথ হারাবে?

তার প্রভুগুলি ত অর্থ উপার্জন করে হৃষ্টচিত্তে গৃহাভিমুখে ফিরে চলেছে। আর, যাদের সহায়তায় ও পরিশ্রমে এই অর্থাগম, সেই মূক পশুগুলি কি কোন কিছুই সঞ্চয় করে ফিরল না?

গত কয়দিনের কত কথাই না আজ মনে জাগে।

পাহাড়ের দুরূহ চড়াই উঠতে যখনই সামান্য ক্লান্তি বোধ হয়েছে, ঘোড়ার উপর তখনি নির্বিচারে উঠে বসেছি,—অবোধ পশুর যেন পাহাড়ে উঠতে শ্রান্তি-বোধও নেই। এই ত সেদিন বালুয়াকোটের ছায়াবিরল পথে মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যকিরণে পরিশ্রান্ত হয়ে ত্বরিতগতিতে গ্রামে পৌঁছুবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুরভাবে কত তাড়নাই না তাকে করেছি। তৃষাতুর হয়েও জল পায় নি, ক্ষুধিত হয়েও পর্যাপ্ত আহার জোটে নি, অক্লান্ত সেবা দিয়েও সহানুভূতি পায় নি,—এই ত তার জীবন। পশু দেহে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সে কি এ-জগতে কোন কিছু আনন্দেরই দাবী করতে পারে না? এই যে পথের চারদিকে প্রকৃতির এত অপরূপ সৌন্দর্য, এর কণামাত্রও কি তার পশুচক্ষে ধরা পড়ে না? শুধু কি

এই দুরূহ পথে বার বার আসা যাওয়ার দুর্ভোগের মাঝেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ?

'আরে রুকুমসিং। এস এস,—দেখাই নেই তোমার।'—অনুভবানন্দজির স্বর শুনে ফিরে তাকাই।

এই তাহলে তিব্বত পথের আমাদের একজন গাইড্ রুকুমসিং।

বয়স বোধ করি বছর কুড়ি-একুশের বেশি হবে না। কিন্তু, লম্বা চওড়া দেহ, জোয়ান পুরুষ। গুর্খা সৈনিকের মত বেশভূষা। পায়ে মিলিটারী ভারী বুটজুতা, মোটা মোজা—'সাইকেল হোস্'। পরনে খাঁকি হাফ্প্যান্ট, কালো রঙের হাত-কাটা সার্ট। প্রকাণ্ড গোলাকৃতি মুখের উপর প্রায় গোলাকার একজোড়া চোখ। চোখে চশমা আঁটা। 'পাওয়ার' আছে কিনা সন্দেহ হয়।

স্বামিজী বলেন, এর বাড়ি এখন গার্বিয়াঙে, তবে এর পূর্বপুরুষরা এককালে হয়ত তিব্বত থেকেই এসেছিল। দু বছর আগে রুকুম্ একবার কলকাতায় যায়, কিন্তু সেখানকার অসহ্য গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখনি পালিয়ে আসে আবার নিজের দেশে।

রুকুম বাঙ্লা বোঝে। কথা শুনে হাসে। বলে, হাঁ স্বামিজী! ওদেশে দারুণ গর্মি, মানুষ থাকে কি করে সেখানে।

রুকুম কলকাতায় বেশিদিন থাকতে পারে নি, কিন্তু সভ্য জগতের সঙ্গে সেই কদিনের সংস্পর্শ তার অঙ্গেরও বেশভূষায় ও চালচলনে সুস্পষ্ট ছাপ দিয়েছে।

স্বামিজী জিজ্ঞাসা করেন, বন্দুক সঙ্গে নিচ্ছ ত ?

রুকুম বলে, জরুর। সব কিছু তৈয়ার হ্যায়।

এখান থেকে নতুন ঘোড়ার বন্দোবস্ত, গার্বিয়াঙে তিব্বতের জন্যে সমস্ত আয়োজনাদি সম্পর্কে অনুভবানন্দজি সবিস্তারে খবর জানতে চান, কিন্তু সব প্রশ্নেরই উত্তরে রুকুমসিং-এর ঐ এক কথা,—বিলকুল সব তৈয়ার হ্যায়।

অথচ, পরে শুনি, ঘোড়াগুলি এখনও সব জঙ্গলে চরে বেড়াচ্ছে। তাদের ধরে আনতে অন্ততঃ দিন দুই সময় লাগবে।

রুকুম বলে, আপ্ লোগ দো চার রোজ ইধার আরাম কিজিয়ে।

কিন্তু, আরামের লোভে ত এ পথে আসা নয়। দুদিন পরে যে ঘোড়া মিলবেই এমনই বা কে বলতে পারে ? অনুভবানন্দজি বলেন, এখান থেকে গার্বিয়াঙের পথ মোটেই সুবিধের নয়, তার ওপর নিরপানির সেই পাহাড় ত আছেই। বেশির ভাগ রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। ঘোড়ার

আশায় বসে থাকা ঠিক হবে কিনা ভেবে দেখুন।

ভাববার কিছুই নেই। অনিশ্চিত ভাবে অপেক্ষা করতে কেউই আমরা রাজি নই।

অতএব, আগামী কালই পদব্রজে যাত্রা করা স্থির হয়।

অনুভবানন্দজির বাঙালী শরীর হলেও পাহাড়ের বাসিন্দা। হেঁটে পথ চলা, —তাঁর সম্পর্কে কোন কথাই ওঠে না। সুরেন্দ্র মহারাজও গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী কেদার বদরী ঘুরে এসেছেন।

আর ব্রহ্মচারীজি? ভারতবর্ষের এমন কোন দুর্গম স্থান নেই যেখানে তিনি যান্ নি। এমন কি, সুদূর বর্মা মুলুকেও অনেক ঘুরে চীনদেশের পাহাড় পর্বতও তিনি পায়ে হেঁটে পার হয়েছেন। তাঁর বহুমুখী অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর কাহিনী নির্বাক হয়ে শুনি।

পথ চলা সম্বন্ধে, কেন জানি না, আমারও উপর স্বামিজীদের অগাধ বিশ্বাস।

শুধু সুধীরকে দেখিয়ে বলেন, এই বাবুজী 'দুব্‌লা কম্‌জোরী' আছেন,—ঘোড়া মিল্‌ল না, বাবুজি 'পয়দাল' যেতে পারলে হয়।

রুকুমসিং ভাঙা ভাঙা বাংলায় সাহস দেয়, কুছ্‌ভি ডর্ নেই, বাবুজিকো হামি পিঠমে করে নিয়ে যাব।

কবে কোন্ এক বাঙালী যাত্রীদল এসেছিলেন, লিপুলেখ ও গৌরীকুণ্ডের বরফের মাঝে তাঁদের মধ্যে কারা বুঝি অজ্ঞান হয়ে যান্, সঙ্গের গাইড্‌রা কিভাবে তাদের পিঠে তুলে নিয়ে প্রাণ বাঁচায়, ইত্যাদি নানারূপ অতীত কাহিনী স্বামিজী ও রুকুমসিং-এর নিকট শুনতে থাকি।

পাহাড়ীদের কাছে নাকি বাঙালীর 'কমজোরী' বলে সাধারণতঃ দুর্নাম।

মনে মনে ভাবি, সে অপবাদ যেন ঘুচাতে পারি।

সারাদিন আজ কেবল চিঠিই লিখেছি।

দেশে ঘরে বসে সবারই মনে ভয় ভাবনা,—কিভাবে এই দুর্গম হিমালয়ের পথে চলেছি, কতো কষ্টই বুঝি বা ভোগ করছি। স্বপ্নেও তাঁরা ভাবতে পারেন না,—হিমালয়ের এই অপরূপ রাজ্যে পথ চলা এবং এই অভিনব জীবন যাপন, —কী গভীর আনন্দময়।

দৃষ্টির অগোচর,—অজানা জগৎ,—মনকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি কারও কারও অন্তরে অলীক ভয়-ভাবনারও উৎস গড়ে।

॥ ৯ ॥

আজ খেলা থেকে যাত্রার নূতন পর্ব সুরু হয়। এতদিন একশত মাইল পথ কখনও ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কখনও বা হেঁটে এসেছি। এখন শুধু পায়ের উপর ভরসা। এই আত্মনির্ভরতা মনে উৎসাহ জাগায়।

এখানকার সব আয়োজন সারতে সকাল কাটে। তাই দুপুরের খাওয়ার পাট এইখানেই তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বেলা সাড়ে দশটায় যাত্রা করা হয়। ভাবি, সারাদিন পথ হাঁটা যাবে নিশ্চিন্ত মনে আরামে।

প্রায় দেড় মাইল উৎরাই নেমে ধৌলীনদীর ধারে পৌঁছুই। হুড়হুড় করে অক্লেশে নেমে আসা। Gneiss পাথরের পাহাড়। কালো কুচ্‌কুচে রঙ্‌। নদীর উপর ছোট কাঠের পুল। পুলের উপর দাঁড়িয়ে নীচে খরস্রোতের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে। চারপাশের পাহাড় প্রতিধ্বনি তুলে গভীর হুঙ্কারে দুরন্ত নদী ছুটে চলে। নদীর বুকে মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর মাথা তুলে। স্রোতের প্রচণ্ড বেগ তারই সংঘর্ষে বিচ্ছুরিত হয়ে চারদিকে শীকরসিক্ত বাষ্পমণ্ডল সৃষ্টি করে।

পুল থেকে আধ মাইলের উপর দূরে ধৌলী ও কালী নদীর সঙ্গম।

অনুভবানন্দজী বলেন, ও জায়গাটাকে বলে তাওয়া ঘাট। এই ধৌলী নদীর উপত্যকাতেও পাহাড়ের ওপর দিকে ভোটিয়াদের বাস। সে-অঞ্চলকে বলা হয় দর্‌মাপট্টি, সেখানকার ভোটিয়াদের নাম তাই দর্‌মা ভোটিয়া। সেদিন বলেছি, মনে আছে সুধীরবাবু? এই ধৌলী নদী ধরে এগিয়ে গিয়েও কৈলাস মানস সরোবর যাওয়া যায়—জ্ঞানিমা মণ্ডী হয়ে। সেদিকে বরফের পাহাড় পার হতে হয়—দর্‌মা পাশ দিয়ে—১৮,৫১০ ফুট উঁচু। সুধীর বলে, তা হলে লিপুর চেয়ে আরও প্রায় হাজার দুয়েক উঁচু! আমাদের লিপুই দেখছি এদের মধ্যে সব চেয়ে ভদ্র নম্র। এযাত্রায় তাই বুঝি তারই সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন?

ধৌলী নদীর নাম শুনে আমার মনে পড়ে বদরীনাথের পথের কথা। সেখানে যোশী মঠের নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকানন্দা ও ধৌলী নদীর সঙ্গম। এখানেও ধৌলী নদী চলে এল কি করে? স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি হেসে বলেন, শুনুন সুধীরবাবু,—উমাপ্রসাদবাবুর প্রশ্নটি। একই নামের যেন দুজন লোক থাকতে পারে না। এই দুই ধৌলীর মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই।

সেইটে বোঝাবার জন্তে অনেক সময় এ-নদীকে পূর্ব-ধৌলী—ইষ্টার্ন ধৌলীও বলা হয়। এর আরও একটা নাম আছে। দরমা পাশ থেকে নেমে আসে—তাই দরমা গঙ্গা নামেও এর পরিচয়।

বলি, আমাদের সেই বদরীনাথের ধৌলী গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে গিয়ে নিতি পাশ (১৬,৬০০ ফুট) পার হয়েও তিব্বতে ঢোকা যায়, কৈলাস মানস সরোবরেও যাওয়া চলে। আবার, বদরীনাথ থেকেও মানা গ্রাম ছাড়িয়ে সরস্বতী নদী ধরে গিয়েও মানা পাশ (১৭,৮৯০ ফুট) পেরিয়ে কৈলাস মানস সরোবর পৌঁছানো যায়।

স্বামিজী বলেন, নিতি ও মানার পথ দিয়েও কোন কোন যাত্রীদল যাতায়াত করেন, কেউ কেউ আবার লিপু দিয়ে গিয়ে আর এক পথ দিয়ে ফেরেন।

সুরেন্দ্র মহারাজ মৃদু হেসে বলেন, এইবার কথা থামিয়ে চলুন, এগুনো যাক্। দেখছেন ত নদীর অপর পারেই চড়াই সুরু,—রোদের তেজও বাড়ছে।

থানিধর পাহাড়ের চড়াই। চৌদাস পট্টিও সুরু। আড়াই মাইল পথ খাড়া উপরে ওঠা। গাছের ছায়াও বিরল। দ্বিপ্রহরের খরতর সূর্যকিরণে পথের দুরূহতা ভয়াবহ মনে হয়। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ জলের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। হঠাৎ চেয়ে দেখি, অদূরবর্তী ঝরনার জলধারা পথের বুকের উপর দিয়ে নৃত্যভঙ্গে বয়ে চলে। শীতল জলে আবার পথ চলার প্রেরণা খুঁজে পাই।

অবশেষে পাহাড়ের প্রায় শিখরদেশে পৌঁছে যাই। একটি অপরিসর গুহায় ছায়া দেখে তারই মধ্যে ক্ষণিক বিশ্রাম করি। এতক্ষণে প্রাকৃতিক শোভা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু নীচে ধৌলী নদীর সেই উদ্দাম অশান্ত রূপ এখন শান্ত ক্ষীণ রেখার আকৃতি ধারণ করেছে। ওপারের ফেলে-আসা পাহাড়ের উপরে খেলা গ্রাম। এখন খেলাঘরের মত দেখায়। তারই কিছু নীচে পাহাড়ের শ্যামল অঙ্গে পাহাড়-ধসার ক্ষতচিহ্ন। এখনও মাঝে মাঝে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ কানে আসে। মনে হয়, সবই এই ত এইখানে,—কতো কাছে, কিন্তু এলাম ইংরাজি V হরফের মাথার এক অংশ থেকে নেমে অপর অংশে উঠে।

একে একে সবাই আসেন। কেবল ব্রহ্মচারীজি পৌঁছান বিলক্ষণ বিলম্বে। এসেই একটা পাথরের উপর বসে পড়েন। অতি-ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরের এই প্রচণ্ড রোদ—তাই মাথায় নিয়ে এই দুর্দান্ত চড়াই

ওঠা—হাঁফিয়ে পড়েছি, মশাই। ঘোড়াটা আজ থাকলে কতো সুবিধে হোত।

সুধীর অলক্ষ্যে মন্তব্য করে, খুব সম্ভব ওঁর চীন-জাপানের খাড়াই উৎরাই এতটা দুরূহ ছিল না।

আরও কিছুদূর যাবার পর চড়াই সম্পূর্ণ শেষ। পাইন, ওক, রোডোডেন-ড্রনের সারি। গাছগুলা কেমন যেন খর্বাকার, বাঁকাচোরা। দেখে বোঝা যায়, পাহাড়ের অনেকখানি ঊর্ধ্বস্তরে আসা হয়েছে। বোধ হয়, নয় হাজার ফুটেরও উপরে। বছরের বেশির ভাগ সময় এ-সব অঞ্চল তুষার-আবৃত থাকে, গাছগুলি বিকলাঙ্গ তারই প্রমাণ দেয়। তবুও আজ এরই ছায়া স্নিগ্ধ মনে হয়। হাত পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর সকলে শুয়ে পড়ি।

শুধু ঘাস তো নয়। ঘাসের মধ্যে কতো রঙ্-বেরঙের ছোট ছোট ফুল—alpine flowers। জীবনের এই প্রথম পরিচয় এদের সঙ্গে।

সুধীরের দিকে ফিরে বলি, বেশ মজা করে আনন্দ-মনে শুয়ে আছ। সাবধান। বাড়ি ফিরে গল্প করব হিমালয়ে এসে তোমার আবার এই ফুল-শয্যার কথা।

সুধীর হেসে বলে, তা করিস্, এই ফুলেরই বর্ণনা করে তার মান ভাঙ্‌ব। কিন্তু, রাস্তার ওদিকে আবার ওটা কি ব্যাপার? পাথরের পর পাথর স্তূপ করে সাজানো,—রুকুমসিংও গিয়ে দুটো পাথর ওটার ওপর বসাচ্ছে,—আশপাশের গাছের ডালে রঙীন্ কাপড়ের টুকরো বাঁধা,—যেন সব নিশান দুলিয়েছে। পথে আগে ত এ ধরনের কিছু দেখি নি।

স্বামিজী বলেন, নজরে পড়েছে ওটা ওদিকে? এখন থেকে উঁচু পাহাড়ের মাথায় পাশ্-এর ওপর উঠে এলেই ঐ রকম দেখতে পাবেন। ভোটিয়াদের এও এক প্রথা,—হিমালয়ের অন্যত্রও পাশ্-এর মাথায় ঐ ধরনের কাপড়ের টুকরা বেঁধে নিশান ওড়ানো দেখা যায়,—তবে ভোটিয়ারা আবার পাথর সাজিয়ে স্তূপও করে,—এরা হিন্দু হলেও আচার-ব্যবহারে এদের নানান্ অদ্ভুত ছাপ আছে। স্তূপাকারে সাজানো পাথরগুলোকে সাহেবরা বলে কেয়ার্ন—cairn। পাহাড়ীদের বিশ্বাস, বনদেবতার এতে আরাধনা করা হয়,—ভূতপ্রেতের অত্যাচারের তা হলে আর ভয় থাকে না।

ব্রহ্মচারীজি গম্ভীর স্বরে বলেন, ভূতপ্রেতের ভয়ের কথা জানি না। পাহাড়ের মাথায় যে পৌঁছে গেলাম—চড়াই শেষ হোল,—এই নিশান আর স্তূপ সেই শুভ ঘোষণা করে, মন হাফ ছেড়ে বাঁচে, ভগবানকে তখন ধন্যবাদ জানাতে

চায় না কে, বলুন ?

সুরেন্দ্র মহারাজ নিঃশব্দে চলেন, নির্বাক্ থাকেন, এমনি ভাবে সঙ্গ রাখেন, বোঝাই যায় না, তিনি আছেন। মৃদু কণ্ঠে তিনি এখন বলেন, তা ত বুঝলাম। চড়াই শেষ হয়েছে, বেশ আরামে সব শুয়েও রয়েছি, কিন্তু সাম্‌নে পথ যে পড়ে।

সত্যই তো। শুধু বিশ্রামে পথ-শ্রান্তির শান্তি হলেও পথের সমাপ্তি হয় না! অতএব সুখ-শয্যা ছেড়ে আবার হাঁটা সুরু।

অনেকখানি সমতল রাস্তা। নিকটে একটি পরিচ্ছন্ন বাসগৃহ। শুনি, এও এক ক্রিশ্চান মিশনারীর। ভাবি, কৈলাসের প্রাচীন প্রসিদ্ধ তীর্থপথ,—এখানেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের এত প্রচেষ্টা!

পাহাড়ের মাথা থেকে আবার বেশ খানিক নামা, তারপর আবার কিছু চড়াই।

খেলা থেকে মাইল ছয় এসে পঙ্গুতে পৌঁছুই। প্রায় সাত হাজার ফুট্ উঁচু। বড় বড় আখরোট ও ওকগাছের আবেষ্টনে চৌদাস ভোটিয়াদের এই প্রথম গ্রাম। গ্রামে ঢুকতেই বৃষ্টি নামল। নিকটেই স্কুলবাড়ি পেয়ে তাড়াতাড়ি তারই মধ্যে আশ্রয় নেওয়া হয়।

রুকুমসিং বলে, স্বামিজী, সন্ধান নিয়ে দেখে আসি, চড়বার ঘোড়া যদি এখানে পেয়ে যাই।

অল্প পরে ভগ্নদূত ফিরে আসে, ঘোড়া আছে, তবে এখানেও জঙ্গলে চরছে, পেতে দু'তিন দিন দেরি হবে।

স্বামিজী তাগাদা দেন, চলুন চলুন, খাসা হাঁটছেন সবাই। আরো এগুনো যাক। বৃষ্টি ধরেছে।

সুধীর বলে, দোকান থেকে চা আনিয়ে খেয়ে একটু তাজা হয়ে রওনা হলে কেমন হয় ?

স্বামিজী মত দেন না। বলেন, শোসায় পৌঁছে চা খাওয়াব, এখন আর দেরি করা নয়, আবার কখন বৃষ্টি নামবে! কুলিরাও ঐ এসে গেছে, এখানে একবার বসতে পেলে আর সহজে উঠতে চাইবে না,—পোর্টারদেরও তখনি চেঁচিয়ে বলে দেন,—না থেমে এগিয়ে যেতে, আজ রাত্রে শোসায় থাকা।

স্বামিজীর ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারি। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কা নয়, আমাদের গতিবেগের তারিফ দেখানোও নয়। এই সেই পঙ্গু! এখানেই বসন্ত

রোগের আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যায় আলমোরায়। তাই এত সতর্কতা।

অতএব, তখনি আবার রওনা।

পঙ্গু ছাড়িয়ে খানিক উৎরাই। ছোট এক নদীর ধারে পৌঁছানো। নদীর নাম শুনি জুংতি বা জয়ন্তী। নিকটে অর্ধসমাপ্ত একটা মন্দির। জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী মন্দিরের সুমুখে আপন মনে পদচারণ করছেন। নদীর উপকূলে চাষ-আবাদের ব্যবস্থাও হচ্ছে।

অপর পারের পাহাড়ের উপরে শোসাগ্রাম। পঙ্গু থেকে তিন মাইল দূরে। নদী পার হয়ে আবার চড়াই। ব্রহ্মচারিজীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় চড়াই শেষ করে শোসা পৌঁছুই। আট হাজার চার শ' ফুট উঁচু। শুনেই যেন আরও বেশি শীত বোধ হয়। যে-ঘরে থাকবার কথা ছিল, আগে থেকে এক যাত্রী ছোট কলিকার ধূমের আবরণ সৃষ্টি করে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে গৃহচ্যুত করা সংগত নয়, তার পক্ষে কলিকা ত্যাগও সম্ভব নয়। অগত্যা নিকটে অপর এক বড় চালাঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে বাসোপযোগী করতে হল। সামনে ছোট উঠান। উঠানের চারিধারে গোলাপ প্রভৃতি ফুলের গাছ। গাছগুলি ফুলে ভরা। কিন্তু, গোলাপেরও কাঁটা থাকে! প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মাঝে চারদিকে ছোট ছোট অজস্র সাদা পোকার উপদ্রব। বাইরে বেশিক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াবার উপায় নেই, প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। সুধীর নিকটের জঙ্গল থেকে ঘটি হাতে ফিরে এল। সারা অঙ্গ চুলকাতে চুলকাতে বললে, বসবার জো নেই, ভাই, সমস্ত শরীর কামড়ে জ্বলে গেল!

সকলেরই ঐ একই দশা।

শোসায় রুকুমসিং-এর মাতুলালয়। বড়মামা খোসালসিং চৌদাস পট্টির পাটোয়ারী। প্রত্যেক ভোটিয়া পট্টির একজন করে পাটোয়ারী থাকে। নিজ নিজ এলাকায় তাঁর প্রবল প্রভাব। তাঁর অঞ্চলভুক্ত গ্রামগুলি তাঁরই তত্ত্বাবধানে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বভার তাঁরই উপর। একাধারে তিনি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-কর্তা বললেই চলে। আলমোরাতে ডেপুটি কমিশনারের কাছে চিঠি নেওয়া এ দেরই নামে।

রুকুমসিং-এর ছোটমামা প্রেমসিং। বড় ব্যবসায়ী। বহুবার তিব্বতে গিয়েছেন।

স্বামিজী বলেন, তাকে সঙ্গে নিতে পারলে অনেক সুবিধে। খোসাল

সিংজির সঙ্গেও দেখা করা বিশেষ দরকার। পথে গুজব শুনে এলাম, তিব্বত গভর্নমেণ্ট লিপুলেখ পাশ দিয়ে লোক যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। বসন্ত রোগের খবর পাবার পর ভারতবর্ষ থেকে ও-পথ দিয়ে লোক ঢুকতে দিচ্ছে না. পাছে তাদের দেশেও রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এঁদেরই আর এক ভাই গার্বিয়াঙে বিয়াস পট্টির পাটোয়ারী। এঁদের চিঠিপত্র সঙ্গে রাখলে তাকলাকোটে ঝুম্‌পান—অর্থাৎ তিব্বতের ঐ অঞ্চলের ডিভিশনাল কমিশনার—প্রদেশপালও বলতে পারেন, তাঁর সাহায্য পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু এইমাত্র রুকুমসিং খবর আনল, খোসালসিং, প্রেমসিং—তার দুই মামা-ই এখন শোসায় নেই—কিছু দূরে আর এক গ্রামে গেছেন, কাল ফিরলেও ফিরতে পারেন। এক কাজ করা যাক, কাল খুব ভোরে রুকুমসিংকে নিয়ে আমি ওঁদের সঙ্গে সেই গ্রামে গিয়ে দেখা করে আসব। আপনারা ন'টার মধ্যে রওনা হয়ে পড়বেন—একেবারে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে। তার মধ্যে আমরা ফিরে আসি ভাল, নয়ত, রাস্তায় আপনাদের কোথাও ধরে নেব।

অতএব, আজ এখন আর কোন কাজ থাকে না। যে যার বিছানা পেতে আরাম করে বসি। ভান্‌সিং গরম চা করে আনে। শীতের দেশে গল্পের আসর জমে।

অনুভবানন্দজি বললেন, আজ এই খাস চৌদাস পট্টিতে আপনাদের প্রথম রাত কাটানো, শোসা গ্রাম এ অঞ্চলের কেন্দ্র।

সুধীর বলে, তাহলে আজ এখানকার ভোটিয়াদের সম্বন্ধে কিছু শোনান।

তিনি বলেন, নৃতত্ত্ববিদ্‌ নই, ঐতিহাসিক নই,—সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, আমার আর এ-সব বিষয়ে জ্ঞান কতোটুকু বলুন? তবে, এই সব অঞ্চলে কয়েক বছর, কাটিয়েছি, ঘুরেছিও কিছু, সেই সুযোগে যেটুকু দেখেছি ও জেনেছি, তাই বলছি। ভোট শব্দটি ব্যবহার হতে শুনেছি তিব্বত সম্পর্কে—তিব্বতকে বলা হয় ভোট দেশ। ভোটিয়া বলতে তাই তিব্বতবাসী বোঝায়। কিন্তু, হিমালয় পর্বতের শেষ সীমান্তে—যার পরেই হোল তিব্বত,—এই যেমন যে-সব অঞ্চল দিয়ে আমরা এইবার চলতে সুরু করেছি,—এ স্থানগুলাকেও বলা হয় Little Tibet—ছোট তিব্বত, অর্থাৎ ছোট ভোট,—যদিও এটা ভারত এলাকা। সেই কারণে হয়ত এখানকার বাসিন্দারাও 'ভোটিয়া' নাম পেয়েছে। অথচ, মজা হচ্ছে, এখানকার লোকেরা নিজেদের 'ভোটিয়া' বলবে না। তারা 'ভোটিয়া' শব্দ ব্যবহার করে খাস তিব্বতীদের সম্পর্কে। আর নিজেদের বলে,

শক। কিন্তু পাহাড়ের নীচের দিকে—আলমোরা, পিথোরাগড় জেলার অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা এদেরই উল্লেখ করবে 'ভোটিয়া' নামে।

আমি বলি, কোথায় যেন পড়েছি, 'ভোট' শব্দের অর্থ হোল 'উত্তর'—সেই থেকেই 'ভোট' উচ্চারণের উৎপত্তি কিনা জানি না, তবে হতে পারে সেই কারণে এই সীমান্তবাসীদের উত্তরে তিব্বত, অতএব তারা তিব্বতীদের বলে ভোটিয়া, আর হিমালয়ের নীচের অংশের লোকদের উত্তরে বাস এই সব সীমান্ত-বাসীদের, তাই তাদের কাছে এরাও হয়ে গেল ভোটিয়া।

স্বামিজী বলেন, কিন্তু এখন আর এ-অঞ্চলে ভোটিয়া বলতে তিব্বতীদের বোঝায় না,—এইসব সীমান্তবাসীদেরই বোঝায়।

সুধীর বলে, দার্জিলিঙ্-এর দিকেও যে ভুটিয়ারা আছে—

স্বামিজী বাধা দিয়ে বলে, সে-ভুটিয়া কিংবা ভুটানের ভুটিয়া,—তারা হোল সম্পূর্ণ পৃথক। এখানকার যে ভোটিয়া দেখছেন, তাদের সঙ্গে বরং তুলনা চলে গাড়োয়াল-সীমান্তবাসী কয়েকটা ভোটিয়া সম্প্রদায়ের।

সেখানেও তিব্বতে যাওয়ার পাশ্-এর নীচে তাদের বাস,—যেমন, গঙ্গোত্রী অঞ্চলে জাহ্নবী বা জাঠগঙ্গার উপত্যকার সুরুতে নেলাং পাশের নীচে জাঠ-জাতি; বদরীনাথের ওপরে মানা পাশ্-এর পথে অলকানন্দা প্রকৃত নাম হোল সেখানকার বিষ্ণুগঙ্গা—ও সরস্বতীর সঙ্গমে 'মার্চা'রা। আবার, গাড়োয়ালের ধৌলী গঙ্গা ধরে নিতি পাশ্-এর দিকে এগুলে 'টোল্‌চা'রা। এই যে গাড়োয়ালের তিনটে, আর কুমায়ুনের এই পিথোরাগড জেলার চারটে, —ভোটিয়া সম্প্রদায়,—এদের জীবনধারা একই ভাবে বাঁধা। এরা সবাই ভারত-তিব্বত-সীমান্তে বাস করে,—হিমালয়ের এই একেবারে উত্তর প্রান্তে,—আট ন'হাজার ফুটেরও ওপরে। সেখান থেকে কিছু দূরে তিব্বতে যাবার এক একটা পাশ্,—তিব্বতের সে-অঞ্চলে প্রবেশ করে যে লোকালয় পড়বে, সেইখানে বছরে এক-একটা মণ্ডী বসে,—সেই সকল মণ্ডীতে এই ভোটিয়ারা ব্যবসা করতে যায়। আর সেদিন আপনাদের বলেছি, হিমালয়ের নীচের দিকে—তিন-চার হাজার ফুট উঁচুতে—এই সব ভোটিয়াদের শীতকাল কাটাবার প্রত্যেকের আস্তানা থাকে,—যেমন দেখে এলেন পথে বালুয়াকোটে, ধারচুলায়। পরিবারবর্গ—এদের ভেড়াছাগলও তারই মধ্যে পড়ে—সব সংসার নিয়ে নেমে আসে। সেখানে গিয়েও চুপচাপ বসে থাকে না। সেদিন শুনেছেন সে কথা,—প্রতি বছর সেই শীতের সময় এদের অনেকেই পাহাড়ের নীচে সমতলে

কোন বড় শহরের হাটবাজারেও ব্যবসা করতে নামে। ভোটিয়া জাতির এইগুলাই বৈশিষ্ট্য। তিব্বতে আর ভারতের সংযোগস্থলে থেকে দু দেশে ব্যবসা চালান।

সুধীর বলে, এরা তাহলে এত ঘোরাঘুরি করে যখন,—এদের যাযাবর বলা যেতে পারে?

স্বামিজী বলেন, না সুধীরবাবু, এরা যাযাবর নয়। যাযাবরদের নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে না, পথে পথে ঘোরে, তারা ভবঘুরে। আর ভোটিয়াদের ঘর সংসার পাতবার নির্দিষ্ট জায়গা আছে,—কিন্তু শীতগ্রীষ্ম বুঝে পাহাড়ের দুই ভিন্ন অঞ্চলে; ব্যবসা ক্ষেত্রও দুই দেশে—তিব্বতে ও ভারতে। আসবাব সময় দেখতেও পেলেন তাদের এই পাহাড়ের গ্রামেও কেমন চাষআবাদ করছে, শাকসব্‌জি ফসল ফলাচ্ছে।

সুধীর বলে, তা বটে। ফুল ফুটিয়ে আবার কেমন বাগানও সাজিয়েছে,—ঐ দেখুন না, উঠানের দিকে তাকালে চোখ জুড়ায়।

সুরেন্দ্র মহারাজ প্রশ্ন করেন, চৌদাসে ঢোকবার পর থেকে নজর করছি, নীচের পাহাড়ীদের সঙ্গে ভোটিয়াদের চেহারাতেও যেন কোন মিল নেই,—নয়? এই যেমন চোখের ওপর দেখুন, আমাদের ভানুসিং আর এখানকার কুকুমসিং।

ব্রহ্মচারীজি তাঁর ঔষধপত্রের আবার গোছগাছ করছিলেন, এদিকপানে মুখ ফিরিয়ে মন্তব্য করেন, আমাদের সুরেন্দ্র মহারাজ চুপচাপ থাকেন, আপনমনে চলেন, কিন্তু সব দিকে কেমন নজরও রাখেন!

অনুভবানন্দজি বলেন, এদের এই চেহারার পার্থক্য দেখলেই ধরা পড়ে। সাধারণতঃ ভোটিয়ারা খর্বাকৃতি হলেও একটু ষণ্ডামার্ক আছে। দেহের বেশ মজবুত গড়ন হবার কথাও,—পাহাড়ে পাহাড়ে অত ঘোরাঘুরি, কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে! এদের মাথাগুলোও প্রকাণ্ড। গোলাকার মুখ। চ্যাপটা নাক। ছোট চোখ। চোয়াল বড়—

সুধীর বলে ওঠে, শুদ্ধ ভাষায় বলুন, - হনুমান্!

স্বামিজী হেসে বলেন, মুখ কিন্তু মোটেই কালো নয়। ফর্সা, - বাদামী রঙ্‌। তিব্বতীদের মতন এদেরও দাড়ি-গোঁফের বিশেষ বালাই নেই। এদের চেহারায় মঙ্গোলীয় প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে,—তাইতে তিব্বতী রক্তের প্রমাণ হয়ত দেয়। এরা, অথচ, নিজেদের রাজপুত বলে প্রচার করে,—সকলে 'সিং' উপাধি

নেয়। জানি না, এইভাবে নিজেদের শক বা রাজপুত প্রচারের পেছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। হতে পারে, কোন এক সময়ে ভারতের সমতল থেকে রাজস্থানী অথবা শক-বংশীয় রাজারা কেউ হিমালয়ের এই অঞ্চলে সদলবলে পালিয়ে এসে বসবাস আরম্ভ করেন,—তাঁরাই হলেন এদের পূর্বপুরুষ। তারপরে কালক্রমে স্থানীয় আদিবাসী ও প্রতিবেশী তিব্বতীদের সঙ্গে মিলেমিশে বর্ণসঙ্কর ঘটেছে। এরকম ভাববার যথেষ্ট কারণও আছে। এদের ধর্মের দিকটাও দেখুন,—এরা নিজেদের হিন্দু বলে, আমাদের শিবপার্বতী ও অন্যান্য দেবদেবীকে মানে, আবার নিজেদের গ্রামদেবতাও রয়েছে। তাছাড়া, হিমালয়ের বড় বড় শিখরও এক এক দেবতা,—নদনদী বনভূমি সর্বত্রই দেবতার অধিষ্ঠান মনে করে, পূজাও করে। তবে ভূতপ্রেতেরও ভয় আছে, তাদের তুষ্ট করার জন্যেও পূজা দেয়। আচার ব্যবহার, সামাজিক প্রথা দেখলে কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্মের ছায়া দেখা যায়,—তিব্বতের এত কাছে ও তিব্বতী রক্ত গায়ে থাকলে এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়।

এইভাবে গল্প করে সময় কাটে। বাইরে সন্ধ্যাও নামে। হঠাৎ বাঁশির মধুর ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসে। সুধীর পুলকিত হয়ে তারিফ করে, বাঃ। এই তো চাই,—এমন সুন্দর জায়গায় এত মিষ্টি বাঁশি বাজে কোথায়?

স্বামিজী মৃদু হেসে বলেন, আপনার কানেই ঠিক আগে গিয়েছে? বাজছে রুঙ্‌বুঙে।—ওর সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল থাকে তো রুকুমসিংকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাদের দেশের ব্যাপার—তারই কাছে শুনবেন। আমি একবার গিয়ে দেখি, ভান্‌সিং-এর রান্না কতদূর। কাল ভোরে রওনা হতে হবে।

সুরেন মহারাজ, চলুন, আপনার ভাঁড়ারের 'স্টক্ পজিসান'ও একবার জেনে নিই।

দুজনে উঠে যান্। অল্পরে রুকুমসিংও ঢোকে। আমাদের কম্বলের ওপর জমিয়ে বসে। রুঙ্‌বুঙের ইতিবৃত্ত তার কাছে শুনি।

রুঙ্‌বুঙ্, দর্‌মা, বিয়াস্ ও চৌদাস ভোটিয়াদের ক্লাব বিশেষ। স্বয়ংবর সভা বললেও অত্যুক্তি হয় না। অতিবাহিত ভোটিয়া তরুণ-তরুণীরা সন্ধ্যার পর গ্রামের একটি নির্দিষ্ট গৃহে সমবেত হয়। শুধু সেই গ্রামেরই যুবকের থাকবার অধিকার, এমন প্রথা নয়। সন্ধ্যার আগে গিরিশিরে যখন অস্তমান সূর্যের শেষরশ্মি রক্তিম আভার ফাগ ছড়িয়ে দেয়, তখন পাহাড়ের কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্রামের কোন তরুণী হয়ত সুর করে উচ্চকণ্ঠে গান ধরবে, রঙ্গিন রুমাল

নাড়বে, সঙ্গে মাদল ও বাঁশিও বাজবে। বাতাসে ভেসে যাওয়া সেই গানের সুর, বাজনার ধ্বনি, দূর-থেকে-দেখা সেই রুমালের সংকেত দূরদেশী গ্রামবাসী তরুণদেরও জানিয়ে দেবে,—রুঙ্‌বুঙে মিলনের ঐ আমন্ত্রণ এসেছে। যার খুশী চলে আসে। যোগ দেয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত নাচ, গান, বাজনার মধ্যে অবাধে পরস্পরে মেলামেশা চলে।

এই মিলনের মাঝে প্রেম জাগলে বিবাহের প্রস্তাব হয় এবং উভয়পক্ষের সম্মতি থাকলে বিবাহও হয়ে যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদেরও প্রচলন আছে।

এই স্বাধীন মিলনে যেমন নির্মল প্রেমের জয় ও আনন্দ থাকে, তেমনি পরাজিত প্রেমের হিংসা ও লালসার কলুষতাও প্রকটিত হয়।

এই রুঙ্‌বুঙ্‌ কেন্দ্র করে বহু ভোটিয়া লোকসঙ্গীতও প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুখে মুখে নিত্য রচিত হচ্ছে।

রুকুমসিং-এর সরস বর্ণনা শুনে ভাবি, শৌখিন ভবনের খোলা বারান্দার পটভূমিতে রোমিও-জুলিয়েটের প্রেম-নিবেদন সেক্সপীয়রের অমৃতময় রসসৃষ্টি, —আর এখানে এ যে হিমালয়ের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জুলিয়েট, গ্রামে গ্রামে রোমিও!

রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি নামে।

ঘরের চালের উপর বৃষ্টির পদধ্বনি, তারই মাঝে দূরাগত বাঁশির করুণ সুর শ্রান্ত নয়নে ঘুম ডেকে আনে।

॥ ১০ ॥

অতি প্রত্যূষে অনুভবানন্দজি ও রুকুমসিং প্রেমসিং-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে যান্‌।

বেলা ন'টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা প্রস্তুত হবার আগেই তাঁরা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। সেই গ্রামে প্রেমসিং ও পাটোয়ারীজি একজনেরও সাক্ষাৎ পান নি।

আশ্চর্য মানুষ অনুভবানন্দজি। শেষরাত্রে উঠে পাহাড়ের পথে এই যে নিষ্ফল যাতায়াত, তার জন্য তাঁর দেহও ক্লান্ত নয়, মনও ক্ষুণ্ণ নয়। হাসিমুখে বলেন, চলুন, রওনা হওয়া যাক্‌। চেষ্টা ত করা গেল, তারপর ভাগ্যে কি আছে, দেখা যাবে। কি বলেন, সুধীরবাবু? আপনাদের ত খাওয়াদাওয়া শেষ, আমিও তাড়াতাড়ি মুখে দুটো দিয়ে নিই।

সাড়ে ন'টায় শোসা থেকে যাত্রা।

নিকটে গভীর জঙ্গল। নানারকম বন্যজন্তুর বাসস্থান। বিচিত্র কি?

মাইল দুই চড়াই পথ। আবার পরিশ্রম সার্থক হয় চড়াই-শেষে। পাহাড়ের মাথায় অতি মনোরম স্থান। বড় বড় গাছের ছায়াতলে ভেড়াছাগল চরছে। একধারে একটা ঘণ্টা ঝোলে। কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে জানি না। নিকটে গাছের ডালে ডালে বাঁধা নানা রঙের ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা পাহাড়ীদের ভূতভয় দূর করার আবেদন নিয়ে প্রার্থনার রূপ ধরে বাতাসে দোলে; আশপাশে স্তূপীকৃত পাথর-সাজানো সেই 'কেয়ার্ন'। ন'হাজার ফুটেরও ওপর দিয়ে আবার কোন পাশ্ পার হচ্ছি। ঠিক তাই-ই। টিথ্লাকোট পাশ্। এবার অপর দিকে পাহাড় থেকে নেমে চলা। মাইল খানেক গিয়ে সিরদাং গ্রামের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলি। ছোট গ্রাম। গ্রামের বাইরে সামান্য দূরে পাহাড়ের মাথার ওপর মনোহর পরিবেশে স্কুল-গৃহ। সেখানে যাত্রীরা প্রয়োজন হলে থাকতে পারে। গ্রামবাসীদের কাছে খাদ্যাদি সংগ্রহ করাও দুরূহ নয়।

আরও আধ মাইল নীচে নেমে এসে আরেকটি ছোট সুন্দর গ্রাম—শির্খা। ওপর থেকে ছবির মত দেখায়। শির্খায় একটা পাথরের তৈরি গির্জা রয়েছে। ভোটিয়া পট্টিতে এই প্রথম গির্জা দেখলাম। শুনি, কুমারী সেল্ডন্ নামে এক আমেরিকান মহিলা-চিকিৎসক এটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় ভোটিয়াদের মধ্যে তাঁর সেবাব্রতের যশঃপ্রচার আছে।

অনুভবানন্দজি গ্রামের নিকটে এক পাহাড়ীর সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত দেখি। লোকটির বেশভূষায় পারিপাট্য আছে। নেপালী ধরনের চোস্ত ব্রিচেশ্-এর মত প্যাণ্ট পায়ের জুতা স্পর্শ করেছে। পরনে শার্ট, ওয়েস্ট কোট, তার ওপর বুক-খোলা গরম কোট। কোটের বুকে ঘড়ির রূপার চেন্ ঝোলে। প্রৌঢ় হলেও দেহে ও চালচলনে কর্মক্ষমতার সজীবতা সুস্পষ্ট।

তাঁদের কাছে পৌঁছুলে স্বামিজী মুখে উৎসাহ দেখিয়ে বলেন, এই এঁর কথাই দুদিন থেকে বলছিলাম। ইনিই প্রেমসিংজী। আমাদের সঙ্গে যাবার কথা এঁকে বলছি—

তারপর প্রেমসিং-এর দিকে তাকিয়ে বলেন, প্রেমসিংজি, আপনার যখন পূর্ণিমার দিন মানস সরোবরে স্নান করতে যাওয়ার কথা রয়েছে, তখন চলুন না কেন একই সঙ্গে?

প্রেমসিং ওয়েস্টকোটের দু'পকেটে দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি পুরে একটু বুক চিতিয়ে উত্তর দেন্, দেখি, আপনাদের সঙ্গে যাওয়া হয়ে উঠবে কিনা। হাঁ,—সরোবরে তর্পণ করতে আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু, জানেনই ত আমার কাজকর্মের চাপ,—আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে চাই। আপনাদের সঙ্গে,—আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি, স্বামিজী, আপনি যখন বলছেন,—দেখব সব ভেবেচিন্তে।

সঠিক কিছুই বলে না। কথার আবরণের ফাঁকে পাকা ব্যবসায়ী উঁকি মারতে থাকে।

স্বামিজী বলেন, আচ্ছা চলুন ত এখন পাটোয়ারীজির কাছে। তারপর দেখা যাবে।

পাটোয়ারী খোসালসিং—এঁর দাদা—কিছুদূরে আর এক গ্রামে এখন আছেন। সেই উদ্দেশে স্বামিজী প্রেমসিং-এর সঙ্গে অন্য পথে যাত্রা করেন। বলেন, বিকালে আবার আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

ভাবি, স্বামিজীর উৎসাহের কি সীমা নেই, পথ চলারও ক্লান্তি নেই! এই দাম্ভিক লোকটার পিছনে ঘোরাঘুরির প্রয়োজনই বা কি?

আমরা আমাদের পথে এগিয়ে চলি। উৎরাই নামা,—চলতে হাঁফ লাগে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইল দেড় দুই চলে আসি। পথের পাশে ঝরনার ধারে ছোট গ্রাম। সমৃরি বা সুমারিয়া। গ্রাম ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর চলে এসেছি। বেলা ১টা ১০ মিনিট। শোসা থেকে মাইল ছয়েক আসা হয়েছে। সুমুখে গগনস্পর্শী এক পাহাড় যেন দৈত্যের মত পথরোধ করে মাথা তুলে দেখা দেয়।

রুকুমসিং পাহাড়ের উপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ যে একেবারে ওপরের গাছ—না, না ও-গাছটা নয়, আরও ডাইনে ঐ ওপরে লালমতন দেখাচ্ছে—ঐ ওখানে এখন উঠতে হবে,—বিকট চড়াই আছে, বাবুজি!

সকলে মাথা তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাই। ঘোড়ার জন্য ব্রহ্মচারীজির আবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বলেন, আজ এইখানেই থাকা যাক্। কাল সকালে রোদ ওঠার আগে আরামে চড়াই ওঠা যাবে। সারাদিন এখনও পড়ে, এরি মধ্যে থেমে যেতে মন চায় না। গন্তব্যের পথে যতদূর এগোনো যায় তাই লাভ। তার ওপর আমাদের দলপতি অনুভবানন্দজি এখন সঙ্গে নেই, তিনিই বা এসে বলবেন কি?

কিন্তু, ব্রহ্মচারীজি জানান, তাঁর শরীর তেমন ভাল বোধ করছেন না।

এরপর আর কথা চলে না। ঐখানে বড় ঝরনার ধারে তখনি তাঁবু ফেলার বন্দোবস্ত হয়। নিকটে গ্রাম বা কোন লোকবসতি নেই। পোর্টাররা থাকবে কোথায় ?—তারা দ্বিধা না করে জানায়, পাহাড়ের গায়ে ঐ ওখানে 'ওডার'—গুহা—একটা রয়েছে, ভাবনা কি ?

অনুভবানন্দজি এসে গেলেন। উৎফুল্ল মুখে জানালেন, যাক্। সব ব্যবস্থা ঠিক করে এলাম। বড় ভাবিয়ে তুলেছিল। কে জানে ? এতদূর এসে শেষকালে লিপুলেখের কাছে বসিয়ে রেখে দেবে ? বন্দোবস্ত করে এলাম, প্রেমসিং আমাদের সঙ্গে তিব্বত যাবে। আমাদের সব ব্যবস্থাদির জন্যে গার্বিয়াঙে দু'তিন দিন থাকতে হবেই, তার মধ্যে সে এসে ওখানে যোগ দেবে। লিপুলেখে বরফের কি অবস্থা পাব তা বলা যায় না, প্রেমসিং-এর মত একজন অভিজ্ঞ ও হুঁসিয়ার সঙ্গী সঙ্গে থাকলে অনেকখানি নিশ্চিন্দি ! পাটোয়ারীর কাছ থেকে চিঠিপত্রও নিয়ে এসেছি। ওঃ ! কম দুর্ভাবনা কাটল !

তাঁবু ফেলতে দেখে আশ্চর্য হলেন, এ কী ! এরই মধ্যে আজ এখানে আস্তানা গাড়ছেন ? ব্যাপার কী ?

ব্রহ্মচারীজির অসুস্থতার সংবাদে বলেন, যাক্ এখন এক আধ বেলা গেলেও ক্ষতি নেই। গার্বিয়াঙে যে ক'দিন কম থাকা যায়, ভাল। প্রেমসিং গিয়ে না পৌঁছুলে ত আর সেখান থেকে রওনা হচ্ছি না। ব্রহ্মচারীজির শরীর বিশেষ কিছু খারাপ হয় নি ত ? আপনার ওষুধ বার করে একটা খেয়ে নিন্।

সারাদিন কিছুই করবার নেই।

দূরের পথিক চিত্ত এখন সুদূরের আশায় কেবলি ছুটে চলতে চায়। এই নিরবচ্ছিন্ন পথ চলার মাঝেই তার আনন্দ।

সুধীরের সঙ্গে নিকটস্থ ঝরনার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াই। অনুভবানন্দজি সাবধান করেন, দেখবেন, ওদিকের জঙ্গলে ঢুকবেন না, কখন কোন্ প্রভু বার হন্, তার ঠিক কি ?

মুখে বলি, নাঃ, ভয় নেই। বেরোয় ত ক্যামেরা আছে, ছবি তুলে নেব—এমনি ছাড়ছি না।

কিন্তু, পরক্ষণেই মর্মর ধ্বনিতে চমকিয়ে উঠি, চারপাশে সভয়ে তাকাই। দেখি, গাছের ওপরে ডালে ডালে লেজ ঝুলিয়ে বসে বানরের দল। অসভ্য জানোয়ার ! সভ্য জগতের মানুষ দেখে সম্ভ্রম নেই, মুখ বিকৃতি করতে থাকে !

পোর্টারদের রাত্রিবাসের স্থান দেখতে চলি।

পাহাড়ের গায়ে ছোট গুহা। চার পাঁচ জন মাত্র শুতে পারে। বাকি সকলে থাকবে কোথায়? তাদেরও স্থানের অভাব হবে না,—ওপরে আরও বড় ওডার রয়েছে। একজন পোর্টার আমন্ত্রণ করে, তোমরাও চলে এস, থাকবে ওখানে।

গুহার মুখ হাঁ করে খোলা। বাঘ ভালুক ঢুকলে—?

পোর্টাররা হেসে ওঠে।—আগুন থাকলে জানোয়ার আসে কখনো?

কাঠের অভাব নেই। জঙ্গল থেকে এনেছে। গুহার সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সারারাতই জ্বলবে। গুহার ভিতর গরমও থাকবে।

এখন সেই আগুন ঘিরে বসে কেউ মৌজ করে ধূমপান করে, কেউ বা কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে, পিট্‌পিট্ করে তাকায়, মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে। একপাশে দুজন একটা প্রকাণ্ড ডেক্‌চিতে ছাতু ভিজাতে ব্যস্ত। আজ রাত্রে তাই আহার।

আমরাও সন্ধ্যার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁবুর মধ্যে শুয়ে পড়ি।

রাত্রে অতিরিক্ত শীত বোধ হওয়ায় ঘুম ভাঙে। দেখি, বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে! তাঁবু ভেদ করে ভিতরে কয়েক জায়গায় জলও প্রবেশ করে সরে শোবার স্থান নেই; মালপত্রে চারপাশ বোঝাই। ওয়াটারপ্রুফ্ টেনে নিয়ে গায়ের ওপর বিছাই,—টপ্‌টপ্ করে তারই ওপর জল পড়তে থাকে। টর্চ জেলে সঙ্গীদের দেখি। সকলেই মিট্ মিট্ করে তাকান। সবারই সমান দুর্দশা। ব্রহ্মচারীজি শুয়েছেন একধারে। তাঁর কষ্টের পরিসীমা নেই। পাশে তাঁবুর নীচে থেকে পাহাড়ের জল গড়িয়ে এসে তাঁর বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। সবাই নিরুপায়।

এমনি সময়ে ভানুসিং ও কুকুমসিং তাদের নিরাপদ গুহার আরামশয্যা ছেড়ে এই জলের মধ্যেই তাঁবুর বাইরে চারিদিকে জল নিকাশের জন্য নালা খুঁড়তে আপনা থেকেই তৎপর হয়। বৃষ্টির শব্দের মধ্যে তাদের গলার স্বর শোনা যায়।

মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। ভাবি, সেবাধর্মের মর্ম এরাই বোঝে।

আপাদমস্তক কম্বল টেনে আবার শুয়ে পড়ি। ঘুম আসতে বিলম্ব হয় না।

॥ ১১ ॥

ভোরবেলায় যথানিয়ম শয্যাত্যাগ। জিনিসপত্র বেঁধে আবার পথ চলতে প্রস্তুত। রাত্রের বৃষ্টিতে ভিজে তাঁবুর ওজন দ্বিগুণ বেড়েছে। পোর্টার সেই বোঝা পিঠে নিয়ে মুখ বিকৃত করে, বিড়বিড় করে কার উদ্দেশে গালি পাড়ে। ৫টা ৪০-এ যাত্রা সুরু হয়।

প্রায় তিন মাইল খাড়া চড়াই। তেমনি সুগভীর জঙ্গল। অতি ধীরে ধীরে উঠি। যে যার আপন মনে, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী গতিবেগে। অনুভবানন্দজি সবার আগে এগিয়ে চলেন। প্রয়োজন হলে অপেক্ষা করেন। কিছুদূর এগিয়ে দেখি, পোর্টাররা সার বেঁধে চলেছে। পিঠের অমন ভারী বোঝা তবুও কেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে একতালে পা ফেলে চড়াই ওঠে। তাদের পথ চলার সহজ সুন্দর ভঙ্গি এই দুরূহ পথে আমারও মনে চলার প্রেরণা যোগায়।

দেড় ঘণ্টা একটানা চলবার পর পাহাড়ের মাথার উপর পৌঁছুই। সুমারিয়াধর। কেউ বা বলে রুংলিঙ্। প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে। পথের পাশে আবার সেই পাথর-সাজানো স্তূপ, গাছের ডালে ওড়ে রঙিন্ কাপড়ের পতাকা। সুধীর বলে, ওগুলো কাছে এলে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায়। পোর্টারদের সিগারেট বিলিয়ে দিয়ে,—চল্ ঐ পাথরটার ওপর কিছুক্ষণ এবার জিরোন যাক্।

কিন্তু সুস্থির হয়ে বসে বিশ্রাম নেয়, সাধ্য কার? অন্তরায় ঘটায় ছোট ছোট পোকার অসহ্য উপদ্রব। হাতে-মুখে কামড়ের তো কথাই নাই, এমন কি মোটা মোজা ভেদ করে পায়ে কামড়াতে থাকে। বুদ্ধিমান রুকুমসিং নিকটের জঙ্গল থেকে শুকনা কাঠ নিয়ে আসে, আগুন জ্বালায়। আগুন ও ধোঁয়ার কল্যাণে আমরাও পোকার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাই।

সহসা দেখি, পোর্টাররা বিশ্রাম ভুলে কি যেন লক্ষ্য করে হৈ-চৈ শব্দ তুলে জঙ্গলের দিকে ছুটে যায়। প্রকাণ্ড এক গাছের তলায় জটলা করে সোরগোল তোলে।

ব্যাপার কী? উঠে দেখতে চলি। গাছের গুঁড়ির কোটরে মস্ত এক ভেড়ার অর্ধদগ্ধ মাংস!

এখানে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও জনপ্রাণী নেই, এভাবে মাংস এল কি করে?

রুকুম সিদ্ধান্ত দেয়, নিশ্চয় কাল কোন পাহাড়ীরা এখানে পোড়াচ্ছিল, হঠাৎ বৃষ্টি আসায় ফেলে রেখে পালিয়েছে, ঐ তো ওধারে পোড়া কাঠ রয়েছে।

পোর্টারদের মহা স্ফূর্তি। সকলে মিলে মাংস কেটে ভাগ করতে বসে। আজ তাদের বিরাট ভোজ। ভাবি, কার মুখের গ্রাস কার ভোগে যায়!

পোর্টারদের বোঝার উপর অনাবৃত অর্ধদগ্ধ মাংস টুকরা ঝুলিয়ে নিতে দেখে সুধীর বলে, স্বামিজী! বিছানার ব্যাগের ওপর ওভাবে ঝুলিয়ে নিতে বারণ করুন, না হলে সারারাত ও-বিছানায় শুয়ে চোখে যে শুধু ঐ কাঁচা মাংসেরই চেহারা দেখব।

অতএব, স্বামিজীর নির্দেশে পৃথক বোঝা হয়ে অস্পৃশ্য ভাবে সে মাংসপিণ্ড অন্য পোর্টারের পিঠে আশ্রয় নেয়। বোধ করি, যথাসময়ে অগ্নি-সংস্পর্শে তার সব অস্পৃশ্যতা দোষই ঘুচবে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। ব্রহ্মচারীজির এখনও দেখা নেই। ভানুসিং তাঁর সঙ্গে আছে। তবুও, অনুভবানন্দজি আর একজন পোর্টারকে নীচে পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরে ভানসিং ও সেই পোর্টার শ্রান্ত ব্রহ্মচারীজিকে দু' পাশে ধরে উপরে নিয়ে আসে। চড়াই উঠতে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে মাঝপথেই তিনি বসে পড়েছিলেন। এসে দম নিয়ে বলেন, উঃ! বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি। এভাবে হেঁটে খাড়া চড়াই উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

অনুভবানন্দজি উদ্বিগ্ন হয়ে জানান, বলেন কী? কষ্টর পথ তো এখনও পড়ে রয়েছে, আসেই নি! এতেই ক্লান্ত হলে চলবে কি করে?

কিন্তু, আপাততঃ ব্রহ্মচারীজির উদ্বেগের আর কারণ থাকে না। চড়াই শেষ। এখন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলা। সুধীর বলে, আবার আর একটা পাহাড় তাহলে ডিঙ্গোনা হোল।

উৎরাই হলেও পথের দুর্গমতা আর এক রূপ ধরে দেখা দেয়। গতরাত্রের প্রবল বর্ষণের ফলে অতীব পিচ্ছিল হয়েছে। পাহাড়ের একদিকের অংশও নিবিড় জঙ্গল। নাম শুনি বুঙ্‌বুঙ্‌। পথের দুই পাশে প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ। পরস্পরের লতা ও গুল্মের নাগপাশে ঘন আবদ্ধ। সেই শাখা-প্রশাখার বর্ম ভেদ করে কয়েকটি তীক্ষ্ণ সূর্যরশ্মি তির্যক্‌ভঙ্গিতে নেমে এসে 'ধরিত্রীর পত্রকীর্ণ আর্দ্র বক্ষে' আঘাত করছে। রুকুমসিং ও ভানুসিং আমাদের নিকটে এগিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে দেয়। বলে, বাবুজি, বড্ড পিছল, হাত ধরে চলুন।

সাহস নিয়ে বলি, দরকার নেই, ঠিক্ যাব। তোমরা এগিয়ে চল।

পঞ্চরথী ধীরে ধীরে সাবধানে পা ফেলে চলি। কাউকে ধরতে হয় না, কেউ পড়েনও না। তবে প্রতি পদক্ষেপেই মন সতর্ক থাকে, এই বুঝি বা পা পিছলায়:

তিন মাইলের উপর এই ভাবে নামা। পথের দু' পাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য যেন ঘুমঘোরে বিকৃতস্বরে শব্দ তোলে। কখনো ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ঝিন্ ঝিন্ রব, কোথাও বা পথের পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড গিরগিটির ছুটে যাওয়ার খস্‌খস্ শব্দ। নানা বর্ণের ও আকৃতির পোকা-মাকড় সরীসৃপের দ্রুত ঘোরাঘুরির খস্‌খস্ ধ্বনি। একমনে পথ চলার বিঘ্ন ঘটায়। বারংবার চমকে উঠি।

সুধীর বলে, যেমন স্যাঁতসেঁতে পেছল পথ, তেমনি বিকট জঙ্গল!

স্বামিজী জানান্, এ-বনে বড় বড় বাঘেরও বাস বলে প্রসিদ্ধি আছে,—তবে ভয় নেই, সুধীরবাবু, এত লোকজন দেখলে তারা দেখা দেন্ না,—শুধু নজর রাখুন পায়ের দিকে—হড়্‌কাবেন না যেন।

অবশেষে পৌঁছে যাই এ-পাহাড়ের নীচে! অপরূপা পাহাড়ী এক ঝরনা। জলতরঙ্গে স্বর তুলে নেচে নেচে নেমে চলে। সুধীর বলে, একেই বলে দৈত্য-কুলের পাহারা পেরিয়ে রাজকন্যার দর্শন।

ব্রহ্মচারীজি বলেন, আপনার কবিত্ব রাখুন, পার হওয়া যাবে কোথা দিয়ে?

রুকুমসিং এগিয়ে গিয়ে দেখায়, এক জায়গায় নদীর উপর কাঠ পাতা। ধারে ধরবার রেলিঙ্ বা আর কিছুই নেই।

তা হোক্। পারাপারের কাঠ তো আছে। সাবধানে পা ফেলে একে একে পার হই। কিছু দূরে এতক্ষণে লোক-বসতি দেখা গেল। সাঙ্খোলা গ্রাম।

আবার একটা ছোট নদী পার হয়ে মাইল দেড়েক ধীরে ধীরে পথ ওঠে। ছোট এক গ্রামে পৌঁছুই। বড় বড় ওক্ ও আখরোট গাছে ঘেরা। গলাগড়,—৭,০০০ ফুট উঁচু। গ্রাম অর্থে পাহাড়ীদের খানকয়েক ঘর। অতি অপরিচ্ছন্ন।

অনুভবানন্দজী গম্ভীর গলায় বলেন, সুধীরবাবু, এইবার সুরু হবে সেই নিরপানির-পাহাড়!

সবাই চোখ তুলে সুমুখের পাহাড়টাকে দেখি।

সুধীর মন্তব্য করে, কই? নিরপানির ভীষণতা তো কিছুই দেখছি না।

যেমন সব বনজঙ্গল আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় চারপাশে,—এও তেমনি।

স্বামিজী হেসে বলেন, সবুর করুন,—কাল দেখবেন এই শান্তশিষ্ট পাহাড়টিরই অপর দিকের ভয়ঙ্কর মূর্তি!

সুধীর বলে, ইনি তা হলে সেই 'ডক্‌টর জেকিল—মিস্টার হাইড্‌'!

অনুভবানন্দজি গাম্ভীর্য রেখেই বলেন, এখন ও সব ইংরেজি পরিহাস রাখুন, এই নিরপানির পরিচয় কিছুটা দিই, তারপর স্বচক্ষে দেখবেন। এই পাহাড়টা ভালয় ভালয় পার হয়ে যেতে পারলে, আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। তিনটে পথ আছে পাহাড়টা পেরিয়ে যাবার। কাল আমরা যাব নীচের পথ দিয়ে, কালী নদীর অনেকখানি ধার দিয়ে। সেই পথটাই হচ্ছে এরি মধ্যে তবুও কিছু ভাল। সেই দিকে স্থায়ী ভাবে নতুন পথ তৈরির কাজ চলেছে। পাহাড়ের মাঝামাঝি গা দিয়েও আর একটা পথ আছে, বিশেষ সুবিধের নয়, অনেক সময়েই সে দিক দিয়ে যাওয়া যায় না। আর, তৃতীয় পথটি গেছে পাহাড়ের অনেক ওপর দিয়ে—প্রায় মাথার কাছে উঠে। সে রাস্তা বার হয়েছে এই গলাগ্রাম থেকে। কিন্তু সে কি আর পথ? বর্ষা শুরু হলেই নীচের রাস্তার মাঝে ঝরনা ও নদীর ওপর যে দু-চারটে অস্থায়ী পুল থাকে,—জলের তোড়ে সে-সব ভেঙ্গে ভেসে উধাও হয়, তখন অগত্যা ওপরের ঐ পথ দিয়েই লোকজন যাতায়াত করে,—নেহাৎ বাধ্য হয়ে যেতে না হলে কেউ যায়ও না,—যায় কেবল ডাক-হরকরা! এমনি ভয়ঙ্কর সেই রাস্তা!

সুধীর প্রশ্ন করে, সে-পথ দিয়ে আপনাকে কখনো যেতে হয় নি?

হয়নি আবার? ওঃ! এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিজের কথা ভেবে নয়, এ-শরীর রইল কি গেল, তার আর ভাবনা কি। ভয়-ভাবনা হয় সঙ্গীদের নিরাপত্তার জন্যে। প্রায় ছ' মাইল রাস্তা, একটানা চলতে হয়। মাঝে না আছে কোন লোকালয়, না পাওয়া যায় তাঁবু ফেলার মত জায়গা! খাড়া চড়াই উঠতে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়, কিন্তু, ত্রিসীমানায় তৃষ্ণার জলের সন্ধান মেলে না। ঐ কারণেই নাম,—নিরপানি। তার ওপর যেমন বিছুটির জঙ্গল, তেমনি পিছল। এই তো সে-বছর সঙ্গীদের নিয়ে ঐ পথ দিয়ে ফিরতে হোল,—নীচের পথের পুল ভেঙে যাওয়ায়। সে কী কঠিন পরীক্ষা! সঙ্গে যে কটা ফ্লাস্‌ক্‌ ছিল,—সবগুলির জল নিঃশেষ হয়ে শুধু পিঠের বোঝাই বাড়িয়েছে। পিপাসায় ছাতি ফাটে, একজন সঙ্গী পথের ধারে একটা চাটাল পাথরের ওপর ছোট একটা গর্তে বৃষ্টির সামান্য একটু জল জমা দেখে তখনি

এগিয়ে গিয়ে অঞ্জলিভরে তাই তুলে মুখে দিলে,—একবার তাকিয়ে দেখলে না শেওলা-জমা, ব্যাঙাচি-ভাসা জলের সে কী বীভৎস চেহারা। কিন্তু, তাতেই যেন প্রাণ পেল। খানিক পরে মাঝপথে নাম্‌ল সন্ধ্যে। সঙ্গে আলো নেই, আবছা অন্ধকারে কোন রকমে পথের রেখা চিনে চলেছি,—সব সময়ে যে হেঁটে তাও নয়, মাঝে মাঝে বসে পড়ে পাথরের গা বেয়ে নামতে হচ্ছে। এমনি এক জায়গায় পথ হারিয়ে গেল। কোন ধার দিয়ে যে যাব বোঝাই যায় না। কাঁটাগাছের ঝোপে হাত পা লাগতেই জ্বালা ধরাচ্ছে। এক বৃদ্ধ সঙ্গী সেইখানেই বসে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে স্বরু করলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর কাকে কোথায় পাঠাতে হবে তাও শোনালেন। ভাগ্যক্রমে একজনের কাছে দেশলাই ছিল। তারই সাহায্যে কোনরকমে দুটো শুকনো ডাল দেখতে পেয়ে মশালের মত একটু আলো পাওয়া গেল, রাস্তারও আবার সন্ধান হোল। কিছুদূর যাবার পর দেখি কুলিরা গ্রামে পৌঁছে মালপত্র রেখে আলো নিয়ে ফিরে আসছে আমাদের সন্ধানে। উঃ। কী দুশ্চিন্তার মধ্যেই না সেদিনটা কেটেছিল। আমাদের এক সঙ্গী সাধু তো অন্ধকারে, বুঝতে না পেরে, পথ থেকে গড়িয়ে পড়েই গিয়েছিলেন, নেহাৎ পরমায়ু ছিল, একটা পাথরে আট্‌কে কোন রকমে রক্ষা পান্‌। যাক্‌ ও-সব গল্প আর শুনিয়ে কাজ নেই। ফেরবার সময় আপনাদের ঐ ওপরের রাস্তা দিয়ে না আসতে হলেই মঙ্গল। আশা করা যায়, ততদিনে নীচে নতুন রাস্তার কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আর কৈলাসপতিকে স্মরণ করে সব চলেছি, মনে ভয় থাকবে কেন ? যিনি রাখবার তিনি নিশ্চয় ঠিক রাখবেন। কি বলেন, স্বধীরবাবু ?—বলে হাসতে থাকেন।

নির্বাক হয়ে স্বামিজীর ভয়াবহ পথের বর্ণনা শুনি। বার বার একটা কথা কানে বাজতে থাকে, সব সময়ে যে হেঁটে, তাও নয়,—মাঝে মাঝে বসে পড়ে ও পাথরের গা বেয়ে নামতে হচ্ছে।

ভাবি, অনুভবানন্দজিকেও বসে বসে নামতে হয়েছে।

গলাগ্রাম থেকে প্রায় দেড়মাইল দূরে জিপ্‌তি। প্রায় আট্‌ হাজার ফুট উঁচু। চড়াই পথ হলেও ধীরে ধীরে উঠেছে। পৌঁছুতে বেলা ১০টা ৫০ হোল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারদিক থেকে কুয়াশা—'ফগ্‌'ও ঘিরে আসে। মাঝে মাঝে স্বমুখের গাছপালা পাহাড় পর্যন্ত দৃষ্টির অগোচর করে। কেমন যেন থম্‌থমে আবহাওয়া।

পথের উপর একটিমাত্র দোকান। তারই পাশে প্রকাণ্ড চালাঘর। এই নিয়েই জিপ্ তি। সেই চালাঘরে আজ বাকি দিনটুকু ও রাত কাটাতে হবে। বিকালে নিরপানির পথ-চলাচল অতীব বিপজ্জনক। পাহাড়ে ধস্ নামার আশঙ্কা থাকে। কাল সকালেও যদি বৃষ্টি নামে, এখানে থেকে যেতে হবে;—নিরপানি আত্মনামের নির্জলা গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়, তাই সামান্য জলস্পর্শেও দুর্গমতর ও আরও ভীষণ হয়ে ওঠে।

পোর্টারদের পৌঁছানোর আগেই একপশলা বৃষ্টি নামে। দোকানদার তার ঘর থেকে চাটাই বার করে আনে। চালাঘরের এক অংশে মাটিতে বিছিয়ে দেয়। নানা রঙের ফুল-কাটা পুরানো একটা গালিচাও কোথা থেকে এনে চাটাই-এর উপর পাতে। নিজ-ব্যবহারের জন্য যেটুকু জল সংগ্রহ করা ছিল, তাও এনে রাখে। অতিথি-সেবার ঐকান্তিক আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

পোর্টারদের অপেক্ষায় কালাতিপাত না করে ভান্‌সিং দোকানদারের কাছ থেকে বাসন চেয়ে নেয়, তখনি রান্না চড়ায়। বিশ্রামস্থলে পৌঁছেও বিশ্রাম করা তার কাছে নিষ্প্রয়োজন।

এই চালাঘরের আর এক অংশে এক সন্ন্যাসী ও তাঁর শিষ্য আশ্রয় নিয়েছেন। সাধুর নগ্নদেহে ভস্মের আবরণ, পরনে কৌপীনমাত্র সার। উনানের নিকটে বসে ছোট কলিকার ব্রহ্মাস্ত্রের বলে অন্তর বাহির শীতের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

সুধীর একমনে তাকিয়ে দেখে। হাসে। জিজ্ঞাসা করি, হাসছিস্ যে বড়?

সে বলে, সাধুকে দেখে হিংসে হচ্ছে। শীতের ভয়ে আমরা এতো খরচ করে কতো পোষাক পরিচ্ছদ কম্বল টেনে এতেও শীতে এখানে বসে কাঁপছি, আর শীত নিবারণের ঐ অতিসামান্য অথচ অব্যর্থ কৌশলটুকু অভ্যাসের চেষ্টাও একবার করলাম না।

দোকানদারদের কাছে খবর পাওয়া যায়, সন্ন্যাসী কৈলাস দর্শন করে ফিরছেন। 'তাই নাকি?' বলে স্বামিজী তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে এগিয়ে যান্। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ফিরে আসেন। আমাদের জানান্, পথের অবস্থার কিছু খবর নিয়ে এলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরটির বাহাদুরি আছে। পশ্চিম ভারতের শরীর। নেপালে গিয়েছিলেন পশুপতিনাথ দর্শনে। তারপর মুক্তিনাথতীর্থ ঘুরে ঐদিকের কোথা দিয়ে তিব্বতে ঢুকে মানস সরোবরের তীরে গিয়ে পৌঁছন—

শুনে তখনি উৎসাহ প্রকাশ করে বলি, ঐ দিক দিয়েই তো জাপানী বৌদ্ধ শ্রমণ কাওয়াগুচি (Ekai Kawaguchi) ১৯০০ সালে কৈলাস মানস সরোবরে যান্। তাঁর Three years in Tibet বইখানিতে সেই তীর্থযাত্রার বর্ণনা আছে।

অনুভবানন্দজি বলেন, তাই নাকি ? তাহলে ঐ পথ ধরে আমাদের সাধুজীও চলে গিয়েছিলেন ঐ কৌপীন পরে, আর সম্বলের মধ্যে ছিল—কিছু ছাতু, আটা, চানা আর একখানা কম্বল। তবে প্রচণ্ড শীতের দরুণ কৈলাস পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। মানস সরোবরে স্নান সেরে দূর থেকে কৈলাস দর্শন করে লিপুলেখ পাশ্ দিয়ে ফিরে এলেন। লিপুলেখের খবর নিলাম। পাশ্ খুলেছে। তবে, এখনও প্রচুর বরফ। ঘোড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ব্রহ্মচারীজি আজ ঔষধের বাক্স খুলে বসেন নি। নিকটে গ্রাম নেই, তাই তাঁর রোগীর ভিড়ও নেই। বিছানায় চুপ করে শুয়ে ছিলেন। লিপু পাশ-এর ওপর ঘোড়া চলবে না শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসেন। উদ্বেগ প্রকাশ করেন, বলেন কী! ঘোড়া যাবে না!

স্বামিজী হাস্যমুখে ভরসা দেন; আমাদের সেখানে পৌঁছুতে এখনও তো দেরি আছে, ততদিনে বরফ আরও অনেক গলে যাবে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল,—শীতকালে জমা বরফ গলতে সুরু করেছে।

ব্রহ্মচারীজির দুর্ভাবনা কমে।

ঐ বিবস্ত্র বেশে সন্ন্যাসীর তিব্বত ঘুরে আসার সংবাদে সুধীর এবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে, করুণা মিশ্রিত স্বরে বলে, দারুণ শীতে ওঁর মুখনাক কি ভীষণ ফেটে কালিবর্ণ হয়েছে!

স্বামিজী বলেন, ঐটেই তো তিব্বতের ছাপ, যেন খামের ওপর ডাকঘরের সীলমোহর, সুধীরবাবু!

তিব্বত থেকে কে ঘুরে এল, আর কে যায় নি,—মুখ দেখলেই ধরা যায়। সেখানকার প্রচণ্ড রোদ আর ঠাণ্ডা বাতাসের এমনি গুণ। এই তো আর কদিন আছে,—তারপর দেখবেন আমাদের এই চেহারাও—

ব্রহ্মচারীজি এইবার নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানান, অত সহজে কাবু হচ্ছি না। আগে থেকেই ও খবর জানা ছিল,—সঙ্গে তাই বিলেতী 'কোল্ড্ ক্রিম্' 'মার্' কোলাইস্ড্ ওয়াক্স', রোজ্ পাউডার' সব নিয়ে চলেছি। সুধীর সোৎসাহে বলে ওঠে, ব্রহ্মচারীজি, এখন থেকেই আরজি দিয়ে রাখছি, আমরাও ভাগ চাই,

আর আমার দাবীটাই সবার চেয়ে বেশী! এক শিশি ভেস্‌লিন্ আমাদের সঙ্গেও এনেছি, কিন্তু সে হোল দিশী, তিব্বতের ঠাণ্ডার সঙ্গে সে কি আর লড়তে পারবে ?

ব্রহ্মচারীজি আশ্বাস দেন, 'ভয় নেই, সব তিন শিশি করে নিয়ে এসেছি।'

হাস্য-পরিহাসে সময় কাটে।

আকাশ খানিক পরিষ্কার হলে ঘর ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়াই। খেলা থেকে নেমে সেই যে কালী নদী ছেড়ে এসেছি, তারপর আর তাকে পাই নি। আজ আবার তাকে দেখা গেল। কিন্তু নিকটে নয়। কয়েক শত ফুট নীচে। যেন, পাতালের মধ্যে। দুপাশের খাড়া পাহাড়ের মাঝে অতি সংকীর্ণ পথ বেয়ে চলেছে অজগর সাপের মতন। শুনছি, কাল ঐ নদীর ধারে নামতে হবে। নদীর অপর পারে নেপালের পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি জলপ্রপাত। যেন কালো শ্লেটের উপর সাদা খড়ির মোটা লাইন টানা। সেদিকে ছোট ছোট দু'চারটে গ্রাম চোখে পড়ে।

বিকালে ও সন্ধ্যায় আবার সামান্য বৃষ্টি হয়ে যায়।

স্বামিজী পোর্টারদের ডেকে পরামর্শ সভা বসান। বৃষ্টি এভাবে চললে কাল নিরপানি পার হওয়া সম্ভব হবে কি? যদি কারো কোন বিপদ ঘটে।

তাঁদের আলোচনা শুনতে শুনতে কি জানি কখন্ ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ১২ ॥

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙতেই কান পেতে শোনবার চেষ্টা করি, ঘরের চালের উপর কি বৃষ্টি পড়ার শব্দ ওঠে? না, বৃষ্টির আওয়াজ তো নেই। টর্চ জেলে ঘড়ি দেখি, চারটে বেজেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনুভবানন্দজির প্রশ্ন শুনি, কটা বেজেছে দেখলেন?—চারটে? উঠে পড়ুন এবার সব। একটু আগেই বাইরে গিয়ে দেখে এসেছি, আকাশ মেঘে ঢাকা। তবে বৃষ্টি নেই। আমাদের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া চাই। বেলা বাড়লে আমাদের পথের বিপরীত দিক থেকে তিব্বতী ব্যাপারীরা তাদের ভেড়াছাগলের পাল নিয়ে নামতে সুরু করবে। এ-পথ এতই সঙ্কীর্ণ যে তাদের দলের সাম্‌নাসামনি পড়লে মুস্কিল হবে। তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ায় বিপদ আছে, আবার, পথ ছেড়ে দাঁড়াবার জায়গাও থাকে না কোথাও কোথাও। এখনি তৈরি হয়ে নিন্,—'জয় কৈলাসপতি' বলে বেরিয়ে তো পড়া

যাক্, কি বলেন সুধীরবাবু ?

৫টা ১০টা মিনিটে সকলে প্রস্তুত হয়ে যাত্রা সুরু করি। আজ এখনি নিরপানির দুশমন পথের সম্মুখীন হতে হবে। বিপৎসঙ্কুল এই পথের কত রোমহর্ষণ কাহিনীর এতদিন লোকমুখে প্রচার শুনেছি। মাত্র দুদিনের পথ। তবুও, এই অনতিবিস্তৃত পথটুকু কৈলাস যাত্রাপথে সর্বাপেক্ষা আতঙ্কময়। সভয় কৌতূহল যাত্রীর মন ধরে রাখে। কিন্তু কেন জানি না, সেই পথের মুখে দাঁড়িয়ে আজ ভীতির ছায়া হৃদয় আচ্ছন্ন করে না। কোথা থেকে যেন আকাশে বাতাসে ভরসার আলোক নেমে আসে। মনকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এই সুদুর্গম পথ অতিক্রম করে যাত্রাশেষে পৌঁছুবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও সুদৃঢ় সঙ্কল্প যেন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে।

কিছুদূর যাবার পর দেখি পাহাড় ধসার ফলে পথ অনেকখানি বিলুপ্ত। পথরেখা নিশ্চিহ্ন করে বহু নীচ অবধি পাহাড়ের অঙ্গভরা ধ্বংসস্তূপ। এ যেন, প্রথম দেখতে পেয়েই দানবের বিকৃত মুখভঙ্গি। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ঝুরঝুরে মাটি, বালি, পাথর। পা ফেললেই নীচে সরতে থাকে। সাবধানে পায়ের চাপে ওরই মধ্যে একটু শক্ত করে সমান করে নিই। এক এক পা বাড়িয়ে এগিয়ে যাই। গড়িয়ে পড়লে একেবারে সেই নীচে কালীনদীর স্রোতে! অতি সন্তর্পণে একে একে সকলে পাহাড়ের ধসা অংশ পার হই। স্বামিজী বার বার সাবধান করান, নজর রাখবেন, ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে মাথায় না পড়ে!

নিরাপদে পার হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার এগিয়ে চলা। কিন্তু স্বস্তির অবসর কই? সুরু হয় অতি ভীষণ উৎরাই পথ! এ যেন প্রায় হাজার ফুট উঁচু এক দুর্গপ্রাকারের আলিসার প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে! পায়ের দিকে চোখ নামালে দেখা যায়, কোথায় সেই বহু নীচে কালী নদীর যেন শীর্ণকায়! পার্বত্য নদীর উদ্দাম গতির প্রচণ্ড রূপ দূর থেকে প্রকাশ পায় না। যেন, দানব-দুহিতা পাতালপুরিতে নিদ্রামগ্না। চার পাশে দৈত্যাকৃতি পাহাড়। বজ্র কঠোর উগ্র তাদের মূর্তি। তরুলতার শ্যামল কান্তি সভয়ে গোপনে কচিৎ কোথাও উঁকি মারে। গ্রানাইট্ পাথরের পাহাড়। তারই গা কেটে কোনমতে তৈরি করা নামমাত্র পথ। দু'তিন হাত চওড়া। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা এঁকে-বেঁকে গড়িয়ে নীচে সেই নদীর কিনারে নেবে যায়—সর্পিল ভঙ্গে। সাপ দেখার মতনই, দেখে এগিয়ে যেতে গা শির্‌শির্ করে। পথের

মাঝে মাঝে কোথাও আবার পাথর কেটে ধাপের আকারে খানিক অংশ,—এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো অসমান। যেন ভাঙা মই বেয়ে নামা।

কিছুদূর নামবার পর অনেকগুলি ঘণ্টার মিলিত ধ্বনি নীচের দিকে এক জায়গায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাতালে কি নাগ-বাসুকির পূজা বসে?

শব্দ এগিয়ে উঠে আসে। ক্রমশঃ পথের বাঁকে দেখা দেয়, পিপীলিকা সারির মত ভেড়া-ছাগলের পাল। পথ বেয়ে দলে দলে উপরে আসে।

স্বামিজী বলেন, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল,—ওদের আবির্ভাব হোলই! এখন একের পর আরেক দল ক্রমাগত আসতে থাকবে। এ-পথের এই আরও এক বিপত্তি। চলুন এগিয়ে গিয়ে জায়গা বুঝে কোথাও দাঁড়ানো যাবে।

হিমালয়ের উচ্চ অঞ্চলে পাহাড়ীদের ব্যবসার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার এই পশুগুলিই একমাত্র যানবাহন। আমাদের দেশের ভেড়া-ছাগলের তুলনায় এরা দেখতে বৃহৎ, সুপুষ্ট সবল দেহ। শিংগুলি প্রকাণ্ড; নানান্ ভঙ্গিতে আঁকা-বাঁকা,—যেন শিল্পীর হাতে গড়া শিরোশোভা। অঙ্গ-ভরা লোম,—যেমন ঘন, তেমনি দীর্ঘ; সারা দেহ ঘিরে যেন রেশমী ঝালর ঝুলে মাটিতে ঠেকে। পিঠের উপর থেকে দুদিকে চামড়া ও পশমের তৈরি শক্ত ব্যাগ ঝোলানো,—তারই ভিতর পণ্যদ্রব্য। প্রত্যেকে দশ-পনেরো সের ওজন মাল অনায়াসে বইতে পারে। গলায় সবারই ঘণ্টা বাঁধা, টুংটাং শব্দ তোলে।

দেখতে দেখতে সেই ভেড়া-ছাগলের পাল পথ অবরোধ করে সম্মুখীন হোল।

স্বামিজী বলেন, খুব সাবধান! পাহাড়ের খদের দিকে যেন কোনোমতেই যাবেন না, পথের অপরদিকে পাহাড়ের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ান্।

হুড়মুড় করে নিরীহ পশুগুলি আমাদের পায়ে ও হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে চলতে থাকে। হাতের লাঠি সামনে ধরে তাদের ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করি।

অমন সুশ্রী লোমশ পশুগুলির দুরবস্থা দেখে মায়া হয়। সঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ও লেলিহান ফেনিল জিহ্বা তাদের অপরিসীম ক্লান্তির করুণ চিত্র ফোটায়। প্রতি দলের সঙ্গে দু-তিনটি তিব্বতী কুকুর,—বাঘ বলে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা। গলায় তাদের পিতলের চওড়া পুরু বকলস। বাঘের সঙ্গে লড়তে হলে গলায় যাতে কামড় না দেয়। বকলসে ঘণ্টা বাঁধা। ভেড়া-ছাগলকে দলবদ্ধ ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এদের কাজ। এধার ওধার ঘুরে ঘুরে তাই করেও দেখি। দলের শেষভাগে পাহাড়ী মেষচালক। ঝলছলে আলখাল্লা পরনে। বুকের কাছে

তারই ভিতর থেকে উঁকি মারে অতি কচি ছাগশিশু। হয়ত কাল পথের উপর তার জন্ম হয়েছে। দেখে মনে পড়ে, কেঙ্গারুর পেটের থলিতে বাচ্চা রাখার ছবি। পাহাড়ীটির অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা ও দেহ থেকে উৎকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ বোটকা গন্ধ বাতাসে ভাসে। সবশেষে আসে দু-তিনটি পাহাড়ী মেয়ে। নানা রঙে রঙ্গীন তাদের পোষাক। কানে, নাকে, বুকে ভারী ভারী গহনা। চড়াই ওঠার পরিশ্রমে মুখের উজ্জ্বল কান্তি আরক্ত হয়ে থাকে। তাদের সঙ্গেও ভীষণাকৃতি এক কুকুর। কুকুরটা আমাদের নিকটে এগিয়ে আসে দেখে ভয় পাই। সেটাকে সরিয়ে নিতে বললে মেয়েগুলি গহনা দুলিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে।

লজ্জায় মরণ-পণ করে কুকুরের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলি। পিছন ফিরে দেখি, অনুভবানন্দজি রুকুমসিংকে হুকুম দেন, কুত্তা হাটাও।

বলি, এ কি! স্বামিজী! আপনারও ভয়? এতবার হিমালয়ের দুর্গম পাহাড় পেরোলেন, আর একটা কুকুর দেখে এখন দাঁড়িয়ে পড়লেন?

স্বামিজী বলেন, না মশাই, ও-জাতকে বিশ্বাস নেই। একবার এমন কামড়েছিল, বহুদিন তার ফলভোগ করতে হয়েছে।

ভাবি, অতি বড় সাহসীরও সাহসের অন্ত থাকে।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল।

এই যৎসামান্য বারিপাতেই পাথর-কাটা পথ পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সকলে চলি। পাহাড়ের গা ঘেঁষে লাঠির উপর ভর রেখে নামতে থাকি। স্বামিজী সতর্ক করেন, আজ সব একসঙ্গে খুব সাবধানে চলুন। এ দুটো দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

এ কি আর পথ হাঁটা? হাত-পা-মাথা ঠিক রেখে, শ্বাস রুদ্ধ করে, এক এক পা বাড়িয়ে লাঠিতে ভর করে নামা। কারো মুখে কোন কথা নেই, পায়ের দিকে ছাড়া অন্যত্র দৃষ্টি নেই। একাগ্র নিবিষ্ট চিত্ত। হিমালয় পথের এও এক শিক্ষা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর অবশেষে কালী নদীর নিকটে পৌঁছুই। পথের শেষদিকে এক ঝরনা পড়ে। জুতা খুলে জলের মধ্যে নেমে পার হতে হয়। কালীর ধারে এসে প্রাণ এতক্ষণে হাঁফ ছাড়ে।

কিন্তু, নদীর এ কি হিংস্র মূর্তি। কল্পনারও অতীত।

দুই কূলে প্রাচীরের মত খাড়া পাহাড়। বিকট তাদের আকার। বীভৎস তাদের রূপ। যেন ভস্মাবৃত দেহ উলঙ্গ ভূতপ্রেতের দল। আকাশপানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। নীচে নদীর কিনারাতেও কালো কালো শিলাস্তূপ। পাথর, না শবদেহের কালিবর্ণ কঙ্কাল ?

সেই দানব-রাজ্যের পাষাণ-কারার অবরোধ ক্ষুরধার স্রোতরাশির খড়্গের আঘাতে নির্মমভাবে ছিন্নভিন্ন করে উন্মত্ত নৃত্যভঙ্গে নেমে আসেন রণোন্মাদিনী তরঙ্গিণী কালী। নদীর অট্টহাস চারিদিকের স্তব্ধ পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে দিগন্ত মুখরিত করে।

শান্ত সুন্দর যোগিরাজ কৈলাসপতির তীর্থপথে দিকে দিকে এ কী সংহার-মূর্তি !

গৃহহারা যাত্রীর আত্মভোলা চিত্র ভয়চকিত হয়ে ওঠে। ভাবে, এ-জগতে দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা সবই বুঝি কোথায় হারিয়ে গেছে।

সুরেন্দ্র মহারাজ অস্ফুটে মন্তব্য করেন, এরাই দেখি শিবের তপস্যাক্ষেত্রে দ্বাররক্ষী ভৈরবের দল !

নদীর তীর-সংলগ্ন খানিকটা চড়া। বালি, কাঁকর, শিলা আকীর্ণ। তবুও, সেইখানে তিন-চারটি তাঁবু খাটানো। জায়গার নাম শুনি, নাজাং। অনুভবানন্দজি আমার আগেই পৌঁছেছিলেন। দেখি, নেপালী পায়জামা ও গলাবন্ধ লম্বা কোট পরা এক পাহাড়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁবুর সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আমাকে ইসারা করে ডাকেন, তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন, নিরপানির নতুন যে পথ তৈরি হচ্ছে, ইনিই তার দেখাশুনা করছেন। ভরসা দিচ্ছেন, খুব সম্ভব ফেরবার সময় নতুন রাস্তা পেয়ে যাব।

কন্ট্রাক্টরটি অতি ভদ্র। সবাইকে ডেকে চা খাওয়ান। দুধের অভাবে আমাদের সব জায়গায় চা খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না জেনে তখনি তাঁর নিজের নতুন বড় একটিন 'মিল্ক্ ফুড্' বার করে আনেন। বলেন, আমরা তো এখানে রয়েছি, স্টক্ও আছে। আবার দরকার হলে আনিয়েও নিতে পারব, কদিন সময় নেবে, এই যা। কিন্তু আপনারা যেখানে চলেছেন—বিশেষতঃ তিব্বতে গিয়ে হাজার চেষ্টা করলেও পাবেন না। রেখে দিন, কোন সঙ্কোচ করবেন না,—কাজে লাগবে।—বলে একরূপ জোর করেই কুকুমসিং-এর হাতে দেন। আমাদের দিকে হাত জোড় করে বলেন, বাবুজিরা আমাদের দেশে অতিথি হয়ে এসেছেন,—তার ওপর তীর্থযাত্রী,—সেবার তো কিছুই করতে পারলাম না।

কথাগুলি শুনে ভাবি, এই কঠিন নিষ্প্রাণ পাষাণ রাজ্য, এখানেও মানুষের হৃদয় তেমনি কোমল মাটি দিয়ে গড়া। মানুষ থাকলে প্রীতি-ভক্তি-ভালবাসাও থাকে।

নাজ্ঞাং-এর নিকটে কালীনদীর উপর কাঠের ছোট পুল। সেইখানে দুই তীরের খাড়া পাহাড় পরস্পরের সন্নিকটে আসে, যেন হাতে হাত মেলাতে চায়। মানুষও সুযোগ বুঝে কাঠ লাগিয়ে পারাপারের পথটুকু সৃষ্টি করে। কিন্তু, ক্ষণস্থায়ী এ-ধরনের পুল। বর্ষার প্রথম প্রকোপেই জলের তোড় নামলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তখন নিরপানির সেই উপরের অতি ভয়ঙ্কর পথই যাত্রীদের যাতায়াতের একমাত্র উপায়। সেই কারণে এখন নতুন রাস্তা নিয়ে যাবার চেষ্টা চলেছে নদী পার না করে, অপর পাড়ের খাড়া পাহাড়ের গা কেটে।

পুল পার হয়ে আমরা নেপালরাজ্যে পড়ি। সুধীর সেদিকের পাথরে পা পড়তেই বলে, অবশেষে নেপালেও আমার আসা হোল।

আধ মাইলটাক যাবার পর সুন্দর এক জলপ্রপাত। নাম শুনি, তাম্‌পাকু। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে জলধারা লাফিয়ে পড়ছে নীচে বিরাট এক কালো পাথরের উপর,—সমুদ্রগর্জনের মত শব্দ তুলে। সেখান থেকে ঠিকরিয়ে ফোয়ারার মতন চারিপাশে আবার ছড়িয়ে পড়ে। জলকণাগুলির উপর সূর্যরশ্মি পড়ে রামধনুর অপূর্ব শোভা ফোটায়। তন্ময় হয়ে সবাই তাকিয়ে দেখি।

ঝরনার জলস্রোত অদূরে কালীনদীতে গিয়ে মেশে। ভাগ্যক্রমে এই ধারা পারাপারের কাঠের ভঙ্গুর পুল পাওয়া গেল। দেখেই বোঝা যায়, কদিন পরে জল বাড়লে এ-পুলের চিহ্নও থাকবে না।

এর পরও প্রায় মাইলখানেক নেপালের মধ্যে দিয়ে পথ। তাকে পথ বলা অত্যুক্তি। কখনো নদী ছেড়ে পাহাড়ের খাড়া গায়ের খানিক উপরে উঠে যাওয়া, পাথর কেটে কোথাও সিঁড়ির মতন করা, পাহাড়ের গা দিয়ে কোন রকমে চলা। তবুও, এ-সব স্থানে পথের কিছুটা চেহারা দেখা যায়। কিন্তু খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেখানে কেটে পা রাখার মতন একটুও জায়গা করা সম্ভব হয় নি, সেখানে নেমে যেতে হয় নীচে নদীর পাশে। অথচ, নদীর কূল বলতে সেখানে কিছুই নেই। খাড়া পাহাড়ের গা উঠেছে জলের ধার থেকে। অতএব, সেখানে পথের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও নেই। চলতে হয় জলের পাশেই বড় বড় শিলাখণ্ড—'বোল্‌ডার্‌স্‌'-এর উপর দিয়ে,—একটা থেকে আরেকটায়

পা রেখে অথবা লাফিয়ে গিয়ে। স্রোতের সমীপবর্তী পাথরগুলি স্রোত-বিক্ষিপ্ত জলকণায় সর্বদা পিচ্ছিল হয়ে থাকে এবং পায়ের কাছে ঘূর্ণায়মান দুরন্ত জলরাশি যেন সহস্র হাতছানি দিয়ে কেবলি ডাকতে থাকে, কলস্বরে হেসে ওঠে।

স্বামিজী সতর্ক করেন, খুব সাবধান। স্রোতের পানে তাকাবেন না, পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অতি ধীরে ধীরে চলুন।

কিন্তু, চোখ তো তাতে নিষেধ মানে না। জোর করে তাকাব না ভাবি। তবু, অবাধ্য দৃষ্টি অজানা কোন্ এক মোহের টানে আবার দুরন্ত নদীর তড়িৎগতির সঙ্গে ছুটে চলতে চায়!

অপরপারে ভারত এলাকায় নির্‌পানির নতুন পথ তৈরি হয়, দেখা যায়। সেদিকেও নদীর ধার থেকে উঠেছে খাড়া পাহাড়। দড়ির সাহায্যে মজুররা তারই গায়ে উঠে, কোথাও বা দড়িতে ঝুলে কাজ করতে ব্যস্ত। ভাবি, কী অসীম তাদের সাহস। এপারে দাঁড়িয়ে তাদের নিঃশঙ্ক কর্মকুশলতা দেখতেও যেন মাথা ঘোরে, আমাদের সম্মুখে পথের দুর্গমতা সহজ মনে হয়!

কদিন আগেকার ঘটনা স্মরণে আসে।

ঐখানেই সেদিন সেই কর্তব্যরত মজুরের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। আপন গৃহ ছেড়ে এই দূর বিদেশে শুধু দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্যই সে এসেছিল। হয়ত কতদিন ধরে তার শূন্যগৃহে তারই প্রিয়জন ব্যাকুল নয়নে তার পথ চেয়ে বসে থাকবে এবং পরিশেষে একদিন কোন্ এক গৃহাগত স্বগ্রামবাসীর মুখের নিদারুণ সংবাদে তার পথ চাওয়ার সব আশা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হবে!

শুনি, ফেরবার সময় ঐ নতুন তৈরি পথ ব্যবহার করতে পারব। তখন নির্‌পানি-পথের এই দুর্গম অংশ সুগম ও নিরাপদ হবে।

কিন্তু সেদিন কি আর স্বচ্ছন্দগামী নিশ্চিন্তমনা পথিকের প্রফুল্লচিত্ত এই নূতন পথ সৃষ্টির ইতিহাসের করুণ কাহিনী স্মরণ করে কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে উঠবে?

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। কিছুদূর যাবার পর কালীনদীর উপর আবার তেমনি ভঙ্গুর কাঠের পুল। নদী পার হয়ে ভারত-এলাকায় ফিরে আসি। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে তৈরি পথ পুনরায় পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। তার উপর অসংখ্য ভেড়া-ছাগলের পরিত্যক্ত পুরীষ জলসংস্পর্শে কর্দমের রূপ ধরে। পথ চলতে প্রতি পদক্ষেপেই আশঙ্কা হয়, এই বুঝি বা পা পিছলে পড়ি। দুর্গন্ধ কাদার উপর পড়তে মনে ঘৃণা

জাগলেও প্রাণ রক্ষা পায়, কিন্তু একবার পদস্খলন হলে কোথায় যে শেষ আশ্রয় মিলবে শুধু তারই নিষ্ঠুর ইঙ্গিত নীচে করালমূর্তি কালীনদী সগর্জনে জানাতে থাকে।

পাহাড় থেকে খানিক উৎরাই নেমে আর এক বিপুল জলকল্লোল ধ্বনি শুনতে পাই। বাঁক ঘুরতেই দেখি, সুমুখে আবার এক অপরূপ জলপ্রপাত। নাজাং ফল্‌স্।

Gneiss পাথরের পাহাড়। আবলুসের মতন ঘন কালো রঙ্। প্রপাতের নিক্ষিপ্ত জলকণায় সিক্ত হয়ে অতি চিক্কণ দেখায়। সেই পাথরের বিরাট খাঁজের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশি রাশি জলের বিপুল ধারা। ৭০।৮০ ফুটেরও বেশী উঁচু এই প্রপাত। কালো পাথরের বুকে এই শুভ্র সমুজ্জ্বল জলের ধারা অন্ধকারের মাঝে জ্যোতি বিকীর্ণ করে। বাতাসে বিক্ষিপ্ত বারিকণায় দিনের আলো লেগে দেখায় যেন লক্ষ লক্ষ হীরকখণ্ড দিকে দিকে ঠিকরে পড়ে।

নির্‌পানির একদিকে যেমন প্রকৃতির কঠোর মূর্তি বিভীষিকা জাগায়, আবার ঠিক তারই মাঝে প্রাকৃতিক অপূর্ব সৌন্দর্য হৃদয় মুগ্ধ করে। এ যেন প্রবাদের সেই সাপের মাথায় মণির দীপ্তি!

নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য উপভোগের অবসর থাকে না। কাতারে কাতারে ভেড়া-ছাগলের পাল আবার পথের অপর দিক থেকে নেমে আসে। মাঝে সেই প্রচণ্ড বেগবতী ঝরণাধারার উপর কাঠের ছোট পুল। ধারে রেলিঙ্ নেই। অথচ, পায়ের তলার কাঠগুলি জলে ভিজে পিচ্ছিল। ভান্‌সিং ও রুকুমসিং তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। ওপারে পুলের মুখে ভেড়া-ছাগলের গতিরোধ করে। রেলিঙ্-বিহীন পুল পার হবার সময় একযোগে তারাও এসে পড়লে আর নিস্তার নেই।

পুলের অপর দিকের পাহাড়ের গায়ে ধাপ-কাটা পথ নীচে থেকে ধনুকের আকারে বেঁকে উপরে উঠে দূরে আবার নেমে যায়। পশুগুলি চলার পথে বাধা পেয়ে সেই অর্ধগোলাকৃতি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে যায়, পরস্পরে ঠেলাঠেলি করে।

হঠাৎ এক পাহাড়ীর আর্তনাদ শুনে সেদিকে তাকাই। দেখি, পথের উপর থেকে একটি ছাগল বোঝা-সমেত পাহাড়ের গা বেয়ে নদীর দিকে গড়িয়ে পড়ে। সবাই উদ্‌গ্রীব হই। রক্ষা করে সাধ্য কার? কিন্তু, অকস্মাৎই রক্ষা পায়।

মাঝপথে একটা ছোট গাছে কোনরকমে আটকে যাওয়ায় নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বেঁচে যায়। অনেক চেষ্টার পর তাকে দড়ির সাহায্যে পাহাড়ীরা আবার যখন উপরে তোলে, বেচারীর সারাদেহ তখনও থর থর করে কাঁপে। মেষ-পালকের দলের একটি ছোট মেয়ে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। সকলের মনের দুর্ভাবনা কাটে।

পুলের এপারে সেই ধনুকাকার পথ পেরিয়ে এসে আবার এক বড় চড়াই।

সুরেন্দ্র মহারাজ মৃদু হেসে বলেন, সুধীরবাবু, লক্ষ্য করেছেন, আজ সারাপথই ব্রহ্মচারীজি আমাদের সকলের আগে আগে চলেছেন?

প্রকৃতই তাই। সকলে একবাক্যে তাঁর চলার তারিফ করি। একটা পাথরের উপর বিশ্রাম নিতে বসেন।

স্বামীজি জিজ্ঞাসা করেন, কি রকম ব্রহ্মচারীজি! ক্লান্ত হন্ নি তো? এই চড়াইটা মেরে দিতে পারলেই আজকের মত নিশ্চিন্দি! ও-বেলা আজ পথ চলার ছুটি। এ-সব জায়গায়, বিকেলে প্রায়ই জোরে বৃষ্টি নামে, পাথর গড়িয়ে পড়ে, পাহাড়ও ধসে। তা ছাড়া কুলিদেরও নির্পানির পথে একদিনে বেশীদূর যাওয়া সম্ভব নয়। কি রকম 'নার্ভের' ওপর 'স্ট্রেন্' হয় দেখছেন তো?

ব্রহ্মচারীজি পাহাড়ের মাথার দিকে তাকিয়ে মুখে ম্লান হাসির রেখা টেনে বলেন, কী! একেবারে ওই ওপরে ওঠা নাকি? আজ এখন পর্যন্ত বিশেষ চড়াই পাই নি, খাসা এসেছি। পথের বিপদ, দুর্গমতা ওসবকে ভয় করি না, দেখলেন তো কেমন চলে এলাম। কিন্তু, চড়াই উঠতে হলেই, কি জানি, বুকের ভেতর কেমন যেন—

বলে ঘাড় নাড়তে থাকেন। তারপর বলেন, আচ্ছা, আপনারা এগোন, আমি ধীরেসুস্থে উঠছি। এখানে তো আর একসঙ্গে চলার দরকার নেই।

অতএব, আমরাও যে যার মত ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। আমার ধারণা, হিমালয়ের পথে দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন থাকে না, তাতে অযথা সময়ও যায়। এখানকার বাতাবরণের এমনি গুণ, অল্পক্ষণের বিশ্রামেই শরীর তাজা হয়ে ওঠে, মনও চলতে চায়। বেশীক্ষণ বা বারে বারে বিশ্রামের লোভে দাঁড়িয়ে গেলে পা যেন আরও ভারী হয়ে যায়। তার চেয়ে আপন সামর্থ্য বুঝে দম সঞ্চয় রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ায় অনেক লাভ।

খাড়া চড়াই হলেও দীর্ঘ পথ নয়, মাইলখানেক মাত্র ওঠা। ধীরে ধীরে চলার ফলে সেই চড়াই পথও শেষ হয়। এ-পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাই।

বোলা পাশ্। আট হাজার ফুট্ উঁচু। নিরূপানির সেই উপরকার ভয়াবহ পথের এইখানে আর একটা মুখ। এইখান থেকে পাহাড়ের মাথা বেয়ে সেই গলাগড়ে গিয়ে পড়েছে। কালীনদী ছেড়ে আমরা আবার উপরে চলে এসেছি। হাজার দেড়েক ফুট্ নীচে সেই দুর্দান্ত বেগময়ী হিংস্র নদী এখন দেখায় অতি শান্ত, নির্জীব, নিশ্চল। দুদিকের কালো খাড়া পাহাড়ের খদের মধ্যে যেন এঁকে-বেঁকে শুয়ে পড়ে আছে ধূসর রঙের এক বিরাট সাপ।

যে পথ দিয়ে আমরা উঠে এলাম, পাহাড়ের গায়ে তারও খানিক অংশ দেখা যায়, সেখানেও যেন আঁকাবাঁকা রেখা টানা। সবাই এসে গেছি, কেবল ব্রহ্মচারীজির দেখা নেই। তাঁর জন্য অপেক্ষা করা হয়। আট ঘণ্টা কাটে। বেলা এগারোটা বাজে। কি হোল তাঁর? এই তো মাইলখানেক পথ। তবে চড়াই আছে।

সুধীর দুরবীন লাগিয়ে দেখে,—ঐ তো তিনি। মাঝপথে একটা পাথরের ওপর বসে।

অনুভবানন্দজিও নিয়ে ভাল করে দেখেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, এ যে দেখা যায়, কাত হয়ে বসে রয়েছেন। ওঠবার নাম-গন্ধ নেই।

তিনি তখনি দুজন বলিষ্ঠ পোর্টারকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন নীচে। অদ্ভুত মানুষ এরা। সারাপথ নিজেদের বোঝা পিঠে বয়ে এনেছে, তবুও উৎসাহের সঙ্গে ত্বরিতগতিতে আবার নেমে যায়,—বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করার এমন সুযোগ তারা কি কখনো ছাড়তে পারে।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, তাদেরই একজনের পিঠে ঝুলে ব্রহ্মচারীজি আসেন। বাহকের কোমরে জুতা-পরা দুই পা সাঁড়াশির মতন এঁটে ধরা। দুই হাত তাঁর কাঁধের দুপাশ দিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ। পিঠের উপর দেখা যায় ব্রহ্মচারীজির সেই বিপুল পাগড়ি, আর শ্মশ্রু-গুম্ফশোভিত নিশ্চিন্ত মুখখানি, শিশুসুলভ সরল হাসিতে উৎফুল্ল। কিন্তু হুঁশিয়ারি প্রৌঢ় ব্যক্তির! সুধীরের হাতে উদ্যত ক্যামেরা দেখেই তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ান। একটা পাথরের উপর বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, উঃ! চড়াই উঠতে হলেই যেন দম আটকে আসে। কোনমতেই আর চলতে পারি না।

তারপর আবার সেই চীন-জাপান-গঙ্গোত্রীর কথা। সে-সময়ে নাকি দেহে অসীম শক্তি ছিল। কিন্তু, বছর খানেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে বেশ কিছু কাল ভুগেছিলেন।

তাঁর রোগের কথা শুনে সকলেরই দুর্ভাবনা হয়। স্বামিজী বলেন, আলমোরাতে খবরটা জানালে এ-পথে এই অবস্থায় আসতে আপনাকে নিষেধ করা হোত।

ব্রহ্মচারীজি অসহায়ের মত বলেন, আমিই কি আর জানতাম, ভেতরে আমার এই অবস্থা হয়েছে? বাইরের শরীর তো তারপর কেমন সেরে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আশ্রমে থাকতে তো আর পাহাড়ে উঠতে হয় না। যাক, নিরপানিটা পার হয়ে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতেই হবে।

ভাবি, কিন্তু লিপুলেখের বরফ, তারপর তিব্বত। হার্টের এই অবস্থায় পথের মাঝে যদি একেবারে—ভাবতে পারি না, ভেবেই বা এখন আর কী হবে! যা হবার, হবেই।

আবার সকলে চলতে স্বরু করি। পাহাড়ের আর একদিক দিয়ে এবার খাড়া উৎরাই। ব্রহ্মচারীজিরও উৎসাহ ফিরে আসে। লাঠি হাতে আগে আগে চলেন। পথ যদিও তেমন সুবিধাজনক নয়, হুড়হুড় করে নেমে যাওয়া। প্রায় মাইল দেড়েক এইভাবেই নামা। কালী নদীও ক্রমে নিকটে আসতে থাকে। উপর থেকে দেখা সেই সুপ্ত সর্প যেন সহস্র ফণা মেলে জেগে ওঠে। পথের পাশে দুই পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে আর এক পার্বত্য নদীও সবেগে নামে। তারও কলনাদ দিগন্ত মাতিয়ে রাখে। কিছু নীচে কালীনদীর সঙ্গে তার সঙ্গম। তারই নিকটে খানিকটা সমতল ভূমি। সেইখানে ভোটিয়াদের কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। তাঁবুর বাইরে প্রাচীরের মতন উঁচু করে স্তরে স্তরে ব্যবসায় মালপত্রভরা ছোট ছোট বস্তাগুলি সাজানো। চারপাশে অসংখ্য ভেড়া ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। চতুর্দিক তাদের বিষ্ঠায় যেমনি আবর্জনাপূর্ণ, তেমনি উগ্র দুর্গন্ধময়,—এখানেও নাকে আসে। অথচ, তারই একপাশে দুটি ভোটিয়া মেয়ে নির্বিকারচিত্তে উনানের উপর কালিবর্ণ প্রকাণ্ড ডেক্‌চিতে কি পাক করতে ব্যস্ত। সেইখানে বসে তাদের ব্যাঘ্রাকৃতি ভোটিয়া কুকুরগুলি আমাদের দেখতে পায়, উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার স্বরু করে, উপরে ছুটে আসে না, তাই রক্ষা!

আমাদের পথ সেদিক পানে যায় না, অল্পখানিক উপরে ওঠে। সেখানেও কিছুটা সমতল জায়গা। দুখানা মাত্র চালাঘর। এরই নাম মাল্‌পা। ৭,২০০ ফুট উঁচু। ডাকহরকরাদের কোনমতে থাকবার একটা আস্তানা। সেই চালাঘরের পাশে একটু সমান জায়গা দেখে—জমির উপর থেকে পাথরগুলি

যথাসম্ভব সরিয়ে, আমাদের তাঁবু ফেলা হয়। চতুর্দিকে সিদ্ধিগাছের জঙ্গল। সেই গাছেরই ডালপাতা এনে রুকুমসিং তাঁবুর ভিতর মাটিতে বিছিয়ে দেয়। নীচে থেকে ঠাণ্ডাও কম বোধ হবে, ময়লার হাত থেকেও খানিক রক্ষা পাওয়া যাবে।

সুধীর তাকিয়ে দেখে। হাসে। বলে, স্বামিজী! ব্যবস্থাটা একদিক থেকে উপযুক্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু রাত্রে ওর ওপর শুয়ে নেশা লাগবে না তো?

তার নিজের এক অভিজ্ঞতার গল্প শোনায়। দেশের বাড়িতে দুর্গাপূজা। আত্মীয়-স্বজনে জমজমাট বাড়ি। সারাক্ষণই হইচই। বিজয়া দশমী। প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে সবাই নদীর ঘাট থেকে ফিরেছে। বিজয়ার প্রণাম ও আলিঙ্গনে সন্ধ্যা কেটে যায়। রাত্রে খেতে বসতে দেরি হয়। সারি সারি টানা পাত পড়েছে। যে যার আসনে বসে। সুধীরের দেখা নেই। তার বাবা বলেন, ডেকে আনো তাকে, ফরাশের ওপর হয়ত ঘুমিয়ে আছে।

একজন উঠে গিয়ে ডেকে ফিরে আসে, বলে, কোনমতেই এল না।

তার বাবা নিজেই উঠে যান্। অল্প পরে একাই ফিরে আসেন, গম্ভীর হয়ে খেতে বসেন। সুধীরের ন'কাকা জিজ্ঞাসা করেন, কি হোল সেজদা? কই? এল না সে?

সুধীরের বাবা বলেন, তোমার যেমন কাণ্ড! বললে শুনবে না, ছেলেগুলোকে পর্যন্ত সিদ্ধির সরবত খাইয়েছ;—গুম্ হয়ে শুয়ে আছে। ধমক দিয়ে খেতে আসতে বললাম, সে খিল্‌খিল্ করে হেসে,—বল্‌ব আর কী?—আমাকেই বললে, মাইরি বাবা! খাবো না আমি!

দালান ভরা লোকেরও হাসি ফেটে পড়ে।

সুধীর গল্প-শেষে মন্তব্য করে, আমার অবশ্য নিজের কোন কিছুই মনে নেই,—পরের দিন সকালে উঠে শুনি,—এই কীর্তি করেছি!—দেখবেন স্বামিজী, এখানেও আবার সে রকম কিছু না করে ফেলি!

আমি ভাবি আরও এক কথা। চলেছি কৈলাসের পথে,—শিব ঠাকুরের দেশে। পথের উপর এত সিদ্ধিগাছের জঙ্গল, সেই কারণেই কি দেবতারও ভাঙ্-এর নেশার অপবাদের প্রচার?

এখানে দুজন পিয়নের বাস। একজন উপরে বুধি ও গার্বিয়াঙে এবং অপরজন নীচের দিকে ডাক নিয়ে যায়। কাল যারা সেদিক থেকে ডাক নিয়ে

পৌঁছুবে, এইখানে থেকে যাবে, এরা কাজে বার হবে। হিমালয়ের সুদূর প্রান্তে দুর্গম নিরপানির পথেও ডাক-চলাচলের এখন সুশৃঙ্খল বিধি ব্যবস্থা বিস্ময়কর।

পিয়ন দুজন আলমোরা জেলার লোক। স্বামিজীকে চিনতে পারে। প্রণাম করে তাঁবুর ধারে বসে। কিভাবে সাহায্য করতে পারে তারই জন্য ব্যগ্র। বড় বড় গাছের জঙ্গল কিছু দূরে। সেইখান থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনে। আজ দেরি হয়ে গেছে, এখন আর দুধের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আগে জানলে ভেড়ীওয়ালাদের কাছ থেকে যোগাড় করে রাখত। বার বার জানাতে থাকে, ফেরবার সময় যেন দুদিন আগে একটু সংবাদ পাঠানো হয়, তাদের দ্বারা যা কিছু সম্ভব সবই ঠিক করে রাখবে।

তাদের কথা শুনে ভাবি, বিদেশে শহরের হোটেলে শারীরিক আরাম বিলাস,—'ফেলো কড়ি, মাখ তেল'। আর এখানে,—এই গহন বন-জঙ্গলে—দুর্গম পাহাড়-পর্বতে? অরণ্যবাসী নিঃস্ব মানুষের আন্তরিক সেবার অবাচিত অমূল্য উপহার।

খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর নিকটবর্তী সেই গিরিনদীর অতি-শীতল জলে স্নান করি। পথ চলার সব অবসাদ মুহূর্তে বিলীন হয়।

সুধীর বলে, হিমালয়ের ঝরনার জলেরও কতো গুণ।

রুকুমসিং কদিন ধরে সঙ্গীদের রোজই আশ্বাস দিয়েছে, মাল্‌পায় শিকার মিলবে, হরিণের মাংস খাওয়াবে।

দুপুরে পিয়ন দেখাল, পাহাড়ের অনেকখানি উপরে হরিণ চরছে। আমাদের অনভ্যস্ত চোখে ধরা পড়ল না। দূরবীনের সাহায্য নেওয়া হয়। ঠিকই তো! কয়েকটাই ঘুরছে। একটার কী বিরাট শিঙ্‌। রুকুমের স্ফূর্তির সীমা থাকে না। বন্দুক-কাঁধে তখনি রওনা হয়।

বিকালে নদীসৈকতে পাথরের উপর বসে চারিপাশের সৌন্দর্য উপভোগ মনে অপরিসীম আনন্দ দেয়। পাহাড়ের গায়ে ভেড়া-ছাগলগুলি কেমন অবলীলাক্রমে উঠে যায় এবং কি করেই বা সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারাগাছের পাতা খায়, অবাক হয়ে দেখি।

সূর্যাস্ত হবার বহু আগেই সমীপবর্তী গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণীর অন্তরালে সূর্যদেবতা অদৃশ্য হন। শুধু, পাহাড়ের শিখরদেশে তাঁর শেষ রশ্মির রঙীন আভা বিদায় আশীর্বাদ জানাতে থাকে।

কিছু নীচে কালী নদীর প্রসিদ্ধ গভীর খদ;—দুকূলের পাহাড় ভেদ করে

খরস্রোতা নদী বহে চলে।

সেখানে এখন আবছা আঁধারে অজানা রহস্য ঘনিয়ে ওঠে,—কাল নিরূপানির ঐদিকেই আমাদের যাবার পথ।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে। শীতও বাড়ে। তাঁবুতে আশ্রয় নিই।

রুকুমসিং বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। বনের হরিণ বনেই থাকে। শুনে মন খুশীই হয়।

রাত্রে শুয়ে হিসাব করা হয়, আলমোরা থেকে কত মাইল আসা হোল। কদিনই বা লাগল?

স্বামিজী বলেন, প্রায় ১৩২ মাইল। বারো দিনে। ভালই যাওয়া হচ্ছে। কালও খানিকটা নিরূপানির খারাপ পথ। তা হোক, ঠিক পার হওয়া যাবে, কি বলেন, সুধীরবাবু? তার পরই বুধি গ্রাম ছাড়িয়ে গার্বিয়াঙ,—সন্ধ্যের মধ্যেই সেখানে পৌঁছনো।

ব্রহ্মচারীজি লেপের মধ্যে পাশ ফিরে আলোচনায় যোগ দেন, বুধির পরই তো গার্বিয়াঙের সেই বড় চড়াই? তার আগে একটা ঘোড়ার—

সুরেন্দ্র মহারাজ শান্ত কণ্ঠে বলেন, কালকের ভাবনা কাল ভাবা যাবে, আপাততঃ আজকের রাতটা নিশ্চিন্ত মনে সবাই ঘুমানো যাক। তাঁবু খাটাবার সময় আজ রুকুমসিং পোর্টারদের দিয়ে চারদিকে নালা কাটিয়ে রেখেছে, নজর করেছি। কৈলাসপতিকে স্মরণ করে এবার সবাই চোখ বুজুন।

॥ ১৩ ॥

ভোরবেলায় শীতের দেশে তাঁবুর মধ্যেও বিছানা ছাড়তে মায়া জাগে। কিন্তু, আলস্য করবারও অবকাশ কই? অনুভবানন্দজি, ব্রহ্মচারীজি, সুরেন্দ্র মহারাজা সকলেই উঠেছেন। স্বামিজীর কণ্ঠ কম্বলের নীচে থেকে কানে আসে, উমাপ্রসাদবাবু উঠে পড়ুন। জিনিসপত্র গোছানো যাক। কাল রাত্তিরে বেশ বিষ্টি হয়েছে, টের পান নি? এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আবার জল না নামে।

সুরেন্দ্র মহারাজ স্থির কণ্ঠে বলেন, নামলে উপায়ই বা কী? যেতে তো হবেই।

স্বামিজী জানান, বিষ্টি মাথায় নিয়ে এ-পথে বেরোনো চলে না,—এখনও নিরূপানির পথ। তা ছাড়া, পথের ওপর সেই মারাত্মক ঝরনাটা রয়েছে,—

আর এদিকটায় একটু বেশিরকম ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে যখন-তখন, —এই তো একটু পরেই দেখতে পাবেন। বেশি জল হলে সে রাস্তা কি আর পার হবার উপায় আছে? গতকালের পথে আর পেয়েছেন কি?

সুধীরের গা টিপে সজাগ করে দিই। দেখি, সে-ও কান পেতে শুনছে।

মনে মনে ভাবি, দেখা যাক, আজ আবার পথের আরও কি ভয়ঙ্কর রূপ।

ব্রহ্মচারীজি সকরুণ প্রশ্ন করেন, এর মধ্যে খাড়া চড়াইও আছে নাকি?

স্বামিজী হেসে আশ্বাস দেন, এদিকটায় তেমন নেই, বলেছি ত, বড় চড়াই সেই বুধির পর।

ব্রহ্মচারীজি বলেন, তার আগে ঘোড়া নিশ্চয় মিলবে, কি বলেন?

বাধ্য হয়ে বিছানা ছাড়তে হয়। শুধু কি তাই? সেই নদীর ধারে গিয়ে তুষার-শীতল জলে মুখ হাত ধোওয়া, প্রাতঃকৃত্য সারা, ফিরে এসে আবার বিছানা বাঁধা, হাঁটবার জন্য জামা জুতা পোষাক পরা।

সুধীর বলে, এ কাজগুলো এখন 'নামতা মুখস্ত'র মত সহজ হয়ে গেছে, চোখ বুজে করা যায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সবাই প্রস্তুত। প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে গার্বিয়াঙ্-এ আজ যাওয়া। মাঝপথে পোর্টারদের পাওয়া সম্ভব নয়। তারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার আগে যেন গার্বিয়াঙ পৌঁছয়, তাই তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পথের মধ্যে রান্নার আয়োজন করতে গেলে সময়ের টানাটানি পড়বে, পোর্টারদেরও অসুবিধায় ফেলা হবে। এই কারণে এখানে সকালেই আহার সেরে যাত্রা করা প্রয়োজন। একটু পরেই দেখি ভাণ্ডারী সুরেন্দ্র মহারাজের সুব্যবস্থায় ভানুসিং খিচুড়ির ধূমায়মান ডেকচি নিয়ে উপস্থিত। বাদলের দিনে হিমালয়ের কোলে বসে অমৃতোপম মনে হয়, দুঃখ শুধু, উদর পূরণ করে এখনি শরীরের বোঝা টেনে আবার ঐ পাহাড়-পথ অতিক্রম।

স্বামিজী চিন্তিত হয়েছেন, ব্রহ্মচারীজি আজকের খারাপ পথটুকু ঠিকভাবে পার হতে পারবেন কিনা। মাঝে কিছু চড়াই ত থাকবেই। পোর্টারদের আজ সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। তারা আপন আপন মালের ও নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই বিব্রত থাকবে। কুকুমসিংকেও পাওয়া যাবে না। তাকে সকালেই গার্বিয়াঙ্-এ রওনা করানো হয়েছে, আমরা পৌঁছুবার আগে সেখানে

যেন ডাকবাংলো পরিষ্কার করে রাখে ; বাংলো খালি না থাকলে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করবে।

অগত্যা যে-পিয়ন আজ এখান থেকে গার্বিয়াঙ-এ ডাক নিয়ে চলেছে, স্বামিজী তাকে বলে দেন, নিরপানির পথটুকু সে যেন ব্রহ্মচারীজির সাথে সাথে চলে, প্রয়োজন মত সাহায্যও করে। লোকটি ভাল। হাসতে হাসতে বলে, দরকার হলে পিঠে করেই পার করিয়ে দেব, কোন ভাবনা নেই, স্বামিজী!

৯টা ১০ মিনিটে যাত্রা স্বরু। পোর্টাররা আগেই রওনা হয়ে গেছে। স্বামিজী তাদের বলে দিয়েছেন, আমরা পৌঁছুবার আগে তারা যেন সেই ঝরনার মারাত্মক পথটা পার হয়ে যায়। তাদের সেইখানে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে তিনি কোনমতেই চান না, দেখি। কারণ জানতে চাইলে বলেন, 'মারাত্মক' বলছি কি সাধে ? গিয়ে দেখবেন, তারপর পার হয়ে শোনাব এক ঘটনা।

ভাবি, স্বামিজীরও সেখানে এত ভয়-ভাবনা ? না জানি কেমন সেই স্থান।

কয়েক পা চলার পরেই মনে হয়, দেহে যেন কোন গ্লানি, কোন অবসাদই নেই। এতদিন ধরে যে নিত্য এমনিভাবে হেঁটে চলেছি, তার পুঞ্জীভূত ক্লান্তিও শরীরে খুঁজে কোথাও পাই না। কোন অজানা উৎস থেকে চলার এই অফুরন্ত প্রেরণা আসে, কী জানি। মনে মনে হাসি পায়। এই তো কিছুক্ষণ আগে হাঁটা তো দূরের কথা, বিছানাটুকু ছেড়ে উঠতেও কী-ই না আলস্য বোধ হচ্ছিল। অথচ, এমন রোজই হয়। প্রত্যহই লক্ষ্য করি, পাহাড়-পথে চলার মুখে সব অলসতা চকিতে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। হিমালয়ের এও এক অশেষ করুণা।

মামুলি খানিক চড়াই উৎরাই করে ঘণ্টাখানেক পরে নিরপানির সেই কুখ্যাত স্থানে পৌঁছুই। ডান দিকে নীচে কালী নদী। বাঁ দিকে পাহাড়ের খাড়া গা। সুমুখে পাথর কেটে অতি সরু পথ। শুধু তাই নয়। পাহাড়ের মাথা থেকে— মনে হয়, তিনশ' ফুট উঁচু থেকে—ঝরঝর করে জলের ধারা সেই পথের উপর পড়ছে,—অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মতন।

এটি মূল জলপ্রপাতের অংশমাত্র। প্রধান ধারাপথের পাশে সবেগে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে নীচে কালী নদীর গর্ভে। অবিরাম জলপাতের কারণে পাথর-

কাটা অতি-অপরিসর পথের এই অংশ সাঙ্ঘাতিক পিছল হয়ে আছে। প্রায় পনেরো-ষোল হাত দীর্ঘ পথের এমন বিপজ্জনক অংশ। বিভীষিকার এখানেও শেষ নয়। এরই মাঝে খানিকটা পথ পাথর কেটে তৈরি করা সম্ভব না হওয়ায় পাহাড়ের খাড়া গায়ে কাঠ গুঁজে তারই উপর কয়েকটা পাথর বসিয়ে কোনমতে পথের সংযোগ রাখা হয়েছে। পথের সেই অংশের তলদেশে কিছুই নেই,—পাহাড়ের গায়ে যেন অস্থায়ী সাঁকো ঝুলছে এবং সে জায়গাটা পার হতে পায়ের তলায় কাঠ ও পাথরের ফাঁকে ও পাশ থেকে নীচে কালী নদীর উদ্দাম স্রোতের বেগ চোখে পড়ে। মাথার উপর ঝরনার ধারাপতন,—সে তো আছেই।

যে ক'জন মালবাহক ইতিমধ্যে পৌঁছেছে, সকলেই এখানে অপেক্ষা করছে। গত রাত্রের বৃষ্টি দরুণ সকলে মাল নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতেই পারে নি। স্বামিজী তাদের একে একে পার হয়ে যেতে বলেন। আমরাও এক এক করে অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের একেবারে গা ধরে পথ পার হই। মাথার উপর সেই জলের ধারা পড়তে থাকে, নীচে কালী নদীর হিংস্র স্রোত যেন লোলুপ দৃষ্টি মেলে দেখে।

ব্রহ্মচারীজিও নিরাপদে একাই পার হন্। এপারে পৌঁছে বলেন, দেখলেন তো, ভয়ের পথকে আমি ভয় করি না, ভয় হয় শুধু ঐ চড়াইকে।

স্বামিজী বলেন, কিন্তু এই পথটাই সব চেয়ে বিপদের। এই সেই জায়গা—মারাত্মক বলি কেন, শুনুন। আজ পাঁচ বছর আগে এইখানে একজন কুলি পিঠে বোঝা-সমেত পা পিছলে পড়ে যায়। চোখের পলকে কালী নদীর ঐ স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ল। আর কি রক্ষা পাবার জো আছে। ঐ যে জলের মধ্যে প্রকাণ্ড পাথরটা উঁচু হয়ে আছে—জলগুলা ফোয়ারার মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে—ঐখানটায় একবার চকিতের জন্য মনে হোল যেন কি একটা দেখা গেল—তারপরই নিমেষে সব কোথায় অদৃশ্য। নিষ্ফল জেনেও খোঁজা-খুঁজির যথাসম্ভব চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কোন চিহ্নমাত্রও কোথাও পাওয়া যায় নি।

পুরাতন কাহিনী। হিমালয়ের দুর্গম পথে কোন্ এক অপরিচিত কুলির আকস্মিক মৃত্যু। হয়ত এমন আরও ঘটেছে। বই-এতেও এই দুর্ঘটনার কথা পূর্বে পড়েছি। তবু ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে আজ সেই অতীত কাহিনী শুনতেও মন ভারী হয়ে ওঠে। মনে হয়, যেন এইমাত্র সেই ঘটনা আমারই

চোখের সামনে ঘটে গেল, এখনি অসহায় দুটি হাত ব্যাকুলভাবে জলের উপর দেখা দেবে।

কিন্তু, স্বামিজীর এত ভয় ও সাবধানতার হয়ত আরও এক কারণ থাকে। স্বচক্ষে জীবন-নাশ দেখা মানুষের মনে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী মর্মবেদনা জাগায়। স্বামিজীও তার ব্যতিক্রম নয়। 'মেট্' অর্থাৎ পোর্টার-সর্দারকে ডেকে বলে দেন, সব পোর্টাররা পার না হওয়া পর্যন্ত সে যেন ওখানে থাকে এবং প্রত্যেককে অতি সাবধানে পার হবার জন্যে বারবার সতর্ক করে দেয়। মালপত্র ভিজে যাক্, নষ্ট হোক,—কোনও ক্ষতি নেই, পোর্টারদের কারও কোন বিপদ ঘটবার কোনও রকম অবকাশ যেন না হয়।

এই পথের মাঝে অপেক্ষা করারও সমূহ বিপদ। প্রায়ই পাহাড়ের মাথা থেকে পথের উপর পাথর গড়িয়ে ও পাহাড় ধসে পড়ে। তাই যতশীঘ্র সম্ভব এ-পথ অতিক্রম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এগিয়ে গিয়েও নিস্তার থাকে না। বৃষ্টির জলে স্থানে স্থানে পথ কাদায় ভরা, সেখানেও অতি সাবধানে পা ফেলতে হয়।

সুধীর বিরক্তি প্রকাশ করে, এ যে দেখি আমাদের বাঙলাদেশের বর্ষার পাঁককেও হার মানায়।

নির্পানির শেষপ্রান্তে এসে গেছি। এখন আর ভয়-দেখানো মূর্তি নয়, তবুও বিদায়ের আগে কিছু চড়াই-এর উপহার দিয়ে যায়। অবশ্য তেমন কঠিন নয়। মাইল তিনেক ধীরে ধীরে ওঠে। চড়াই শেষে সুন্দরী ঝরনা সহাস্যে যেন স্বাগত জানায়। তারই পাশে বসে বিশ্রাম নেওয়া হয়। ক্লান্ত ব্রহ্মচারীজিও এসে যান। বলেন, এরকম ভদ্র চড়াই হলে তবুও পারা যায়।

অনুভবানন্দজি বলেন, আর কি? বুধিতে প্রায় পৌঁছে গেলেন। ঐ সুরু হয়ে গেল চাষের জমি। নির্পানি থেকে বিয়াস্ পট্টি আরম্ভ হলেও এতক্ষণ গ্রাম পাওয়া যায় নি, এইবার বুধিতে দেখবেন এখানকার বিয়াসী ভোটিয়াদের বড় গ্রাম। আর মাইল দুই মাত্র এখান থেকে।

সকলে উৎসাহের সঙ্গে আবার হাঁটতে থাকি। পথ প্রায় মাইলখানেক নেমে আসে। মাঝে মাঝে সমতলভূমি। চাষের বিস্তীর্ণ জমি।

স্বামিজী বলেন, চাষ আবাদ এখানে খুব ভালই হয়। জলের অভাব নেই। কতো ঝরনা, ছোট ছোট নদী। কিন্তু হলে কি হয়? শীতকালে সব জমে

বরফ হয়ে যায়। চারপাশ বরফে ঢাকা পড়ে। গ্রামের লোকেরাও নেমে যায় সেই ধারচুলা ও নীচের অন্যান্য গ্রামে,—আসবার সময় দেখতে পেলেন তাদের সেখানকার সব আস্তানা।

উৎরাই শেষ হলে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নেমে-আসা ছোট নদী পার হই কাঠের পুলের উপর দিয়ে। তার কিছু পরেই গ্রামের বাড়িঘর সুরু হয়।

ক্ষেত থেকে গ্রামের দিকে একটি লোক চলেছে। মুখে বসন্তর দাগ। মনে পড়ে গেল, আলমোরার সেই ডাক্তারের সতর্ক বাণী। ভাগ্যক্রমে এই অসহায় গ্রামবাসীদের মধ্যে রোগের বিস্তার হয় নি।

একটা কুকুরের ভীষণ চিৎকারে চমকে উঠি। তাকিয়ে দেখি আবার সেই তিব্বতী প্রকাণ্ড 'মাসটিফ'। যাক, ছাড়া নয়, চেনে বাঁধা। নিকটে কয়েকটি তিব্বতী ব্যবসায়ীদের তাঁবু। লোকগুলির পরনে গাঢ় লাল রঙের আলখাল্লা, মাথায় নোঙরা বড় বড় ঝাঁকড়া চুল। কানে সবুজ পাথর-ঝোলানো প্রকাণ্ড মাকড়ি। গলায় লাল রঙের পলার মালা। পায়ে বুটের মত জুতা—রঙিন উলের তৈরি। আমাদের দেখে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ায়। বড় বড় সাদা চকচকে দাঁত বার করে হাসে। স্বামিজী এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছে খবর নেন, লিপুলেখের অবস্থা কী রকম?

জানা যায়, এরা যখন এসেছে, তখনও প্রচুর বরফ। ঘোড়া পার করা সম্ভব নয়। এদেরও বহু কষ্ট করে পার হতে হয়েছে।

স্বামিজী আমাদের দিকে চেয়ে বলেন, আজ গার্বিয়াঙে পৌঁছানো যাক, সেখানে আরও তাজা ও পাকা খবর পাব। সুধীরবাবু, ভাববেন না, চলে যাওয়া যাবে ঠিক। আপাততঃ আমি এগিয়ে চললাম গ্রামের মধ্যে, আপনারা বুধির স্কুল-বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন যেন।

তাই করা হয়। শাখা-প্রশাখা মেলে কয়েকটি বড় বড় গাছ। তারই তলা দিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে গ্রামের পথ ধরি। স্কুল-বাড়ির সন্ধান নিয়ে এগিয়ে যাই। অল্প পরে স্বামিজীও এসে যান। হাসিমুখে বলেন, যাক্, ব্রহ্মচারীজি, আপনার ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। একা আপনারই নয়, আরও দুটো যখন পাওয়াই গেল, সুধীরবাবু ও উমাপ্রসাদবাবুও ঘোড়ায় চেপে আসুন,—এখনও লিপুলেখ, তিব্বত সবই বাকি, পরিশ্রম যতখানি কমে, ভালই। ঘোড়া তিনটে জিন্ লাগিয়ে এখনি নিয়ে আসছে, এলেই আপনারা রওনা হবেন

চলুন, স্বরেন মহারাজ, আমরা দুজনে ততক্ষণে এগিয়ে চলি। এঁরা সব গার্বিয়াঙে পেঁৗছুবেন, অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে তো?—বলে হাসতে হাসতে দুজনে তখনি রওনা হয়ে যান। স্বামিজীর কথা ছেড়ে দিই। ধীর, স্থির, শান্ত, ক্ষুদ্রতনু স্বরেন্দ্র মহারাজেরও পথ চলার সামর্থ্য ও উৎসাহ অসীম দেখি। তখনি দু'হাজার ফুট চড়াই উঠতে নিঃশব্দে স্বামিজীর সঙ্গ নেন।

আমরা ঘোড়ার অপেক্ষায় বসে থাকি। সময় যায়, কিন্তু ঘোড়া আসে না। বিলম্ব দেখে স্থধীর বলে, চলুন, ব্রহ্মচারীজি, আমরাও হেঁটে রওনা হই। এই মাইল পাঁচেক মাত্র দূর। খামকা ঘোড়ার আশায় বসে থেকে গার্বিয়াঙ পেঁৗছুতে শেষে অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু ব্রহ্মচারীজিকে সাধাসাধি করেও রাজী করানো যায় না। তিনি বলেন, খেপেছেন আপনারা? রুকুমসিং, পোর্টাররা, এমন কি স্বামিজীরা—সবাই চলে গেছেন, এখন ঐ দুহাজার ফুটের চড়াই হেঁটে উঠব আমি একা? ঘোড়া ছাড়া পাদমেকং ন গচ্ছামি। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? স্বামিজী যখন নিজে ব্যবস্থা করে বলে গেছেন, ঘোড়া আসবেই।

কিন্তু ঘোড়া না এসে হঠাৎ বৃষ্টি আসে। কালী নদীর অপর পারে নেপালে তুষারশিখরগুলির অপরূপ দৃশ্য ঢাকা পড়ে। তাড়াতাড়ি স্কুল-ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিই।

পাথর দিয়ে গাঁথা একটা বড় ঘর। উপরে শ্লেট পাথরের ছাদ। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল পাঠরত। সবার পরনে পায়জামা। গায়ে ঝোলা পিরান। ছেলেদের কারও বা কোট। মাথায় কালো গোল টুপি। মেয়েদের জামার বর্ণবিন্যাস আছে, কিন্তু এমনি ধূলিমলিন, প্রকৃত রঙ বোঝা দুষ্কর। শিক্ষকটি তরুণ। আমাদের দেখে নিকটে আসেন, আলাপ করেন। হিন্দীতে কথা বলেন। মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পান। অভিযোগ জানান, আগে এতেই চলত, এখন আর এত কম মাইনেতে চলে না। তার কারণও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুকাল আগে একবার শহরে—অর্থাৎ পিথোরাগড়ে যেতে হয়েছিল। এর প্রমাণ অবশ্য তাঁর বেশভূষায় কিছু পাওয়া যায়। মনের কথা নিজেই প্রকাশ করেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছেন, উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন, এই গ্রাম্য পরিবেশও আর ভাল লাগে না।

ছেলেমেয়েগুলি এসব কথা না বুঝলেও অবাক হয়ে শোনে, আমাদেরও দেখে, পরস্পরে কথা বলে, শিক্ষকের কাছে তিরস্কারও খায়।

বাইরে বৃষ্টি থামে। ঘোড়ার তাগাদায় একজন লোককে পাঠানো হয়। ফিরে এসে সে জানায়, জঙ্গল থেকে ঘোড়া এনেছে। সাজ চাপিয়ে আনতে একটু বিলম্ব হচ্ছে।

সুধীর বিরক্তি প্রকাশ করে, পাহাড়ে দেখি এদের সবারই গয়ং গচ্ছ স্বভাব।

অবশেষে, আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে অশ্বত্রয়ের আবির্ভাব ঘটে। লাগামের বালাই নেই, পা রাখবার রেকাবও নেই। ঘোড়াগুলির পিঠের উপর একটা করে কম্বল বেঁধে আনা। তাই হোল এদের সাজ-সজ্জা এবং এরই সরঞ্জামে একঘণ্টাকাল বিলম্ব। বহু অনুনয়ের ফলে ঘোড়ার গলায় বেঁধে একটা দড়ি হাতে ধরতে দিল। ঘোড়ার সহিসের মতে ওটা বাহুল্য, আমার কাছে ঐটুকুই ভরসা। তবুও, এর আগে কদিন ঘোড়ায় চড়ার যে সামান্য অভিজ্ঞতা —অর্থাৎ সঞ্চিত সাহসটুকু—লাভ হয়েছে, তাই আজ কাজ দেয়।

সুধীর বলে, এতক্ষণে Three Musketeers যাত্রা সুরু করলেন!

প্রতিবাদ করে বলি, ব্রহ্মচারীজিকে দলে টেনো না, বরং বলো, Don Quixote ও Sancho Panza চললেন।

বুধি ছাড়িয়েই চড়াই আরম্ভ। সাড়ে আট হাজার ফুট থেকে সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচুতে ওঠা। আড়াই মাইলে দু হাজার ফুটের চড়াই। হেঁটে উঠতে হচ্ছে না, তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লান্তি ভোগ নেই বটে; কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসে হেলে দুলে কেবলি ঝাঁকানি খাওয়ার দুর্ভোগ কম নয়। সুধীর বলে, ভাই, এর চেয়ে হেঁটে ওঠার আনন্দ অনেক।

পথের এক ধারে পাহাড়ের গা, অপর ধারে খদ। ঘুরে ঘুরে পথ উঠেই চলে। চড়াইও শেষ হয়। এ-পাহাড়ের মাথায় ১০,৫০০ ফুট উঁচুতে আবার সেই নিশান-আদি-সঙ্কেত শোভিত পাশ্ পেরিয়ে আসি। হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যায়। আবরণ-মুক্ত দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের মাঝে। সুবিস্তীর্ণ স্নিগ্ধ শ্যামল মালভূমি। তারই বুকে মাঝে মাঝে যেন সাজিয়ে রাখা ছোট বড় নানা আকারের ঘন কালো শিলাখণ্ড—বোল্ডারস্। যেন বিশ্বশিল্পীর নিজহাতে গড়া কালো পাথরের কতো বিভিন্ন মূর্তি। আর, সেই শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর উজ্জ্বল হয়ে থাকে রাশি রাশি ফুলের নানা রঙের অপূর্ব শোভায়। Iris, Primula, Gentian, —নাম-না-জানা কতো রকমের Alpine ফুল। সবুজ ঘাসের মধ্যে চতুর্দিকে

যেন রঙ্-বেরঙের লক্ষ লক্ষ প্রজাপতির মেলা বসে। বাতাসে ফুলগুলি দোলে, পতঙ্গ দল যেন রঙীন্ পাখা নাড়ে।

আধ মাইলের উপর প্রকৃতির এই বিচিত্র কুসুমশোভা। এর প্রান্তদেশে ভূর্জপত্র (birch) ও ফার্ তরুরাজির আবেষ্টন। যেন ফুল-কাটা কার্পেটের গাঢ় সবুজ বর্ডার। তারও পিছনে আকাশচুম্বী গিরিশ্রেণী। শিখর-শিরে তুষারকিরীট। রূপালী রৌদ্রে ঝক্‌মক্ করে। পাহাড়ের কোলে কোথাও বা হংসশুভ্র মেঘপুঞ্জ। দেখেই মনে আসে বিশ্বকবির বর্ণনা—"খণ্ড মেঘগণ মাতৃস্তন পানরত শিশুর মতন পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি"।

নীচে কালী নদী। পরপারে দেখা যায় দিগন্ত-জোড়া বিশাল তুষার পর্বত, —সম্ভবতঃ নেপালের Api Range। ওদিকের পাহাড়ের মাথার বরফ স্থানে স্থানে অনেকখানি নীচে পর্যন্ত নেমে আসে। যেন জানিয়ে দেয়, তুষার রাজ্যের দ্বারদেশে তোমরাও এসে গেলে।

সুধীর ও আমি ঘোড়া ছেড়ে হাঁটতে থাকি। মনে হয়, এতদিনের সব শ্রম আজ সার্থক হোল।

ঘোড়ায় বসে চড়াই উঠে ব্রহ্মচারীজির আজ মন প্রফুল্ল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন, ও কী! সুধীরবাবু আপনারা নেমে পড়লেন?

সুধীর বলে, এমন স্বর্গরাজ্যে এসে এখানকার মাটিতে পা ঠেকাব না? আপনি চলুন এগিয়ে, আমরা হেঁটেই যাব বাকি পথটা। ঐ তো দূরে কিছু নীচে গার্বিয়াঙের কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এমন ফুলের রাজ্যে একটু বেড়িয়ে নিই।

গার্বিয়াঙ্ গ্রাম এই মালভূমির এক উপান্তে।

সুধীর অনুতাপ করে, ঐ গ্রামে না থেকে এই মনোরম জায়গায় তাঁবু ফেলে থাকলেই হোত। জীবনে আর কি কখনো এমন ভূস্বর্গে থাকার সুযোগ আসবে!

পথের অদূরে একটি ভগ্নপ্রায় মন্দির। পাথর সাজিয়ে গড়ে তোলা। শিব মন্দির বলে মনে হয়। এগিয়ে দেখতে চলি। কিন্তু ভিতরে যাওয়া হয় না। মন্দিরের অপর পাশে ধবধবে সাদা থান পরা একটি মহিলা মাথায় কাপড় টেনে পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে। কাপড় পরার ধরন দেখে বাঙালী বলে মনে হয়। এখানে একাকিনী কি করছেন, বুঝি না। মন্দিরে প্রণাম করতে গেছেন? অথবা, হয়ত, আমাদের আসতে দেখে পথ ছেড়ে ঐখানে সরে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু, এই নির্জন পরিবেশে একা কেন? হেঁয়ালি থেকে যায়।

সুধীর বলে আশ্চর্য লাগছে। চল্, ওদিক থেকে মন্দিরের দুটো ফটো তোলা যাক।

বলি, মন্দিরটা অতি সাধারণ। কারুকার্যও নেই। পুরানো কিনা বোঝাও যায় না। তবে এই জায়গার নামের মাহাত্ম্য আছে, জানিস তো? এই অঞ্চলের নাম হোল, ব্যাস ক্ষেত্র বা ব্যাস ভূমি। আধুনিক কালে লোকমুখে 'ব্যাস' হয়েছে 'রিয়াস্'। সেই থেকে বিয়াস্ পট্টি, বিয়াস্ ভোটিয়া। এইখানেই নাকি মহামুনি ব্যাসদেবের তপস্যাক্ষেত্র।

সুধীর বলে, তপস্যার কথা জানি না। তবে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচনার আদর্শ সাধনাক্ষেত্র এটা হতে পারে, তা এখানে চারদিক দেখলেই বিশ্বাস হয়।

আমি বলি, তোমার বিশ্বাস হলে হবে কী? ব্যাসদেবকে নিয়ে আরও যে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদার রয়েছে। হিমালয়ের অন্যত্রও ব্যাসদেবের নামে নামকরণ হয়েছে। যেমন, বদরীনাথের পথে ব্যাসচটি। সেটা না হয় একটা চটির নাম। কাশীতেও রয়েছে ব্যাসঘাট। কিন্তু বদরীনাথ ছাড়িয়ে, এখানকার মত তিব্বতে যাবার পথে পড়ে, মানা গ্রাম। যেখানে মার্চা ভোটিয়াদের বাস। সেইখানে রয়েছে ব্যাসগুম্ফা। ওখানকারও কিংবদন্তী, ব্যাসদেব তাঁর গ্রন্থাবলী সেইখানে বসে রচনা করেন। শুধু তাই নয়। গুহার বাইরে স্তরে স্তরে জমে-ওঠা শিলীভূত একটা প্রকাণ্ড পাথর—যাকে বলে stratified rock —সেইটে দেখিয়ে বলা হয়, ব্যাসদেবের পুঁথিগুলিই কালক্রমে এইভাবে জমে পাথর হয়ে গেছে! আবার দেখ, কুলু উপত্যকায় বিয়াস্—নদী,—বিপাশা অথবা ব্যাস,—কোন শব্দের অপভ্রংশ জানি না। কিন্তু রোটাং পাশ্-এর নীচে ও মাথার উপর বিপাশার যে-দুটো উৎস, তাদের বলা হয় ব্যাসকুণ্ড ও ব্যাসরিখি। সে-সবও রমণীয় স্থান হলেও এখানকার মত এত সুন্দর নয়—ফুলের এমন শোভাও নেই।

সুধীর বলে, হিমালয়ের এই সব বিভিন্ন জায়গায় তিব্বতের কাছাকাছি—ব্যাসদেবের এত ভক্ত এল কি ভাবে?

বলি, জানি না, এ-নিয়ে কেউ আলোচনা করেছেন কিনা। হতে পারে, ব্যাসদেব কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রবর্তক বা প্রচারক ছিলেন; হিমালয়ের এই ব অঞ্চলে তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্তরা ছিল, তাঁদের আশ্রমের শাখার

বিস্তারও হয়েছিল।

দুজনে এই সব আলোচনায় মেতে এগিয়ে চলি। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে পথ। কয়েকটি ছোট ছোট নদীর ধারা ও ঝরনা হেঁটেই পার হতে হয়। সামান্য জল। কিন্তু হিমশীতল। এক জায়গায় পাথর থেকে পাথরে পা দিয়ে পার হতে গিয়ে পা পিছলায়, এক পায়ের মোজা ও জুতা ভিজে যায়। মনে হয়, পায়ের ঐ অংশ বুঝি বা জমে বরফ হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি, অল্পদূরেই পাহাড়ের নিভৃত অন্তরালে সূর্য-চক্ষুর অগোচরে এখনও ঝরনার উৎস-মুখে পুরাতন বরফ কিছু জমে রয়েছে।

অবশেষে গার্বিয়াঙ গ্রামে প্রবেশ করি। আলমোরা থেকে ১৪৫ মাইল দূর। ১০,৩২০ ফুট উঁচু। বেলা ৫টা ৪৫ মিনিট।

পথের বাঁদিকে সারি সারি বাড়ি। পাথর ও মাটি দিয়ে গাঁথা দেওয়াল। উপরে শ্লেটপাথর বসানো ঢালু ছাদ। মাঝে মাঝে দোতলা বাড়ি। পথের অপর দিকে পাহাড়ের গা ক্রমে ক্রমে নীচে কালী নদীর উপকূলে নেমে যায়। নদী মাইলখানেকও দূর নয়।

গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ কৌতূহলী নয়নে আমাদের দিকে তাকাতে থাকে। গ্রাম পার হয়ে বিস্তীর্ণ চাষের জমি। তারই একপ্রান্তে জেলা-পরিষদের ডাক বাংলো। পাথর-বসানো পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা জমির এক অংশে একতলা বাড়ি। এরও পাথরের দেওয়াল, শ্লেট-পাথরের ঢালু ছাদ। সামনের দিকে বারান্দা, তারই কোলে দুটি ছোট কামরা। নিকটে পৃথক আর-একটা বাড়িতে তিনখানা ছোট ঘর। সেইখানে পাকশালা, সাহেবদের চাপরাসী, অনুচর এবং পোর্টারদেরও থাকবার ব্যবস্থা।

বাংলোর এলাকায় প্রবেশ করতেই অনুভবানন্দজি ঘরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা করেন, আসুন, আসুন, আপনারা আমাদের অতিথি এলেন। ব্রহ্মচারীজি একটু আগেই পেঁছে গেছেন,—আজ তাঁর আর কোন কষ্টই হয় নি। আপনারা বুঝি, চড়াই শেষ হতেই হেঁটে চলে এলেন? কি রকম ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে? ঘরের ভেতর আগুন জালানো হয়েছে, হাত পা গরম করে নেবেন, চলুন।

বাইরে প্রকৃতই বেশ শীত। হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়াতেই অনুভব করি। দেহের ভিতর হিহি করে কাঁপন জাগে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই স্নিগ্ধ তাপের মধুর স্পর্শ আনন্দ দেয়। দেখি, 'ফায়ার প্লেসে' আগুন গন্‌গন্ করে।

ব্রহ্মচারীজি সাদরে আহ্বান করেন, সুধীরবাবু আপনারা পেঁাছে গেলেন? চলে আসুন এইখানটায় বসবেন—আঃ কী আরাম।

বাংলোয় আসবাবপত্রের বালাই নেই। একটা নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই চেয়ার।

স্বামিজী বলেন, আর কী! তিব্বতে প্রায় চলে এলেন। এখন তিব্বতীয় অভ্যর্থনা হওয়া উচিত। পোর্টাররা এখনও পৌঁছয় নি, এইবার এসে যাবে। ততক্ষণে তিব্বতী চা খান। ভান্‌সিং!

ভান্‌ সিং প্রস্তুতই ছিল। 'ফায়ার-প্লেসে'র আগুনের উপর বসানো বিচিত্র আকারের পিতলের প্রকাণ্ড এক কেটলি থেকে কি এক তরল পদার্থ বাটিতে ঢালতে থাকে। সবুজ চা—'গ্রীন্‌ টি'। তাতে দুধ ও চিনির পরিবর্তে মাখন ও লবণ মেশানো। ক্লান্ত দেহে তপ্ত পানীয় পান মনে আনন্দ দেয়, শীতবোধও কমায়, সত্য। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, স্বাদে তৃপ্তি পাই না।

অনুভবানন্দজি জানান, এখানে দেখছি, অন্ততঃ দিন তিনেক থাকতে হবে। তিব্বত-যাত্রার সব বন্দোবস্ত হতে সময় লাগবে। আলমোরা থেকে যে পোর্টাররা এতদিন মাল নিয়ে এল তাদের সঙ্গে ব্যবস্থা এই গার্বিয়াঙ পর্যন্ত। এরপর তিব্বতী ঘোড়ায় মাল বয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের সকলকার জন্যে চড়বার ঘোড়ারও দরকার হবে। তিব্বতের আবহাওয়ায় পায়ে হেঁটে চলার কষ্ট তো আছেই, সময়ও অনেক বেশী পড়ে।

ঘোড়ার কথা শুনে ব্রহ্মচারীজি উল্লসিত হন। বলেন, ঠিক আছে। সেই মত সব ব্যবস্থা হোক। কদিন তার জন্য যদি এখানে থাকতে হয়, থাকা যাবে।

স্বামিজী বলেন, তাছাড়া আরও কাজ রয়েছে। কদিন তিব্বত বাসের জন্যে জিনিসপত্র কিছু কেনাকাটি তো আছেই। পাটোয়ারীর কাছ থেকে তাকলাকোটের ঝুম্পানের নামে একটা চিঠিও নিতে হবে, এখানকার সেই বসন্তরোগের খবর পেয়ে তারা যেন আমাদের যেতে কোন বাধা না দেয়। আপনারা এখন নিশ্চিন্ত মনে এখানে কদিন বিশ্রাম নিন, ব্যবস্থাদি যা করবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঘরের বাইরে লোকজনের ভিড় জমে।

সেই আলমোরার বাস-এর সহযাত্রী মাদ্রাজীদলের একজন দেখা করতে এসেছেন। আমরা এখান থেকে কবে তিব্বত-পথে রওনা হব জানতে চান। তাঁরা দুজনও সেই সঙ্গে যাবেন। বড় দল না বাঁধলে তিব্বতে ডাকাতির ভয়

থাকে। অপর দু-একজন যাত্রীও সংবাদ নিতে আসেন। সকলকে কাল এসে খবর নেবার জন্য বলা হয়।

একজন ভোটিয়া সসঙ্কোচে ঘরের ভিতর আসে। হাতে থালার উপর খোবানি, বাদাম, মিছরি ইত্যাদি। ভেট দিয়ে সাধুদের ও তীর্থযাত্রীর সংবর্ধনা করা এখানকার গ্রামবাসীদের প্রথা। একটি ছোট ছেলে হাতে ঘটি-ভরা কি জানি কি এনেছে। সলজ্জবদনে স্বামিজীকে কি যেন বলে। স্বামিজী তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে,—তোমার বাবাকে গিয়ে দেখে আসব,—আমাদের দলে ঐ দেখ বড় ডাকতার রয়েছেন, ওষুধ দেবেন,—বলে ব্রহ্মচারীজিকে দেখিয়ে দেন। বলেন, এর বাবা অসুখে পড়ে আছেন, নিজে আসতে পারেন নি, দুধ পাঠিয়েছেন ছেলেকে দিয়ে।

একটি মহিলা জ্বালানী কাঠ নিয়ে বারান্দায় উপস্থিত।

সামান্য সব উপহার। কিন্তু অকৃত্রিম আন্তরিকতায় এই সামান্য সামগ্রীও অসামান্য হয়ে ওঠে।

সুরেন্দ্র মহারাজের কাজ বাড়ে। জিনিসগুলি যেখানে যা রাখবার রাখিয়ে দেন।

পোর্টাররাও এসে যায়। রাত্রের আহারও আজ তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে সকলে শয্যা গ্রহণ করি। সব কম্বলগুলি আজ গায়ে চাপে। সুধীর স্বামিজীকে বলে, কাল ত আর হাঁটা নেই। সকালে যত বেলাই হোক, আমাদের ডাকবেন না, নিশ্চিন্ত মনে আরামে ঘুম দেব।

কদিন পরে আজ বাড়ির চিঠি পেলাম। দশদিন আগেকার লেখা চিঠি, অথচ, পড়ে মনে হয় যেন সব তাজা খবরই পাই। শুয়ে শুয়ে কলকাতার সেই সব খবর ভাবতে থাকি। স্বপ্নের মত বোধ হয়। সে ছিল এক ভিন্ন জগৎ, আমিও যেন এখন আরেক স্বতন্ত্র মানুষ।

॥ ১৪ ॥

আজ অনেক বেলা অবধি নিদ্রা দেবার পরিকল্পনা থাকলেও ঘুম ভেঙে যায় যথারীতি ভোরবেলা। গত কয় দিনকার নিয়ম অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

প্রথমেই মনে আসে, আজ আর পথ-চলা নেই। কিন্তু, মন তাতে তৃপ্তি পায় না। পাহাড়ে এসে নিত্য নূতন পথে এগিয়ে চলার প্রবল উন্মাদনা থাকে। দেহ ক্লান্ত হলেও মন বিশ্রাম খোঁজে না। অথচ, আজ এখন

করণীয়ও কিছু নেই। অলস শয়নে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি। হিমালয়ে দশ হাজার ফুটেরও উপরে, তুষার রাজ্যের এত নিকটে, ভোরের শীত কম্বল ভেদ করে অঙ্গ স্পর্শ করে।

স্বামিজীরা উঠেছেন। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে এসে বিছানায় কম্বল জড়িয়ে বসে আছেন। সুরেন্দ্র মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, ভানুসিংকে চায়ের জল চাপাতে বলব নাকি?

অনুভবানন্দজি বলেন, নাঃ, এখন না। আজ ত সুধীরবাবু, উমাপ্রসাদ বাবুকে ডাকা হবে না,—নিষেধ আছে। দেখা যাক্, কতোক্ষণ ওঁরা আজ ঘুমুতে পারেন।

ব্রহ্মচারীজি পাশের ঘরে আছেন। সিগারের গন্ধ তাঁরও সজাগতা ঘোষণা করে।

'আরে! কিচ্ যে! এস, এস। ভাল আছ ত?'—স্বামিজী কাকে শুভ আবাহন করেন। লোকটি আমারই পায়ের দিকে সঙ্কুচিত হয়ে বসে—কম্বলের নীচে থেকেই তা অনুভব করি। ভাঙা ভাঙা বাঙলায় উত্তর দেয়, ভালো আর কই, স্বামিজী? ব্যবসা ত আর চলে না। এঁদের নিয়ে আপনি আবার কৈলাস চললেন?

উভয় পক্ষে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।

মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসি। দেখি, পায়ের কাছে যে বসে, তাকে এ অঞ্চলের ভোটিয়াদের মত দেখতে না হলেও বেশভূষা তাদেরই ধরনের,—যদিও কিছুটা জীর্ণ ও মলিন। মুখে চোখে সুস্পষ্ট তিব্বতীয় ছাপ। দীর্ঘ দেহ। বলশালী। লম্বাটে মুখ। রোদে পুড়ে তামাটে রঙ্। দাড়ি-গোঁফের বিশেষ বালাই নেই। কিন্তু মাথাভরা লম্বা চুল,—গিঁট দিয়ে চূড়া করে বাঁধা। দু কানে বালার মত মাকৃড়ি। তাতে লাল পলা ও সবুজ রঙের পাথর ঝোলে। মুখে সরল হাসি। সাদা বড় বড় দাঁত দেখা যায়। আমার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানায়।

স্বামিজী পরিচয় করিয়ে দেন, এই সে-ই কিচ্ খাম্পা। কৈলাসপথের সেরা গাইড। যেমন কাজের মানুষ, তেমনি চমৎকার লোক।—তারপর নিম্নস্বরে বলেন, যে করে হয় একেও সঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।—নিন, এবারে উঠে পড়ুন, মুখ হাত ধুয়ে আসুন। সুরেন মহারাজ, চায়ের হুকুম দিতে পারেন। সুধীরবাবুও ত ঐ চোখ খুলে তাকাচ্ছেন।

পাশের ঘর থেকে ব্রহ্মচারীজির গলা শোনা গেল,—সুধীরবাবুদের ঘুম ভাঙ্‌ল নাকি? আমার ত এই এক-দুই-তিন···সতেরখানা চিঠি লেখা হোল।

বিছানা ছেড়ে আমরা উঠে পড়ি। পাশের ঘরে ঢুকি। দেখি, ব্রহ্মচারীজি চিঠি-লেখায় তন্ময়। চমৎকার বাঁধানো প্যাড্‌। গোলাপী রঙের চিঠির কাগজ, তারই উপর বেগনি রঙের কালির হরফগুলি ছুটে চলে। চারপাশে লেখা-চিঠি, খাম ছড়ানো। শুনি, কোনটা দিল্লীর, কোনটা বা বম্বের, একটা আজমীরের—পত্রিকার সম্পাদকদের নামে চলেছে। একটা কোথাকার রাজাকেও লেখা, অপর কয়েকখানা শিষ্য-শিষ্যাণীদের।

সুধীর গম্ভীর হয়ে বলে, ব্রহ্মচারীজি, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, আপনার এত পত্র-বন্ধু থাকার সংবাদটা বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে জানালে আপনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ডাক-বাক্স পাঠাবার ব্যবস্থা নিশ্চয় করত।

ব্রহ্মচারীজি হাসতে থাকেন, বলেন, এখানে ত চিঠিলেখা আমার হচ্ছেই না,—আমার দৈনিক কম করে পঁচিশ-ত্রিশখানা চিঠি লিখতে হয়।

সুধীর জবাব দেয়, ভাল দেখে একজন স্টেনো-টাইপিস্ট সেক্রেটারী রাখুন, অনেক সার্ভিস দেবে।

খুশি মনে ব্রহ্মচারীজি বলেন, সুধীরবাবুর পরিহাস লেগেই আছে। এখন ঠাট্টা রেখে দিন, হিসেব করে বলুন দেখি, চিঠিতে লিখে দিয়েছি খেলার পোস্ট-মাস্টারের কেয়ারে উত্তর পাঠাতে, ফেরবার পথে উত্তরগুলো ঠিক পাব তো?

সুধীর বলে, আমরাও ত ঐ খেলার ঠিকানায় পাঠাতে লিখব।

ঘরের বাইরে কন্‌কনে শীত। তবে পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে তপনদেব দেখা দিয়েছেন। তারই উজ্জ্বল কিরণে চারিদিকে তুষারশিখরগুলির দীপ্তি দিগন্তে শোভা পায়। বাঙ্‌লোর প্রাঙ্গণেও নির্মল রৌদ্রের প্রসন্ন প্রকাশ। রৌদ্রের স্পর্শে প্রাণ যেন জেগে ওঠে।

এরই মধ্যে কখন কিট্‌ব্যাগগুলি খুলে সব জিনিসপত্র রৌদ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একপাশে তাঁবুটিও খাটিয়ে ভালভাবে শুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা চলেছে।

স্বামিজী জানিয়েছেন, এখানে অনেক কিছু কাজ আছে। প্রথম কাজ, এতদিনকার সঙ্গী পোর্টারদের বিদায় দেওয়া। তাদের সঙ্গে এই গার্বিয়াঙ্‌ পর্যন্ত মাল বয়ে আনার ব্যবস্থা। এখান থেকে তিব্বতে মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আয়োজন করতে হবে। লিপুলেখ পাশ্‌ ১৬,৭৫০ ফুট

উঁচু। তারপর তিব্বতে পৌঁছে তেরো হাজার ফুটেরও উপর দিয়ে আমাদের যাত্রাপথ, ১৮৬০০ ফুট উঁচুতেও যেতে হবে। অতো উঁচুতে—High altitude-এ মানুষের পক্ষে গুরুভার বহা দুঃসাধ্য, তিব্বতী ঘোড়া, খচ্চর বা ঝব্বুর ব্যবস্থা করাই যাত্রার নিয়ম। যাত্রীদের চড়বার ঘোড়ারও আবশ্যক হয়। অনভ্যস্ত যাত্রী সেখানে হেঁটে চলতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টবোধ করে, সেইভাবে কৈলাসযাত্রা শেষ করতে বহু বিলম্বও হয়। এ ছাড়া, পথ-প্রদর্শক, গাইড ও দোভাষীর বন্দোবস্ত করা, আর এক কাজ। রুকুমসিং আমাদের সঙ্গে চলেছে, আরও দু'একজন থাকলে ভাল।

স্বামিজী জানান, ঘোড়া-খচ্চরের ব্যবস্থাদি পাটোয়ারীর মধ্যস্থতায় করতে হবে। এখানকার লোকে তাঁকে খাতির করে, ভয়ও করে। তিনি মাঝে থাকলে বেশি ঠকাতে পারবে না। এই ভেবেই তাঁর কাছে আগে থেকে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু, এখনি খবর পেলাম পাটোয়ারী কিছুদূরে কোথায় এক তদন্তে গিয়েছেন, আজ ফিরলেও ফিরতে পারেন, নইলে কালকে। তিনি না আসা পর্যন্ত কোন কিছুই বন্দোবস্ত করছি না। তা, ছাড়া, তাঁর ভাই প্রেমসিংও ত আসছেন। তিনিও বলেছেন, দরদস্তুর সব তাঁর স্বমুখে হবে। অতএব, তাঁরা দু ভাই না পৌঁছনো পর্যন্ত এইখানেই স্থিতি। আশা করা যায়, কাল দুজনেই এসে যাবেন। আজ এখন পোর্টারদের বিদায় করা যাক্। সুধীরবাবু, আপনার হিসেব তৈরি নিশ্চয় ?

সুধীর বলে, সব 'রেডি'। এই নিন্ খাতা।

পোর্টাররা দল বেঁধে হাজির হয়। একচক্ষু এক প্রবীণ তাদের 'মেট্' বা সর্দার। আগাম নেওয়ার ব্যাপারে ছাড়া লোকটি এতদিন পথে বড় একটা আমাদের কাছে আসে নি, কোন কাজে সাহায্যও করে নি। দলের উপর সর্দারি করেছে, প্রয়োজন হলে তাদের হয়ে কথা বলেছে, টাকা চেয়েছে। লোকটির কথাবার্তার ধরন ও আচরণ কেমন যেন কাটখোট্টা। আজও সে এগিয়ে এসে কড়ায় গণ্ডায় সকলের পাওনা হিসাবমত বুঝে বখশিশ নিয়ে সেলাম ঠুকে বিদায় নেয়। দলের আর সকলে তার পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তারাও তার সঙ্গে নিজের নিজের দেনাপাওনা হিসাব করতে চলে।

কালীনদীর অপরপারে নেপালে তাদের গ্রাম। এখান থেকে চার-পাঁচ 'পড়াও' অর্থাৎ চার-পাঁচ দিনের পথ। গার্বিয়াঙে একদিন থেকে কিছু

জিনিসপত্র কিনে দেশে ফিরবে। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তাদের উপার্জিত ও সঞ্চিত অর্থে অন্যত্র ব্যবসা করতে বেরুবে। আবার অর্থের প্রয়োজনে এদেশে এসে মালবাহকের কাজ নেবে। শুনি, প্রতি বছর এই তারা করে।

এতদিন এই দুর্গম পথে তারা যে শুধু আমাদের মালের বোঝা বয়ে এনেছে, এমন নয়। সময় অসময়ে যখনি যা সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তখনি হাসিমুখে তা' করতে এগিয়ে এসেছে। আজ বিদায়ক্ষণে সেই সব ঘটনা কৃতজ্ঞচিত্তে আবার ভাবি। অথচ, ঐ সরল মানুষগুলি হয়ত সেই সকল সেবাদানের স্মৃতি মনেও রাখে না, রাখার উপযুক্ত বলে গণ্যও করে না। বিপদে আপদে, প্রয়োজনে, এমন কি অপ্রয়োজনেও, অসহায় মানুষের সাহায্য করা,—এদের চক্ষে সে তো অতি স্বাভাবিক কার্য, এর মধ্যে মনে ধরে রাখবার আছে কী? পাহাড়ী সুন্দরী ঝরনা, অরণ্যের শ্যামশোভা, গিরিচূড়ার তুষারগরিমা যেমন এদের মনে বিস্ময় জাগায় না, অসাধারণ বলে ঠেকে না,—অবাক হয়, যখন কেউ অবাক হয়ে দেখে বলে—ঠিক তেমনি যাত্রীর সেবা ও সাহায্য করা সহজ স্বাভাবিক ধর্মবোধেই এরা অযাচিতভাবে করে থাকে, অতি সাধারণ নিত্য কর্মের অঙ্গ বলেই মনে করে।

আজ এখন তারা শুধু জানে, নিজের প্রাপ্য মজুরি পেয়েছে, বখশিশও মিলেছে, এইবার উপার্জিত অর্থ নিয়ে আপন ঘরে ফেরার আনন্দ।

কাঁধে কম্বল ফেলে হাসিমুখে নমস্কার করে দল বেঁধে বিদায় নেয়।

এদিকে রৌদ্রের তাপও বাড়ে, শীতপ্রধান দেশ হলেও ছায়ার লোভে ঘরে ফিরি। অনুভবানন্দজি ও সুরেন্দ্র মহারাজ দুজনেই সেখানে খুব ব্যস্ত। তিব্বতের জন্য খাদ্যসামগ্রী কি কি কতোখানি কম আছে, তারই হিসাব চলেছে। প্রয়োজন মত এখানেও চাল, ডাল, ছাতু, গুড়, আলু ইত্যাদি কেনবার ব্যবস্থা হতে পারে যে সব জিনিস তিব্বতে প্রয়োজন হবে না, অথচ এখান থেকে আলমোরা ফেরবার পথে ব্যবহারে লাগবে, সেগুলি পৃথক করা হচ্ছে, এখানে কারও তত্ত্বাবধানে রেখে যাওয়ার আয়োজন হবে।

পাশের ঘরে ব্রহ্মচারীজিও ঔষধের বাক্স আবার ঢেলে সাজাতে বসেছেন। জিজ্ঞাসা করি, সবই তিব্বতে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

তিনি বলেন, অনুভবানন্দজি কিছু কমাতে বলছেন। দেখি, এখানে কোনটা রেখে যাওয়া চলবে কিনা।

ইতিমধ্যে জন কয়েক রোগীও এসেছে। ব্রহ্মচারীজি আশ্বাস দেন, কোন

ভাবনা নেই, এমন ওষুধ দেব, রোগ সারবেই।

অসহায় রুগ্ন মানুষের চোখে মুখে ভরসা ও বিশ্বাসের আভা ফুটে ওঠে।

সুধীর বলে, চল্, আমরাও ক্যামেরাগুলার সাজসরঞ্জাম ঠিক করে রাখি এমনভাবে গুছিয়ে নিতে হবে যখনি যা দরকার পড়বে, হাতের কাছে যেন পাওয়া যায়।

কাজ সেরে দুজনে চিঠি লিখতে বসি। কাল এখানে এসে যে সব চিঠি পেয়েছি, তারই উত্তর দিতে হবে। গার্বিয়াঙ্ ছাড়ার পর চিঠি পাওয়া বা দেওয়া কোনটাই সম্ভব হবে না। এইটেই বৃটিশ-ভারতের শেষ গ্রাম, ডাকঘরেরও এইখানে শেষ। এখানে টেলিগ্রাফ অফিসও নেই। তবুও, কাল এখানে পৌঁছেই বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি—সেটি ডাক-হরকরা মারফত পিথোরাগড়ে যাবে, সেখানকার টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তার হবে। ভাবি, চিঠিতে কতো কি লিখব, কিন্তু এখন লিখতে বসে দেখি, 'আমরা ভাল আছি, বেশ আনন্দে চলেছি'—এর বেশী আর কলম ছোটে না। পথশ্রমে ক্লান্ত-দেহের রাজ্যে হাতের কলম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মনও তার সহযোগিতা জানায়। ফেলে-আসা সংসার জগতের মায়ার বন্ধন, কেমন করে, কখন যেন, শিথিল হয়ে যায়। লেখার প্রেরণা জাগে না। আরও এক বিপত্তি, সকলেই চিঠিতে পথের বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান। কিন্তু, এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্ভারের সম্মুখে বসে লিখতে গিয়ে দেখি, চিঠির অক্ষম ভাষার অন্তরালে প্রকৃতি আত্মগোপন করেন, লেখার অক্ষরে সব কিছুই ব্যর্থ ও অমূলক মনে হয়। তা ছাড়া, একই কথা বার বার সকলকে লেখা কম কষ্টকর নয়।

সুধীর মন্তব্য করে, মস্ত ভুল হয়েছে। সঙ্গে কার্বন পেপার আনা উচিত ছিল—কাজটা সহজ হয়ে যেত।

ব্রহ্মচারীজি পাশের ঘর থেকে শুনতে পান। হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, চিঠি লিখতে আপনাদের এত আলস্য? আমি যে আজকে আটাশখানা লিখেছি।

সুধীর বলে ওঠে, আপনার হাতে বুঝি গণেশের কলম?

দরজার পাশে বারান্দায় শব্দ শুনে তাকাই।

'বাবুজি!'—সসঙ্কোচে কে যেন ডাকে।

দেখি, আমাদেরই দলের তিনজন পোর্টার এসে দাঁড়িয়েছে। দলের মধ্যে

এই তিনজনই সব চেয়ে অল্পবয়সী। শরীরে বলও আছে, মনে সাহসও রাখে। পথশ্রান্ত হয়ে কর্মবিমুখ হতে দেখি নি।

ভাবি, কী ব্যাপার? দেনা-পাওনা সবই চুকে গেছে, বখশিশও পেয়েছে। আবার কি চায়?

কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে।

জিজ্ঞাসা করি, কি রে? কি হয়েছে?

অস্ফুট কণ্ঠে বলে, বাবুজি, আমরাও যাব।

ভাবি, যাবে ত বটেই। বলি, বেশ, বেশ। ভালভাবে পথে ফিরবি। আসার সময় বহুৎ তকলিফ পেয়েছিস। ঘর পৌঁছুবে কদিনে?

উত্তর দেয় না। অথচ, নীরবতার মাঝে কি যেন প্রকাশের ব্যগ্রতা থাকে। বলি, কি হয়েছে রে বদরী?

তার নামটা জানি। জানবার কারণ, এই লোকটিই সেদিন ব্রহ্মচারীজিকে পিঠে নিয়ে সেই চড়াই পথে উঠে আসে।

বদরী মাথা নীচু করে বলে, বাবুজি, আমরা কৈলাস যাব।

কৈলাস যাবি! সে কি রে?

হাঁ, বাবুজি, আমরা তিনজনে আপনাদের মাল বইব। কৈলাস দর্শন হবে।

প্রশ্ন করি, কখনো তিব্বত গিয়েছিলি? তোদের পোষাক কম্বল, সব আছে? তা ছাড়া, শুনছি, সেধারে মানুষে মাল বইতে পারে না,—খালি পিঠে চললেও হাঁফ ধরে—তোদের দ্বারা মাল বহা কি সম্ভব হবে? আর তোরা বাড়ির কাছাকাছি এসেছিস, ঘর যাবি না?

প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ পায়। এ পোর্টার দলে আলমোরায় তিনজন লোক কম পড়ায় মেট এদের নতুন সংগ্রহ করে। তাদের ঘর এ-অঞ্চলে নয়, আলমোরা থেকে ভিন্ন পথে। তিব্বত যাওয়া ত দূরের কথা, এ-পথে এরা পূর্বে কখনো আসে নি। এখন বুঝতে পারি, এতদূর এসে তীর্থ-দর্শনে পুণ্য-অর্জনের বাসনা ও নূতন দেশ-ভ্রমণের আকর্ষণ তাদের তরুণ চিত্ত চঞ্চল করে তোলে।

পোষাক-পরিচ্ছদের কথায় বলে, কতো আর শীত হবে, বাবুজি? আমরা পাহাড়ী আদমী, খুব সইতে পারব। আর মোট বওয়া? জোয়ান

মর্দানা,—পারব না কী ?

নিজেদের সামর্থ্যের উপর অসীম বিশ্বাস।

বলি, স্বামিজীকে বলছি,—তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

অনুভবানন্দজিকে তাদের আর্জি জানাই। শুনেই এক কথায় না-মঞ্জুর করেন, ক্ষেপেছেন ? এদের নিয়ে কৈলাস যাবেন ? মাল ত সেখানে এক-পা-ও বইতে পারবে না, তিব্বতে যাওয়ার মত জামা-কাপড়ও নেই, বেঘোরে মারা পড়বে একেবারে। ওদের দেশের ঠাণ্ডা, আর তিব্বতের শীত ? আকাশ পাতাল তফাৎ। তাছাড়া যে ক'টা টাকা পেয়েছে, তিব্বত যাওয়ার পেছনে এইখানে জিনিসপত্র কেনায় খরচ করলে, বাড়ি ফিরবে কর্পদকশূন্য হাতে। সারা বছর খাবে কি ? এমনি শুধু সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও সোজা কথা নয়,—তিন-তিনটে লোকের তিব্বত-পথের সব ব্যবস্থা করা—সেই শীতের দেশে নিজেদের হয়ত ঠিকভাবে সামলাতেও পারবে না,—ইত্যাদি অনেক কিছু যুক্তি।

তারা ম্লান মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্যালফ্যাল করে চায়।

স্বামিজী কিঞ্চিৎ উৎসাহ দিয়ে বলেন, তার চেয়ে বরং তোরা যদি চাস, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত এইখানে অপেক্ষা কর, আলমোরা ফেরবার পথেও আমাদের মাল নিয়ে যাবি।

কিন্তু তখনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, নাঃ, তাও হবে না। ওতেও বিপদ। ওদের এখানে ঐ ক'দিন থাকবার বাবদ উপরি কিছু খোরাকিও যদি দেওয়া হয়,—তাহলেও যে কটা টাকা রোজগার করেছে, সব এই কদিনেই এখানে নিঃশেষ করবে। ভীষণ জায়গা এই গার্বিয়াঙ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকলে হবে কী ? ঘরে ঘরে মদ চোলাই হচ্ছে, ও-নেশাটা এরা কিছুমাত্র দোষের মনে করে না। গবর্নমেণ্টও এখানে মদ তৈরির কোনো বাধা-নিষেধ রাখে নি। ভানুসিংটাকে দেখছেন না, সকাল থেকে কাছাকাছি আসছে না, রান্নাঘরেই চোখ লাল করে গুম্ হয়ে বসে রয়েছে, কাছে এলেই মুখের গন্ধে ধরা পড়বে। তবুও কদিন থেকে বার বার সাবধান করে আসছি। আজ সকালে বকুনিও খেয়েছে। এখন দিন তিন-চার ওদের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। এছাড়া' সেই রুঙবুঙের ব্যাপার ত আছেই। না, না, এদের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাই ভাল। কই, সুধীরবাবু ! এদের বরং আরও কিছু বখশিশ দিয়ে বিদায় করে দিন।

স্বামিজীর নির্দেশমত তাই করা হয়। তারা বিদায় নেয়। ঘরেই

ফিরবে, এখানে থাকবে না। প্রফুল্লচিত্তে গেল কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমার মন কেমন যেন ভারী বোধ হয়। কেবলি মনে হতে থাকে, বেচারীরা সঙ্গে এলেই পারত। আমরা যেতে পারি, তারা পারবে না ?

কিন্তু, স্বামিজীর সব উপদেশ আদেশরূপে এ-পথে মেনে নেওয়া স্থির করেছি, তাই এর পর আর কোন কথা ওঠে না।

বিকালে পোস্ট-মাস্টার-ওরফে মুন্সীজি স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বৃদ্ধ, অমায়িক ভদ্রলোক। মিষ্টভাষীও। গার্বিয়াঙ-এর বাসিন্দা। মালপত্র এখানে কিছু রেখে যাওয়ার প্রস্তাব শুনে তিনি নিজে থেকেই বলেন, আপনারা চান ত আমার বাড়িতে ওগুলা নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি।

স্বামিজী ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাহলে ওটা নিয়ে আর ভাবনাই নেই। কাজটা চুকে গেল।

সুধীর বলে, আমাদের কিন্তু আরো একটা কাজ আছে। এতদিন পথে আমরা যে-সব ফটো ও সিনেমা তুলেছি, তার ফিল্ম আর নেগেটিভগুলো প্যাক করে রাখা হয়েছে, রেজেস্ট্রী করে ডাকে সেটা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মুন্সীজি বলেন, এ কাজ ত আমার করণীয়ই। কাল পোস্ট অফিসে নিয়ে আসবেন, পাঠিয়ে দেব।

স্বামিজী তাগাদা দেন, এ বেলা গ্রাম দেখতে যাবেন বলেছিলেন, চলুন, মুন্সীজিকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যাক।—বাঙলো ছেড়ে সকলে বার হই।

আমাদের যাত্রাপথে ভারতের এই শেষ গ্রাম। এতদিন পথের নিকটে বা দূরে গ্রাম পেয়েছি, লোকজনের মুখও মাঝে মাঝে দেখা গেছে। এইবার শুরু হবে জনশূন্য অঞ্চল। তিব্বতে তাকলাকোটের আগে আর জনবসতি নেই।

স্বামিজী বলেন, বৃটিশ ভারতের শেষ গ্রাম বলে এই পাহাড় অঞ্চলে গার্বিয়াঙের যেমন নাম-ডাক, তেমনি তিব্বত আর ভারতের সীমান্তে থাকার কারণে এখানকার ব্যবসা-কেন্দ্রেরও খ্যাতি কম নয়। দেখতেই পাচ্ছেন, সুমুখের ঐ বড় বড় বরফের পাহাড়—ওরই ভেতরে লিপুলেখ—পার হলেই তিব্বত। আবার, ওদিকে ঐ পূর্বে—কালীনদীর অপর পারে যে বরফের পাহাড় কতো নিকটে দেখা যাচ্ছে,—ওখানটা নেপাল। এই দুই দেশের সঙ্গে এখানকার বিয়াসী ভোটিয়াদের ব্যবসা বাণিজ্য চলে। এই গ্রাম তারই এক প্রধান কেন্দ্র। এ গার্বিয়াঙের ভোটিয়ারা—তাদের নামের উপাধি হোল গার্বিয়াল্—

সুধীর মাঝ থেকে বলে ওঠে, বুধিতেও যখন ঘোড়ার জন্যে স্কুলে অপেক্ষা করছিলাম, সেখানকার মাস্টারের নাম বলেছিল, কি যেন বুধিয়াল। জায়গার নামেই এখানকার বাসিন্দাদের উপাধি বুঝি?

স্বামিজী বলেন, সুধীরবাবু ঠিকই ধরেছেন। এখন এই গার্বিয়াঙ ব্যবসা-ক্ষেত্র হওয়ায় এখানে শুধু ভোটিয়াদেরই বাস নয়, তিব্বতীও অনেক রয়েছে দেখবেন। তাদের কেউ হয়ত এখানে ঘরবাড়ি করে থাকে, তবে বেশির ভাগ যাতায়াতই করে। এছাড়া প্রতি বছরেই কৈলাসযাত্রীদের মালসরবরাহ, ঘোড়া-খচ্চর-ঝব্বুর বন্দোবস্তর কাজও এরা ব্যবসার সামিল করে নিয়েছে। যাত্রীদের সঙ্গে গাইড্ হয়ে যাবার জন্যেও এখানে কয়েকঘর দোভাষী আছে, —যেমন আমাদের কিচ্ খাম্পাকে দেখলেন,—তারা জাতিতে তিব্বতী হলেও এইখানে বসবাস করে স্থানীয় অধিবাসী হয়ে গেছে। এরা গাইড্-এর কাজ করে, তিব্বতে গিয়ে ব্যবসাও কিছু করে। ভোটিয়া উৎসাহী ছেলেরাও কেউ কেউ তিব্বতী ভাষা শিখে দোভাষী গাইড হয়ে যাত্রীদের সঙ্গে যায়, আমাদের রুকুমসিং-এর মতন। প্রেমসিং-ও একসময়ে এ কাজ করেছে। এখন ব্যবসায় নেমে ফেঁপে উঠেছে, চালচলনও বদলে গেছে। তবে খুব হুঁশিয়ার লোক, যাবার সময় ওকে সঙ্গে রাখতেই হবে।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি। মুন্সীজী বলেন, এখানে প্রায় দু'শো ঘর লোকের বাস। চলুন, এখানকার দু'চারজন মাতব্বর লোকের বাড়িতে নিয়ে যাই।

ঘরে ঢুকতেই গৃহস্বামী এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা করেন। থালায় শুকনা বাদাম, কিশমিশ, মিছরি সাজিয়ে ভেট দেন। হাতে দু-একটা তুলে নিই। অতিথির আপ্যায়নে তাদের মিষ্ট ভাষণ ও আন্তরিকতা মনে আনন্দ দেয়। কিন্তু, গভীর বিরাগ জাগে ভিন্ন এক কারণে। কথায় বলে প্রদীপের তলায় অন্ধকার! এখানেও তাই দেখি। গৃহের বাইরে চারিদিকে প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য। অথচ, বাড়িগুলির ভিতর ও অধিবাসীবৃন্দের বিপরীত অপরিচ্ছন্নতা। সারা বাড়ি মদ ও শুকনা চামড়ার বিকট দুর্গন্ধে ভরা। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। গৃহকর্তারও মুখে সুরার উগ্র গন্ধ, চক্ষু রক্তবর্ণ। কাছে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে গা ঘিন্‌ঘিন করে। অতিরিক্ত শীতের দেশে বসবাস, তাই হয়ত এমন কদর্য পরিবেশ ও স্বভাব। যখন তখন সুরাপান এদের আচার বহির্ভূত নয়, দোষণীয়ও নয়।

প্রত্যেক বাড়ির সদর দরজার নিকটে প্রকাণ্ড ভুটিয়া কুকুর। অপরিচিত আগন্তুকের আবির্ভাবে বিকট স্বরে আপত্তি জানায়। স্বামিজী সতর্ক আছেন। কুকুরের সুব্যবস্থা না করে কোথাও অগ্রসর হন না। বাড়ি বাড়ি ঢুকে আলাপ করার আর উৎসাহ থাকে না।

পোস্টমাস্টার বলেন, শীত পড়তে শুরু হলেই এসব বাড়ি তখন লোকশূন্য হয়ে বন্ধ পড়ে থাকে, সবাই নেমে যায় সেই পাহাড়ের নীচের দিকে ধারচুলা প্রভৃতি গ্রামে। দু'চারজন মাত্র এখানে থাকে দেখাশোনার জন্যে। আমার পোস্টঅফিসও তখন ক'মাস বন্ধ থাকে।

গ্রামের পথে ও আশপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। স্বামিজীর কাছে এখানকার ভোটিয়া সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বর্ণনা শুনি। পুরুষরা ব্যবসা নিয়েই মশগুল, সময় পেলেও অন্য আর কোন কাজ করে না। সব সময়েই ধূমপান চলে। গল্পগুজবের মজলিশ জমে। হয়ত তারই মাঝে কখন তকলিতে উলের সুতা পাকায়। নিজের পরনের জামা-পাজামা তৈরি হবে। অপরদিকে মেয়েদের নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর থাকে না। গৃহস্থালির কাজকর্ম ত আছেই, তার উপর চাষআবাদের জন্য,—লাঙ্গল দেওয়া ছাড়া—, মাঠের সব কাজই তাদের করতে হয়। লাঙ্গল দেওয়ার কর্তব্যভারটুকুই শুধু পুরুষের। এখানে গম যব, ফাপরের চাষ হয়। সরিষাও জন্মায়। সবজির মধ্যে আলু প্রচুর পরিমাণে হয়। বাঁধাকপি, মূলা, মটরশুঁটিও সময়ে সময়ে পাওয়া যায়।

এখানকার মেয়েরা অতি সুশ্রী। গালে মুখে গোলাপী আভা। অটুট স্বাস্থ্য। অমন রূপমাধুরী সত্ত্বেও কিন্তু অলঙ্কারে দেহ-সজ্জার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। গা, হাত, পা, মাথা, নাক, কান—সারা দেহ রূপার অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। গলার হারে সারি সারি রূপার টাকা গাঁথা। বিভিন্ন রঙের পাথর বসানো। লাল প্রবালের প্রচুর ব্যবহার। তাদের অলঙ্কারের এত আতিশয্য দেখে সুধীর মন্তব্য করে, এ-যে সবাই যেন বিয়ের কনে, গা-ঢাকা গহনা-পরে।

মেয়েদের অত কাজকর্মের মধ্যেও হাত কখনো নিষ্কর্মা থাকে না। সময় পেলেই ক্রুশকাঠি হাতে পশম বোনে,—যন্ত্রের মত আঙ্গুলগুলি চলতে থাকে। এ যেন আমাদের গ্রাম্য প্রবাদের আদর্শ,—নেই কাজ তো খই ভাজ! পুরুষদের মত মেয়েরাও এখানে ধূমপানে আসক্ত। দেখতে খারাপ লাগে।

গ্রামে পাঠশালা আছে। সকালেই দেখেছি, ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বই-

প্লেট হাতে চলেছে।

গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে বেলা যায়। শীতও বাড়ে। বাঙলোয় ফিরি। 'ফায়ার প্লেস'-এর আগুনের ধারে সকলে জমিয়ে বসি।

ব্রহ্মচারীজি উৎফুল্ল হয়ে বলেন, সুধীরবাবু, ফিরে এসে খবর পেলাম, আজ একটা নতুন পদ রান্না হয়েছে।

ভানুসিং কয়েকটা ডিম যোগাড় করেছে। আজ তারই কিছু ভক্ষণ হবে। বাকিগুলো তিব্বতে সঙ্গে যাবে। আরও যোগাড়ের চেষ্টায় আছে।

সুধীর বলে, সুখবর। কিন্তু আপনার হাতে রান্না হলে আরও উপাদেয় হোত।

আহারান্তে শুয়ে স্বামিজী বলেন, সুধীরবাবু, আজ রাত্রে আহারটা একটু বেশীই হোল। আমাদের কজনের তো ভালই খাদ্য জুটছে, তিব্বতেও পাব, আর কিছু না হোক, মাংস মাঝে মাঝে মিলবেই। ভাবনা, উমাপ্রসাদবাবুকে নিয়ে। তিব্বতে মাংস না খেয়ে চলে না। তিনি কি খেয়ে থাকবেন সেখানে? গায়ের বল বজায় রাখতে হবে ত? না খেয়ে শরীরও খারাপ হতে পারে বন্ধুটিকে একটু বোঝান দিকিনি।

হেসে উত্তর আমিই দিই, নিজেকে বোঝাতে আমিই পারব। আমার জন্যে কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। সুরেন্দ্র মহারাজ যেখানে ভাণ্ডারী, খাদ্যবস্তুর আমার কোনই অভাব হবে না।

ব্রহ্মচারীজি ও-ঘর থেকে উৎসাহিত হয়ে আশ্বাস দেন, আমার স্টক-এ কয়েকরকম সবজিও শুকিয়ে এনেছি, কোথায় কখন কি দরকার হবে বলা যায় না ত। তবে তিব্বতের শীত যেরকম শুনি, তাতে মাংসই উপযুক্ত খাদ্য। আমি জানাই, আমার নিজের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, নিরামিষাশী থেকেও কৈলাস দর্শন করে আসা যায়। তাছাড়া, নিরামিষ ভক্ষণ আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ নয় সেখানে এমন পরিস্থিতি যদি হয়ই, মাংস না খেয়ে চলবে না, কৈলাস দর্শনও হবে না, তাহলে—তৃপ্তি না পেলেও খেতে আপত্তি করব না,—কিন্তু সে বিপাকে পড়ব বলে কখনই মনে করি না। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ভাবনা নেই, স্বামিজী, মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শনটা করিয়ে দিন। কবে এখান থেকে যাত্রা করছি বলুন দিকিনি।

স্বামিজী বলেন, দর্শন হবেই, কোন ভাবনা নেই। কিন্তু যাত্রার দিন এখনও অনিশ্চিত রয়েছে। প্রেমসিং-এর কোন খবরই নেই। পাটোয়ারী

শুনছি, কাল এলেও আসতে পারেন, কেউই সঠিক জানে না। অথচ তারা না পৌঁছুলে কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। আজ নিজে থেকেই একটু আধটু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। কিন্তু যা ব্যবসাদার লোক এরা। দেখা যাক, কাল এঁরা আসেন কিনা। আরও দুদিন এখানে থাকতে হবে মনে হয়। তা' মন্দ কী? একটানা এতদিন হেঁটে একটু বিশ্রাম হচ্ছে। কি বলেন, সুধীরবাবু?

আমরা একবাক্যে জানাই, বিশ্রাম কেউই চাই না, লিপুলেখটা কোনমতে পার হয়ে এখন তাড়াতাড়ি তিব্বতে পৌঁছুতে পারলেই হয়। তবে ব্যবস্থার জন্যে এখানে দুদিন আরও যদি থাকতেই হয়, উপায়ই বা কী।

সুরেন্দ্র মহারাজ বলেন, উপায় হোল এখন আগুনের তাপে ঘরটা গরম থাকতে নিদ্রা যান, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।

॥ ১৫ ॥

সারাদিন আজ ঘুরে বেড়িয়ে, ছবি তুলে, চিঠি লিখে কাটাই। প্রেমসিং বা পাটোয়ারী কারও দেখা নেই। ভাবি, অনুভবানন্দজি অত করিতকর্মা, স্থানীয় ভোটিয়াদের পরিচিতও,—সেদিন যাঁদের বাড়িতে গেলাম, তাঁদেরই সঙ্গে ত কথাবার্তা বলে ব্যবস্থাদি করতে হবে, মানুষগুলি ভালই দেখলাম, শান্ত ভদ্র ব্যবহার,—তবে আর কারও জন্য অকারণ অপেক্ষা না করে নিজেই সোজা-সুজি কথা বললেই ত পারেন।

আজ রুকুমসিং-এর সঙ্গে গল্প করার সময় জানতে পারি, পরশু বুধি থেকে এখানে আসবার পথে ব্যাসভূমিতে ভাঙা মন্দিরের পাশে যে শুভ্রবসনা অব-গুণ্ঠিতা মহিলাকে একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে বিস্ময় ও কুতূহল জেগেছিল, তিনিই রুমাদেবী। এখন গার্বিয়াঙে এসে আছেন। কৈলাস তীর্থযাত্রীদের, বিশেষতঃ সাধুমহাত্মাদের সেবা ও সাহায্য করার মহৎ উদ্দেশ্যেই তাঁর এখানে প্রতি বছর আসা।

কৈলাসযাত্রী সেই মাদ্রাজী দুজনের একজন আজ আবার সংবাদ নিতে আসেন। তাঁকে বলা হয়, পরশু আমরা রওনা হতে পারব আশা করছি। লোকটি হিন্দী আদৌ জানে না। ভাঙা ভাঙা অল্প ইংরাজি বলতে পারেন।

তাঁদের দুজনেরই গেরুয়াবাস। স্বামিজী বলেন, 'এটি সন্ন্যাসী কিনা এখনি প্রমাণ হয়ে যাবে।'—বলে দরজার বাইরে এগিয়ে গিয়ে কি যেন উচ্চারণ করে

তাঁকে অভিবাদন করেন। তিনি শুধু হাত তুলে নমস্কার জানান।

স্বামিজী আমাদের দিকে ফিরে বলেন, সাধু হলে অমনটি করতো না, আমার অভিবাদনের যথোচিত প্রত্যুত্তর দিত।

সুধীর বলে, কি জানি আপনাদের সব আদবকায়দা; আপনারাই নিজেদের 'কোড্'-এর ভাষা বোঝেন।

মাদ্রাজী যাত্রী স্বীকার করেন, তিনি গৃহী। অপর জন,—প্রকৃত সাধু। তাঁর সঙ্গ নিয়ে এঁর আসা।

তাঁকে জানানো হয়, আমরা সকলেই ঘোড়ায় যাব, মালপত্রও সেইভাবে যাবে। তাঁরা যদি হেঁটে যান তাহলে আমাদের সঙ্গ রাখা কি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে?—কথাটা যেন ভেবে দেখেন। না হলে, একসঙ্গে যাওয়া ও একই জায়গায় তাঁবু ফেলার কোন বাধাই থাকতে পারে না।

লোকটি বেশী কথা বলেন না। চুপ করে সব শোনেন, কিন্তু সব বোঝেন কিনা বুঝি না,—শুধু দুদিকেই মাথা দোলাতে থাকেন। এই হোল মাদ্রাজীদের সম্মতি প্রকাশের অঙ্গভঙ্গি, জানা না থাকলে অমতসূচক বলে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা।

সারাদিনে যাত্রার ব্যবস্থা বিশেষ এগোয় নি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবি, দিনটা বুঝি ব্যর্থই গেল। কিন্তু তখনি মনে হয়, ব্যর্থই বা কিসের? মানস সরোবর কৈলাস,—সে তো যাবই। যাত্রা-পথে হিমালয়ের এই সৌন্দর্যলোকে দিনযাপন —যত দীর্ঘ হয়, সেও ত পরম সৌভাগ্য।

পাশের ঘর থেকে গুন গুন রবে সুরধ্বনি ভেসে আসে।

সুধীর প্রশ্ন করে, কি রকম, ব্রহ্মচারীজির সঙ্গীত আলাপ চলেছে নাকি? জোরেই হোক না,—শোনা যাক।

ব্রহ্মচারীজি বলেন, মস্ত ভুল হয়েছে, এত জিনিস আনলাম, আর সেতারটাই দিল্লীতে পড়ে রইল।

এর পর ব্রহ্মচারীজির উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীত চলতে থাকে। কালী-সঙ্গীত শুনি, কয়েকটি তাঁরই স্বরচিত।

হিমালয়ের কোলে কালী-সঙ্গীতের সুরে কখন চোখে ঘুম নেমে আসে।

॥ ১৬ ॥

ভোরবেলাতেও ঘুম ভাঙে গানের সুরে। অনুভবানন্দজি পাশের বিছানায় কম্বল জড়িয়ে বসে মৃদুস্বরে ভজন ধরেছেন। বড় মধুর লাগছে। চোখ বুজে শুনি।

সাতটা বাজে। চায়ের পর্ব শেষ। দরজার বাইরে সুপুষ্ট বিপুল কলেবর সম্ভ্রান্ত এক ভোটিয়ার আবির্ভাব হয়। সঙ্গে দুই অনুচর।

স্বামিজী উল্লসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, আরে, এই যে পাটোয়ারীজি। আইয়ে আইয়ে। আপনার অপেক্ষায় আজ তিনদিন এখানে বসে আছি। ফিরলেন কখন?

পাটোয়ারী কুশল সিংজি সদলবলে ঘরে ঢোকেন।

সুধীর চাপা গলায় বলে, দেখবেন যেন চেয়ারে না বসেন।

পাটোয়ারী বুদ্ধি, তিনি নিজে থেকেই থপ করে মাটিতে বিছানার উপর বসে পড়েন। বলেন, কাল রাত্রে ফিরে এসেই শুনি, আপনারা এসেছেন। আগে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, এখানে পড়েছিল, কাল ফিরে এসে দেখলাম। আমাকে এরা যদি একটু খবর পাঠাত, আমি আগেই চলে আসতাম। দূরে এক দাঙ্গার তদন্তে যেতে হয়েছিল, তা' সে ত এখানে আপনাদের কাজ শেষ করে আবার ফিরে গেলেই হোত। দেখুন ত, আপনাদের যাত্রার দেরি করিয়ে দিলাম।

পাটোয়ারীজির যেমন দেহের বিশালতা, তেমনি প্রকাণ্ড গোলাকার মুখ-মণ্ডল। যেন, ফোলানো গোলাপী বর্ণের বেলুন। তারই গায়ে একটু নাকের ইসারা, দুটো চোখের জায়গায় ক্ষুদ্র গর্ত, ভিতরে চোখের তারা পিটপিট করে। সেই চাহনি থেকেই মনে হয়, লোকটি বুদ্ধিমান, শান্ত ধীর,—ধূর্ত ব্যবসায়ী নয়। রাশভারী চেহারায় ও কথাবার্তায় এমনি একটা গাম্ভীর্য আছে, যাতে অন্য সকলে খাতির করে।

স্বামিজীর সঙ্গে নানান গল্প হয়,—পুরানো দিনের কথা, হাল আমলের পরিবর্তন ইত্যাদি। পাটোয়ারীজি বলেন, মালপত্র, ঘোড়া—প্রভৃতি কি কি চাই, বলে দিন, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এ আর এমন কি ব্যাপার? প্রেম সিংও তো তিব্বত চলেছে, আজ এখানে পৌঁছে যাবে।

স্বামিজীকে বলি, যেভাবে হোক, কালই যাতে রওনা হওয়া যায়, সেইটে দেখুন।

পাটোয়ারীর দিকে তাকিয়ে স্বামিজী হাসিমুখে বলেন, আর কি। আজই সব ঠিক হয়ে যাবে। কি বলেন পাটোয়ারীজি ?

স্বামিজীর মালপত্র, বাহন ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত ছিল। তখনি জানিয়ে দেন চড়বার ঘোড়া আমাদের পাঁচজনের পাঁচটা, মালের ঘোড়া ঠিক ক'টা লাগবে আজ বিকেলে মাল ওজন করে বলে দেওয়া যাবে,—এগারোটা হলেই হবে, মনে হয়। তার মধ্যে কিচ্-এর দুটো ঘোড়া নেওয়া হবে, তাকে বলা হয়েছে। সমস্ত রেট অবশ্য আপনি যা বেঁধে দেবেন, তাই হবে। পাটোয়ারী আশ্বাস দেন আজ সন্ধ্যের পর এইখানে বসে রেট ঠিক করে দেব।

তারপর স্বামিজীর সঙ্গে নিম্নস্বরে তাঁর কি কথা হয়। স্বামিজী আমাকে বলেন, উমাপ্রসাদবাবু, পাটোয়ারীজি অনুরোধ করছেন তাঁর একটু কাজ রয়েছে, করে দিতে হবে।

ভাবি, কি ব্যাপার ? আমার দ্বারা এখানে তাঁর কোন্ কাজ হওয়া সম্ভব ?

সাহায্য এমন কিছুই নয়, তবে প্রসঙ্গটি করুণ।

তিন বছর আগে মহীশূরের মহারাজা এই তীর্থযাত্রায় আসেন। সেই সময় পাটোয়ারীর এক নিকট আত্মীয় মহারাজার সঙ্গে তিব্বত যায়। লোকটির কর্মনিষ্ঠা ও সরল আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজা মহীশূরে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেন। সে তাই যায়ও। কিছুদিন আগে পাটোয়ারীর কাছে চিঠি এসেছে, বেচারার সেইখানে হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। শিশুকাল থেকে যে মাতৃপিতৃহীন। পাটোয়ারীই তাকে প্রতিপালন করেন। বিবাহও দেন। এখানে ঘরে তার বালিকা-বধূ।

পাটোয়ারী গাঢ়স্বরে বলেন, ছেলেটি যাবার জন্যে যে বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিল, তা নয়। ভাবলাম, মহারাজার সঙ্গে যাবে, বহু ভাগ্য। ভবিষ্যতে কতো উন্নতি হবে। আমিই একরকম জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিই। আমার কথার ওপর কখনো কথা বলত না, তবুও যাবার সময় একবার বললে, বহু দূর দেশ আছে। আমি সাহস দিয়ে বললাম, 'ভাল চাকরি আছে রে, বছর বছর বাড়ি আসিবি,—যা ঘুরে আয়।' শুনলাম, বেশ ভাল কাজ করছিল। গত বছর এখানে আসতে পারে নি। এইবার আসবে কথা ছিল, কিন্তু এ কী হয়ে গেল!—বলে চুপ করেন। মাথা হেঁট করে বসে থাকেন। পাটোয়ারী নিজের কাছে আজ নিজেই যেন আসামী।

তারপর বলেন, স্বামিজীকে বলছিলাম, মহীশূরের চিঠির একটা জবাব

ইংরাজীতে লিখে দিতে হবে। তাঁরা জানতে চেয়েছেন, তার প্রাপ্য টাকা এখানে পাঠাবেন, কার নামে কোথায় পাঠাতে হবে। জবাবে লিখতে হবে, সে-টাকা তার স্ত্রীর নামে এখানে পাঠাতে, কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজন হচ্ছে, তার কাপড়-জামা, জিনিসপত্র যা কিছু সে রোজ ব্যবহার করতো—সেগুলা যেন সব নিশ্চয় এখানে ফেরত পাঠান,—দয়া করে কেউ যেন সে সব নষ্ট না করে,—টাকার চেয়েও যে তার দাম অনেক, বাবুজি, ও কি সে রাজাসাহেবরা বুঝবেন ?

ভাবি, মায়ার বন্ধন ব্যতীত এ দেরই কাছে বা সে-সবের আর প্রয়োজন কী ?

চিঠি লিখে পাটোয়ারীর হাতে দিই। জড়ানো-হরফে কোনমতে ইংরেজিতে নিজের নাম সই করেন। সই-এর শেষে টপ করে তাঁর এক ফোঁটা চোখের জল চিঠির উপর পড়ে দুটা অক্ষর অস্পষ্ট করে দেয়।

কঠিন পার্বত্য-রাজ্যের অধিবাসী-ই হোক, আর দুর্ধর্ষ পাটোয়ারীই হোন,—মানুষ তো!

দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ হয়। কাল থেকে ব্রহ্মচারীজির তত্ত্বাবধানে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা চলেছে। তাঁর সঙ্গে-আনা শুকনা মূলা, করলা, শিম্ ইত্যাদির উপাদেয় ব্যঞ্জন ত আছেই, সঙ্গীদের জন্য মাংসেরও আয়োজন হয়েছে।

ব্রহ্মচারীজি স্বয়ং সমস্ত রন্ধনের ভার নিয়েছেন। পরম পরিতোষের সঙ্গে সকলের ভোজন পর্ব চলে। সুধীর মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয়, দেখবেন ব্রহ্মচারীজি! সামনেই লিপুলেখ পাশ—১৬,৭৫০—পার হতে হবে,—ফাঁসির খাওয়া না হয়ে যায়!

ব্রহ্মচারীজি উত্তর দেন, তীর্থপথে ও-সব অলক্ষণে কথা বলতে নেই। এ হচ্ছে বলকারক খাদ্য,—হাসতে হাসতে লিপু পার হয়ে যাব সকলে।

আহারান্তে বিশ্রামকালে কিচ্ আসে।

স্বামিজী জিজ্ঞাসা করেন, কি খবর, কিচ্ ? সব ঠিক আছে ত ?

কিচ্ বলে, ঠিক না হবার কি আছে, স্বামিজী ? আমি তো ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছি-ই। কিন্তু, স্বামিজী, রঞ্জনকেও নিয়ে চলুন। তার হাল বড় খারাপ চলেছে। তারও একটা ঘোড়া আছে, সেইটেও নিন। রঞ্জন এসেছে, বাইরে

দাঁড়িয়ে আছে,—ডাকছি আমি।

উঠে গিয়ে ডেকে আনে। কিচ্-এর চেয়ে রঙ কিছু ফর্সা। সামনের দাঁতগুলি আরও উঁচু। নইলে প্রায় একই ধরনের দেখতে। সম্পর্কে তার ভাই হয়।

নমস্কার করে বসে। ঠিক হয়, তার ঘোড়াও সঙ্গে যাবে।

স্বামিজী বলেন, দেখুন ঠাকুরের কী কৃপা। কোথা থেকে কেমন সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। রঞ্জনও একজন নাম করা গাইড্। রুকুম সিং ত রয়েছেই, এখানকার সব চেয়ে সেরা আর দুজন গাইডও আমাদের সঙ্গে তাদের ঘোড়া নিয়ে চলল,—পথে তাদেরও সাহায্য পাওয়া যাবে। কতো বড় ভরসার কথা। লোকগুলি দেখতে শান্ত, কিন্তু গায়ে অসুরের শক্তি ধরে। দেখবেন পথে। অদ্ভুত মানুষ সব।

অনুভবানন্দজি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন, সঙ্গে আরও কি জিনিস নিতে হবে, কদিনে সমস্ত পথ অতিক্রম করা ঠিক হবে, কোথায় কোথায় রাত-কাটানো যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি। রুকুম সিংও এসে আলোচনায় যোগ দেয়।

বেলা দুটো থেকে মালপত্র ওজন করা শুরু হয়; প্রত্যেক বোঝার ভার যথাসম্ভব সমান রাখা চাই। প্রতি ঘোড়া দেড় থেকে দু মণ ওজন মাল নেবে। আবার, জিনিসগুলিও থলির মধ্যে এমন ভাবে সাজানো দরকার, প্রয়োজন হলেই যেন পাওয়া যায়। সুধীর কাগজ কলম নিয়ে বসেছে, প্রত্যেক থলি ও বাক্সে নম্বর দেওয়া হয়েছে, কোনটাতে কি রাখা হোল, তারই তালিকা হচ্ছে।

সুরেন্দ্র মহারাজ গুছিয়ে গাজিয়ে দেন, বলেন, সুধীরবাবু, খাবার জিনিসের লিস্ট সব সময়ে আমার কাছে থাকবে, নইলে কোথায় কি রইল মনে থাকবে না।

চাল, ডাল ও আলুর সম্ভার কিছু কম ছিল, এখান থেকে সপ্তাহ তিনেকের মত তারও সংস্থান করা হয়। ছাতুও প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে চলেছে। স্বামিজী বলেন, দরকার হবে, দেখবেন তখন।

তিব্বতের জলে চাল ডাল সিদ্ধ হয় না। তাই নরম করবার জন্য ভূর্জপত্রও সঙ্গে কিছু রাখা হয়। গার্বিয়াঙেও ইতিমধ্যে এর ব্যবহার প্রয়োজন হয়েছিল। পাকের পর এই দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলে শক্ত ভাত, ডাল খানিক নরম হয়ে আসে।

আমাদের সঙ্গে আনা তাঁবু ছাড়া আরও দুটি তাঁবু ভাড়া নিতে হয়েছে।

একটি বড়, অপরটি ছোট। সঙ্গের লোকজন থাকা, মালপত্র রাখা এবং রান্নার জন্য স্বতন্ত্র তাঁবুর প্রয়োজন। কলকাতা থেকে আনা অঙ্গহীন তাঁবুও সেই কাজেই ব্যবহার হবে। তাঁবুর ভাড়া আকার অনুপাতে এক একটি মোট পাঁচ থেকে সাত টাকা।

আলমোরাতেই স্বামিজী আমাদের কম্বল দেখে বলেছিলেন, তিব্বতী শীত নিবারণ ওতে সম্ভব নয়। অতএব এখান থেকে চারটে তিব্বতী থুলমা (বা চুটকা) ভাড়া করা হয়। ভেড়ার লোমে তৈরি কম্বল, যেমন ভারী, তেমনি গরম। স্বামিজী বলেন, এগুলা পিশুর রাজ্য। বলেছি ত একেবারে নতুন দেখে দিতে,—তা হলেও ঘরে জড় করে রাখলেও পিশু হয়,—কি রকম হবে, কি জানি!

স্বামিজী দুজনের ও সুধীরের জন্য এখানে একটা করে মোটা পট্টুর riding breeches-এর মত পা-আঁটা পায়জামা তৈরি করানো হয়েছে। মোলায়েম না হলেও খুব গরম। স্থানীয় খাঁটি উলের। দামও বেশী নয়,—এক একটা টাকা দশেক মাত্র। ব্রহ্মচারীজির বিশুদ্ধ বিলাতী পুরা-পা-পর্যন্ত-ঝুল উলের অ্যাণ্ডার-ওয়্যার আছে, বলেন, এতেই আমার চলে যাবে।

আমার জন্য গরম ব্রিচেশ কলকাতা থেকেই করিয়ে-আনা।

সুরেন্দ্র মহারাজ হেসে বলেন, এ সঙের সজ্জা হোল ভাল। জীবনে প্যাণ্ট পরে কখনো সায়েব সাজি নি, এখন সাধু হয়ে এ-বেশও ধরতে হবে?

সুধীর বলে, ফুল প্যাণ্ট আমিও কি কখনো পরেছি? সেই ছোটবেলায়, আর বড় হয়ে ফুটবল খেলার সময়, ঐ যেটুকু হাফ্‌প্যাণ্ট পরা। এই তো কেমন খাসা ধুতি পরেই এ-পথ চলে এলাম। এখনও ও-প্যাণ্ট তোলা থাক, সেই লিপুলেখের কাছে পৌঁছে বার করা যাবে। কাপড় পরে কতো সোয়াস্তি।

স্বামিজী বলেন, অতি ঠিক কথা, সুধীরবাবু। কিন্তু সেই দারুণ শীতের দেশে যা' প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া,—ওটা না পরে উপায় থাকে না, দেখবেন। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ!

কুকুম সিং-এর একটা বন্দুক আছে। কিচও আর একটা সঙ্গে নেবে। প্রেমসিংও একটা রিভলবার নিয়ে যাবেন বলেছেন। তিব্বতে দস্যুভয়,—তাই এই রণসজ্জা।

ব্রহ্মচারীজির ঔষধের বাক্স প্রায় একই প্রকার পূর্ণ রয়েছে। সুধীর

জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার, ব্রহ্মচারীজি? বললেন যে এখানে কিছু রেখে যাবেন?

তিনি বলেন, অনেক চেষ্টা করলাম। কোনটাই ছেড়ে যেতে পারছি না। হঠাৎ কোনটার কখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে যদি? সবই দামী ওষুধ।

স্বামিজী বলেন, পেটের গণ্ডগোলের, ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটর হওয়ার, মাথা ধরার, দেহের ব্যথা—এই সবের ওষুধ সঙ্গে নিয়ে বাকিগুলা রেখে গেলে পারেন। সেখানে হাসপাতাল বয়ে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? বোঝা বাড়বে। আর, এতো কাঁচের শিশিপত্তর কখনো নিয়ে যায়?—ভাঙবে যে।

ব্রহ্মচারীজি ঔষধগুলির গুণ ও পরিচয় ব্যাখ্যা করেন, এইটে স্বর্ণচূর্ণ দিয়ে তৈরি,—এই দেখুন চিকমিক করছে, এইটে হরিণের শিঙ-এর ভস্ম থেকে হয়েছে,—ও-শিশিতে যে বড়িগুলা দেখছেন, দেখতে ছোট হলে হবে কি? তৈরি করতে পুরা তিনটি বছর লেগেছে।

অতএব, আর যুক্তি-তর্কের ফাঁক নেই। সব ঔষধই সঙ্গে চলে।

সঙ্গে যে ভাড়া করা তাঁবু দুটি যাবে, বাংলোর প্রাঙ্গণে তাও খাটানো হয়েছে। কোথাও ছেঁড়া-ফুটা আছে কিনা দেখে নেওয়া দরকার। গ্রামবাসীরা কয়েক জন এসেছেন। যে যা পারেন সাহায্য করতে উৎসুক।

অপরের যাত্রার মালপত্র গোছানোর মাঝেও উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়।

বিকালের মধ্যে সমস্ত বোঝা ওজন হয়ে প্রস্তুত।

সন্ধ্যার পর পাটোয়ারীজি এসে যান। সঙ্গে দুই অনুচর। ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ছায়াসম যেমন সর্বত্রই দেখা যায়। স্বামিজী স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে ঘরের মধ্যে বসান। দেখতে দেখতে আরও কয়েকজনের শুভাগমন হয়। বেশ-ভূষার পারিপাট্য ও ভাবভঙ্গিতে বোঝা যায় তাঁরা গ্রামের গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি। প্রেমসিংও এসেছেন। স্বামিজী সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। পাটোয়ারীর আশপাশে তাঁরা এসে বসেন। কিচ ও রঞ্জন দরজার পাশে এক কোণে একটু জায়গা করে নেয়। অনুভবানন্দজি বসেন পাটোয়ারীর পাশে। আমরা তাঁরই নিকটে আমাদের বিছানার উপর কোন রকমে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছি। লোক-সমাগমে স্থান অকুলান হয়েছে। ছোট ঘরে জমজমাট আসর। ভাবি, আমাদের ক্ষুদ্র দলের যাত্রার সামান্য আয়োজনের উদ্দেশ্যে এত আড়ম্বর কেন?

পাটোয়ারীজি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, ইনি মোহন সিং, ইনি কল্যাণ সিং, উনি নন্দরাম সিং-এর লোক ইত্যাদি। স্বামিজী এঁদের অনেককেই আগে থেকে চেনেন। সকলেই এ-অঞ্চলের প্রতিপত্তিশীল ব্যবসাদার। এর আগে গত দুদিনে, এঁদের কয়েকজনকে আমরাও দেখেছি, কারও বাড়িতেও গিয়েছি, কেউ বা ভেট নিয়ে ডাকবাংলোতেই এসেছিলেন। সে-সময়ে তাঁদের কথাবার্তায়, আদর-আপ্যায়নে অমায়িকতা ও সৌজন্যের আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছিল। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখি, এই বৈঠকে সেই সব মানুষের ভিন্ন মূর্তি। যেন মুখোশ বদলে রঙ্গমঞ্চে নাটকের আর এক অঙ্কে নামা। গম্ভীর ভাব, চকিতে মুখে ফুটে-ওঠা হাসির বঙ্কিম রেখা,—প্রাণখোলা হাসি নয়, আনন্দের প্রকাশও নয়, ঝানু ব্যবসায়ীর কাষ্ঠহাসি—অন্তঃসারশূন্য। প্রায় সকলেরই মুখ থেকে সুরার তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা কজন মূক শ্রোতামাত্র। স্বামিজী আমাদের মুখপাত্র। কথাবার্তা আরম্ভ হয়। তিব্বতে যে সব লোক ও ঘোড়া-খচ্চর সঙ্গে যাবে তাদের রেট স্থির করাই উদ্দেশ্য। পাহাড়ী ভাষায় আলোচনা চলে, সব না বুঝলেও কিছু কিছু বোঝা যায়। বাঁধা দর কোন কিছু নেই। স্বামিজী কয়েকবার যাত্রায় এসেছেন এবং প্রতি বছরেই কোন-না-কোন যাত্রীদলের ব্যবস্থার জন্য সাহায্য করেছেন, তাই এখানকার সব হালচাল তাঁর জানা। তবুও, তাঁরই সঙ্গে যে রকম দর-কষাকষির বহর দেখি, আশ্চর্য হই।

প্রথমেই তারা হাঁকে, মানস সরোবর দর্শন ও কৈলাস পরিক্রমা করে এখানে ঘুরে আসতে যত দিন লাগবে, প্রতিদিন হিসাবে রেট বাঁধা হবে।

স্বামিজী তাতে সম্পূর্ণ অসম্মত।

আমাদের দিকে ফিরে নীচু গলায় বলেন, ভেবেছে কী ওরা? ঐতে আমি রাজী হব? অথচ, এই প্যাঁচে ফেলেই এরা ইদানীং যাত্রীদের হয়রান করছে। দৈনিক হিসেবে হলে, দেখবেন, ওরা চলবে অতি আস্তে,—এই পথ ঘুরিয়ে আনতে দ্বিগুণ সময় লাগবে। অথচ, যাতায়াতের থোক ভাড়া ঠিক করলে, ওদেরই স্বার্থ হবে পথে কোথাও অযথা দেরি না করার, আমাদেরও খরচার অনিশ্চয়তা থাকবে না। না হলে, কতদিনে ফিরতে পারব তার ঠিকই নেই, খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্রও সঙ্গে অনেক বেশী নিতে হবে। আর, এখানে যতই জোর দেখাই না কেন, তিব্বতে পৌঁছে এদের লোকের ওপরই নির্ভর করে চলতে হবে।

তারপর পাটোয়ারীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসিমুখে বলেন, পাটোয়ারীজি, আমরা তীর্থ করতে এসেছি, কীভাবে দরের হিসেব হবে আমি জানতে চাই না, আপনি দেখে ঠিক করে দিন, মোট কত করে ঘোড়া ও লোক পিছু দিতে হবে। একটা কথা জানাতে পারি, আমরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলতে রাজী আছি,—অযথা কোথাও দিন কাটাতে চাইব না।

ব্যবসায়ীরা তাতে রাজী নয়। নজির দেখায়, এই তো সেবছর যে দল এসেছিল তারা ঐ হিসেবমত দিয়েছে। আজই ত দুজন যাত্রী একটা মালের ঘোড়া ঠিক করেছে দিন হিসেবে,—প্রতিদিন দু টাকা দু আনা করে।

স্বামিজী আমাদের বলেন, বুঝছেন? ঐ মাদ্রাজীদের গলায় ছুরি বসিয়েছে! বেচারীরা ত এখানকার কোন খবরই রাখে না। এতে ওদের ৪০৲।৪৫৲ টাকা পড়ে যাবে, অথচ জানি, ঘোড়া পিছু মোট টাকা বারোর বেশি পড়বার কথা নয়। যাত্রীদের ওপর এদের এই যে জুলুম আরম্ভ হয়েছে দু বছর থেকে তা আমার কানে আসছে। অন্য ব্যবসা করে প্রচুর টাকা এরা করেছে, তা করুক। তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের—আর সাধু-সন্তরাই আসেন এ পথে বেশি—তাঁদের কাছ থেকেও এই সামান্য ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে টাকার লোভ এরা ছাড়তে পারে না। যাত্রীরাও নিরুপায় হয়ে মেনে নেয়। এইসব মনে রেখেই কমিশনারের চিঠি এনেছি, পাটোয়ারীকেও সামনে রেখেছি।

স্বামিজীর সঙ্গে তাদের তর্কবিতর্ক চলতে থাকে। পাটোয়ারীকে তিনি মধ্যস্থ করেন। কিন্তু, ওদিকে স্থূলকায় পাটোয়ারীর বুকের উপর মাথা ঝুলে পড়েছে; চমকে উঠে মাথা তুলে রক্তাভ চক্ষু দুটি কোনক্রমে কিঞ্চিৎ উন্মীলন করেন, পাহাড়ী ভাষায় ব্যবসায়ীদের কি যেন বলতে গিয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়েন। মনে হয়, বিবিধ নেশার সমবেত আক্রমণ তাঁকে কিঞ্চিৎ কাবু করে।

ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে পাহাড়ী ভাষা ছেড়ে তিব্বতী ভাষায় পরামর্শ চালায়। প্রেমসিং একপাশে চুপ করে বসে আছে, বিশেষ কথা বলে না।

স্বামিজী উত্তেজিত হয়ে আমাদের বলেন, দেখেছেন? কী ডাকাত সব! ভাবছে, ও-ভাষা আমি বুঝব না। কিন্তু, বলতে না পারলেও বুঝি সব। কি বলছে জানেন? 'আমরা কেউ ঘোড়া না দিলে এঁরা আর এখানে ঘোড়া পাচ্ছেন কোথায়? সবাই আমরা এখানে। যা দাম চাইব, বাধ্য হয়ে

এঁদের দিতেই হবে। খরচা করতে এসেছে, যত বেশি পারি আদায় করে নেব।'

অন্যায়-অসহিষ্ণু স্বামিজী ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধরেন, গৈরিক বসনও বাধা দিতে পারে না। রুক্ষ তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানান। পাটোয়ারীকে সম্বোধন করে বলেন, পাটোয়ারীজি! আমরা তীর্থযাত্রী, এখানে ব্যবসা করতে আসি নি। এঁদের ধর্মে যদি আমাদের ওপর এমন অত্যাচার করার রীতি থাকে, এঁরা যা খুশি করবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমরা তা' মানব না। আমাদের ধর্মও তা সইবে না। এখন আমরা এখানে আপনার অতিথি ভাবেই রয়েছি। কমিশনার সাহেবের চিঠিও আপনি দেখেছেন। এঁদের কারও কথা আমি জানি না, জানতে চাইও না। আপনি নিজে আমাদের এই তীর্থযাত্রার একটা ব্যবস্থা করুন। আমাদের অন্ততঃ তাকলাকোট পর্যন্ত পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দিন; তারপর সেখান থেকে যা করবার আমরা করব।

অনুভবানন্দজির এই নূতন প্রস্তাবে প্রমাদ গণি। লিপুলেখ পার হয়ে তিব্বতের প্রথম জনপদ,—তাকলাকোট। যেখান থেকে কৈলাস ঘুরিয়ে আনতে ঘোড়া বা ঝব্বুর ভাড়া পাঁচ-সাত টাকা মাত্র। দরে সস্তা হয় বটে, কিন্তু ব্যবস্থাদি করার জন্যে তাকলাকোটে দু'তিন দিন বেশি থাকতে হয়, সুবিধামত দরে পাওয়া না-পাওয়ার অনিশ্চয়তাও থাকে। তাছাড়া ফেরবার সময় তাকলাকোট থেকে গার্বিয়াঙ আসার ঘোড়া সব সময়ে পাওয়া যায় না এবং পেলেও তখন যাত্রীর একান্ত প্রয়োজন বুঝে দর হাঁকে বেশি। অতএব, গার্বিয়াঙ থেকে পুরাপুরি যাত্রার জন্য ব্যবস্থাদি করে রওনা হওয়াই সমীচীন। না হলে প্রচুর হাঙ্গামা পোহাতে হয়, খরচান্তও হতে হয়। এই সকল কথা স্বামিজীর কাছেই আগে শুনেছি। হয়ত এখন বেপরোয়া ভাব দেখানোর উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব করেন।

ওদিকে স্বামিজীর তীক্ষ্ণস্বরে পাটোয়ারীজির নেশার ঘোর টুটে যায়। মাথা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসেন। তিরস্কার করে ভোটিয়াদের কি সব বলতে থাকেন।

ভানুসিং এসে খবর দেয়, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে। ঘড়িতে দেখি, রাত দশটা বেজে গেছে।

অনুভবানন্দজি বলেন, আপনারা খেয়ে আসুন। আমি এর একটা হেস্তনেস্ত

না করে উঠছি না। তাঁকে বাদ দিয়ে খেতে যেতে আমরা রাজী হই না। বলি, নিন্, আপনাদের নাটক চলতে থাক্—আমরা দেখি।

বলে যথাসম্ভব পা ছড়িয়ে গায়ের উপর ভাল করে কম্বল টেনে চোখ বুজে তাঁদের কথাবার্তা বোঝবার চেষ্টায় থাকি।

ঐ অবস্থায় কখন যে ঘুমিয়েও পড়ি জানি না। জানতে পারি, যখন কার হাসির রোলে চমকে জেগে উঠে চোখ মেলে দেখি, অনুভবানন্দজি সেই প্রাণখোলা হাসিতে ঘর মাতিয়েছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, কী রকম? একপ্রস্থ নিদ্রা হয়ে গেল না কি? উঠে পড়ুন, খেয়ে আসা যাক্—ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেল। এঁরা চললেন। পাটোয়ারীকে বলেন, আপনি ছিলেন বলেই এভাবে কাজ শেষ হোল,—অনেক তকলিফ দেওয়া গেছে আপনাকে। পাটোয়ারীর পরিতৃপ্ত বদনে ঈষৎ হাসির রেখা। হাতে ভর রেখে দেহভার তুলে, উঠে দাঁড়াতে উদ্যত। অন্য সকলে আগেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। সবারই প্রফুল্ল মুখ। মোহন সিং এগিয়ে এসে বলেন, "স্বামিজী আর কোন কিছু দরকার থাকলে বলে দিন, আমরা রয়েছি; এ-পথে আপনাদের কোন কষ্ট হতে দেব না। আমাদের লোকজন ঘোড়া আসবাব—সবই আপনাদের জন্যে। যা কিছু দরকার, নিয়ে যাবেন।"—পরিপূর্ণ অমায়িকতার প্রতিমূর্তি।

অভিবাদন করে এত রাত্রি পর্যন্ত বিলম্বের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে সকলে বিদায় নেন।

গৃহ হোল আবার নিস্তব্ধ।

স্বামিজী বলেন, চলুন, খেতে খেতে শুনবেন কি হোল। এধারে ক'টা বেজেছে তা' দেখেছেন?

তাকিয়ে দেখি, রাত ১১টা ১০!

সুধীর বলে, বাকি রাতটুকুও কাটিয়ে দিলে পারতেন!

স্বামিজী বলেন, বারোটাই বাজিয়ে দিচ্ছিল, সুধীরবাবু! মাঝে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, ভাবলাম, এতদূর এসে এখানেই আরও কদিন আটকে থাকতে না হয়! ভীষণ 'চিজ্' এই লোকগুলি। আগে এমন ছিল না; বদলে যাওয়ার কারণ আছে। এ ব্যবসায় এদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই,—একচেটিয়া কারবার। জোট বেঁধে যা খুশি করতে পারে, এখন করছেও, দোষটা সম্পূর্ণ এদের নয়। মাঝে মাঝে দু'একটা যাত্রীদল আসে যারা টাকা

ছড়িয়ে যায় নির্বিচারে, ভবিষ্যৎ যাত্রীদের কথা ভেবেও দেখে না,— অথচ অবস্থাপন্ন যাত্রী ক'জনই বা আসেন এপথে? সেই সব মোটা টাকার স্বাদ পেয়ে এদেরও মাথা বিগড়েছে, এখন পেয়ে বসেছে। মানুষের একবার রক্ত খেলে বাঘ যেমন করে মানুষ-খেকো হয়। এমনি করেই মানুষ অর্থপিশাচ হয়ে ওঠে। আমি দেখছি এই দুর্গম তীর্থযাত্রায় যাত্রীদের এখন নিরপানি-লিপুলেখ নয়—এইটেই এক মহাসমস্যা দেখা দিয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি, আজ আপনাদের সঙ্গে না থাকলে আপনাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত। ডেপুটি কমিশনার সাহেবের চিঠিটা কম কাজ দিয়েছে? এদের চাবুকই হোল ঐসব সাহেব।

অনুভবানন্দজি তারপর হেসে বলেন, জানেন? এক সাহেব এদের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, পাহাড়ী-মাড়োয়ারী। স্বামিজীর কাছে রেটগুলি শুনি। প্রত্যেক চড়বার ঘোড়া গার্বিয়াঙ ফিয়ে আসা পর্যন্ত মোট ১৫·০০ টাকা। মাল বইবার ঘোড়া বা খচ্চরও তাই। পাঁচটি সওয়ারি ঘোড়ার জন্য তিনজন সহিস যাবে, তাদের প্রতিজনকে ১২·০০ টাকা দিতে হবে। মাল-বাহী ঘোড়া বা খচ্চর বারোটি লাগবে, তাদের সঙ্গে তিনজন লোক থাকবে, লোকপিছু ৯·০০ টাকা দেওয়া হবে।

জিজ্ঞাসা করি, কতোদিন লাগবে আবার গার্বিয়াঙ ফিরে আসতে?

অনুভবানন্দজি বলেন, তিন সপ্তাহের মত সব ব্যবস্থা করে যাওয়া যাচ্ছে, তার আগেই ফিরতে পারা যাবে, মনে হয়, ১৭।১৮ দিনের মধ্যে ফিরে আসব। যাক, যাত্রার আয়োজন সব ভালই হয়ে গেল। কাল সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হতে হবে। আর কী! তিন দিন পরেই তি-ব্-ব-ত! নির্বিঘ্নে লিপুলেখ পাশের বরফটা পার হয়ে গেলেই হোল। কৈলাসপতির কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। কি বলেন, সুধীরবাবু?

সুধীর বলে, ঘোড়ার ব্যবস্থা ত ভালমতেই করলেন, ঘোড়-সওয়াররাও যাতে ঠিকভাবে গিয়ে ফিরে আসে, সেইটেও যেন দেখবেন!

ব্রহ্মচারীজি আশ্বস্তকণ্ঠে বলেন, ঘোড়া হয়ে গেল, এখন আর কোনই ভাবনা নেই, সুধীরবাবু! একবার চেপে বসতে পারলে তখন আর দেখে কে?

তাঁর উচ্ছ্বাসে সবাই হেসে উঠি। অলক্ষ্যে তাঁর ভাগ্যদেবতাও হাসেন কি না কী জানি।

তৃতীয় অধ্যায়

গার্বিয়াঙ—মানস সরোবর—কৈলাস—গার্বিয়াঙ্

(২৩শে জুন,—১১ই জুলাই, ১৯৩৪)

॥ ১ ॥

আজ আবার প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ। বিছানা বেঁধে এখনি বার করে দিতে হবে। সকালেই ঘোড়া আনতে বলা হয়েছে। অনুভবানন্দজি বলেন, আপনাদের আর দুদিন কষ্ট করে এই ভোরে ওঠা। তারপর তিব্বত পৌঁছে রোজ খাওয়াদাওয়া সেরে একবার করে দিনে চলা। সেখানকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ভোরে বেরোনো সম্ভব নয়, আর এইসব ঘোড়াও দিনে সেখানে একবারই সাজগোছ পরে চলে—তা সে যতক্ষণই চালান না কেন,—কিন্তু দুবেলা ওরা বেরোবে না, ওদেরও ত জ্ঞান আছে।

মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হতে সময় বেশি লাগে না, এই পথিক-জীবন এখন এমনি স্বভাবগত হয়েছে। টুংটাং ঘণ্টার শব্দ বাংলোর বাইরে অশ্ববাহিনীর আগমন বার্তা ঘোষণা করে। কানে মধুর শোনায়। প্রাণে যেন আরতির কাঁসর ঘণ্টার প্রতিধ্বনি তোলে।

উৎসাহ-দীপ্ত কিচ্ এসে সংবাদ দেয়, সবাই হাজির, 'সমান' পেলেই বোঝাই করতে পারে।

মালও সব প্রস্তুত। অতএব বিলম্বের কোন কারণ থাকে না।

সুধীর বলে, চল্, ঘোড়াগুলোকে দেখে আসি।

দেখতে খর্বকায়, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট, বলশালী। টাট্টু ঘোড়ার মতন। পিঠের উপর কাঠের জিন্। তারই দুপাশ দিয়ে মালের বোঝা থলের ভিতর পুরে ঝুলিয়ে দেয়। বোঝাগুলি সমান ওজন করে ভরা। তুলাদণ্ডের মত দুদিকে ঝোলে।

চড়বার ঘোড়াগুলির পিঠেও কাঠের জিন। তারই উপর আমাদের এক একটা কম্বল বেঁধে দিচ্ছে, বসলে শক্ত না লাগে। সব ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা ঝোলে, তারই সঙ্গে বাঁধা নানা রঙের পশমের ঝালরও দোলে,—লাল, নীল, সবুজ, সাদা—কতো রঙের ছটা। মাথার উপরও তেমনি রঙিন ঝালর উঁচু

হয়ে আছে, 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি'র মতন।

ঘোড়াগুলির মধ্যে একটা বাচ্চা ঘোড়াও দেখি। সুধীর বলে, এও সঙ্গে চলেছে নাকি?

কিচ্ হাসিমুখে জানায়, তারই একটা ঘোড়ার বাচ্চা। মা যাচ্ছে তাই সেও যাবে। মা-ছাড়া ত থাকতে পারবে না। মাল বইবার শক্তি এখনও হয় নি, খালি পিঠেই চলবে।

সুরেন্দ্র মহারাজ এসে তাগাদা দেন, আপনাদের রান্না তৈরি, খেয়ে নেবেন, চলুন, বাসনপত্রও খালি করে ঝোলায় ভরে দিতে হবে। আজ প্রথম দিন, এদের নিজেদের মধ্যে মাল ভাগ করে সাজাতে এখন সময় নেবে।

রান্নাঘরের পাশে দেখি, প্রকাণ্ড একটা ভেড়ার ছাড়ানো লোমভরা চামড়া। রোদে শুকাতে দেওয়া। ভানুসিংকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, এইখানে এসে ভেড়াটি কেনা হয়। দুদিন এরই মাংসভক্ষণ চলেছে। চামড়াটাও ফেলা হবে না। দুদিনের রোদ পেয়েই শুকিয়ে 'ট্যানড্' হয়েছে। পথে ওদের আসনের কাজে ব্যবহার হবে, তাই সঙ্গে নেবে।

বেলা এগারোটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া সেরে যাত্রার জন্য সবাই প্রস্তুত।

বিদায় জানাতে স্থানীয় অনেকে এসেছেন। বাংলোর চৌকিদারও খাতা এনে প্রতিদিনের এক টাকা হিসাবে চার দিনের ভাড়া নেয়। বন বিভাগের বিশ্রামভবনে থাকবার কোন ভাড়া লাগে না, অতিথি হিসাবে যাত্রীকে অনুমতি পত্র দেওয়া হয়। জেলা পরিষদের বাংলো ব্যবহার করার অনুমতিপত্র থাকলেও এই নামমাত্র ভাড়া।

ব্রহ্মচারীজি বলেন, সুধীরবাবু, যাত্রার আগে সবাইকে নিয়ে একটা ফটো তোলা যাক্। কতো বড় শুভযাত্রা!

বাংলোর আঙিনায় দলের সকলে ও গাইড্রা সারি বেঁধে দাঁড়ান। সুধীর কিচ্-এর হাত থেকে বন্দুকটা চেয়ে নেয়। বলে, আমি দাঁড়াই বন্দুক ধরে। তিব্বত চলেছি,—সহজ ব্যাপার?

প্রেমসিং আজ আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না, জরুরী কাজে এখানে আটকে গেছেন।

স্বামিজীকে বলি, শেষ পর্যন্ত যাবে তো?

তিনি বলেন, না, তা' যাবে। এরা কথা দিলে কথা রাখে। তাঁর মালপত্র

আমাদের সঙ্গেই চলেছে। কাল কালাপানি বা সংচামে আমাদের ধরবেন বলেছেন। লিপুলেখ পার হবার সময়ে ওঁকে সঙ্গে পেলে অনেকটা ভরসা পাওয়া যায়,—থাকবেন বলেছেনও।

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, স্বামিজী, আমাদের সঙ্গে ঐ যে লোকগুলি যাবে, ওদের সব চেনেন নাকি ?

অনুভবানন্দজি বলেন, সকলকে নয়, অধিকাংশই চেনা। ডেকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

বিচ্ ও রঞ্জন ত হাজির ছিলই। যাত্রার জন্য তারাও বেশভূষা করে এসেছে। গায়ে পুরানো চামড়ার ভারী জুতা। পরনে গরম পট্টুর পায়জামা —নেপালী ধরনের। শার্টের উপর ওয়েস্ট কোট। তার উপর বুক-খোলা কোট,—দেখেই বোঝা যায় কোন শহরবাসী যাত্রীর এক সময়ে উপহার দেওয়া। রঞ্জনের মাথায় ভেড়ার লোমের তৈরি রঙিন তিব্বতী কানঢাকা টুপি। কিচ্ কোথা থেকে পুরনো বিলাতী ফেল্টক্যাপ সংগ্রহ করেছে,— মাথায় তাই পরেছে। টুপির পিছন দিকে লাল-নীল রঙের কাপড়ের টুকরা বাঁধা, বাতাসে দুলছে। প্রশ্ন করে জানি, শুভ যাত্রার মাঙ্গলিক চিহ্ন,—পথে কোন প্রেতাত্মার কোপদৃষ্টি পড়বে না। সুধীর শুনে হেসে বলে, এদের দেখছি ভূত-প্রেতের আতঙ্ক ভূতে-পাওয়ার মতই ঘাড়ে চেপে থাকে। কিন্তু রঙের বাহারে মানিয়েছে চমৎকার।

বিচ্-এর কোটের তলায় কোমরে-বাঁধা একটা নেপালী খুকরি উঁকি মারে। বলে, পথে কতো রকমের কাজ দেবে, দেখবেন।

গলা-বন্ধ লম্বা কোট পরা এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ায়। হাতে প্রকাণ্ড হুঁকা। তাতে-লাগানো লম্বা নলে মুখ দিয়ে অবিরাম ধূমপানে রত। লোকটির দাড়ি নেই,—গোঁফ আছে। অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে গোঁফের চুলে তামাটে রঙ ধরেছে। তিব্বতীদের মতন মাথায় বেণী না থাকলেও মুখে চোখে তিব্বতীয় প্রভাব। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, তামাকের গন্ধ ভেদ করেও সুরার তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

স্বামিজী বলেন, এ হোল তাসি নাঙ্গেল। আমাদের 'স্মার্ট' গাইড্ রুকুমের বাবা। দেখলে বিশ্বাস হয় ? এও সঙ্গে চলেছে। অভিজ্ঞ লোক, হুঁশিয়ারও, অবশ্য যতক্ষণ হুঁশ থাকে। তবে, তাকলাকোট ছাড়বার পর ত আর ও সবের সুবিধে পাবে না,—সঙ্গে যেটুকু থাকবে।

তারপর যার পরিচয় পাই, নাম শুনি পেম্বা। সুধীর বলে, না-না, যেরকম সুশ্রী প্রেমিকের মত চেহারা ও বেশভূষা ওর নাম থাক্ প্রেমুয়া!

প্রেমুয়ার বয়স ২২।২৩ বছর। তবুও দাড়িগোঁফের কোন রেখা নেই। ফরসা গোলাপী রঙ, সাহেবদের মতন। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। পরনে লাল টক্‌টকে তিব্বতী আলখাল্লা। পায়েও প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তিব্বতী পশমী জুতা,—তারও লাল রঙ। মাথায় তিব্বতী ভেড়ার লোমের টুপি,— তাতেও লাল জরি ও সিল্কের বর্ডার দেওয়া, একদিকের ফ্ল্যাপ নামিয়ে একটা কান ঢাকা, অপর কান বার করে রাখা, তাতে প্রকাণ্ড কানবালা, সেখানেও নীল ও সবুজ পাথরের মাঝে লাল প্রবাল। তাকে দেখেই মনে হয় যেন প্রদীপ্ত যৌবনের অগ্নিশিখা।

স্বামিজী বলেন, কিচ্ রঞ্জন রুকুম সিং-এর পর এটিও ভাল গাইড্ হয়ে উঠেছে। ভালই হোল, আমাদের ঘোড়ার সঙ্গে এখানকার সেরা গাইডগুলিও সহিস হয়ে চলেছে। পড়ে রইল শুধু একজন,—তার নাম সিন্দোল। সে এখন এখানে নেই। তাছাড়া, পরের যাত্রীদলের জন্যেও একজনকে অন্ততঃ রেখে যাওয়া উচিত।

আমাদের সঙ্গে আরও যে দুজন চলেছে, তার মধ্যে একজন খাঁটি তিব্বতী —শুধু মাথায় বড় বড় চুলগুলি নেই, দাড়িগোঁফও নেই, যদিও বয়স চল্লিশের কম নয়, দেখতে ছোটখাটো। গায়ে এরও তিব্বতী আলখাল্লা তবে রঙের চটক নেই,—বরং জীর্ণ ও মলিন। আলখাল্লার ভিতর বুকের কাছে একটা হাত দিয়ে মুড়ে ঢুকিয়ে রাখা,—যেন ভাঙা-হাত 'শ্লিঙ'-এ ঝোলে। রুকুম সিং তার পিঠ চাপড়ে পরিচয় করিয়ে দেয়, এর নাম আছে,—আঙ্‌কেল!—বলে মাথা হেঁট করে তার মুখের পানে তাকিয়ে হাসে। আঙ্‌কেলও মুখ তুলে ছোট ছোট চোখ কুঁচকে পিটপিট করে তাকায়, দাঁতের পাটি বার করে হাসে। বোকার মতন। দেখে ধারণা হয় লোকটা পাগলাটে। সেই কারণেই হয়ত কবে কোন এক রসিক যাত্রী 'আঙ্‌কেল' নামকরণ করে যায়। এখন সেই নামেই তার পরিচয়। সবাই ডাকে আঙ্‌কেল বলে। প্রকৃত নাম তার হারিয়ে গেছে। আশ্চর্য লাগে, সে নিজেও জানে না!

অপর সহিস একটি ছোট ছেলে। বছর চোদ্দ-পনেরো বয়স। সম্পর্কে রুকুমের ভাই। জিজ্ঞাসা করি, এ-বাচ্চা যেতে পারবে?

সেই ছোকরাই গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, কেঁও নেই সেকেগা?

তার বেশভূষা ফিটফাট। বুক-খোলা কোটের নীচে নানা-রঙে-রঙীন সোয়েটার। দাদারই হয়ত শাগরেদ তৈরি হচ্ছে।

বেলা সাড়ে এগারোটা। ডাকবাংলো থেকে যাত্রা শুরু হয়।

এ এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের অভিযান। হিমালয়ের যে-অঞ্চলে এখন এগিয়ে চলা,—সেই তুষার-রাজ্যের সঙ্গে এতকাল চাক্ষুষ পরিচয়—বহুদূরে দাঁড়িয়ে। সেই দূরান্তর থেকে মুগ্ধ নয়নে দেখেছি, দিগন্তের কোলে নীল আকাশে মাথা তুলে দীপ্তিমান হিমশিখর শ্রেণী,—'দোলে যেন হংসশুভ্র মেঘের ঝালর'।

আজ চলেছি সেই অজানার সাথে আসন্ন-ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অসীম আগ্রহে। সেই দুর্গম তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করার সঙ্কল্প নিয়ে। শুধু কি তাই? তারপর প্রবেশ হবে তিব্বতে,—যেখানে সেই—আমার কতকালের মানসলোকের মানস-কৈলাস। এতদিন হিমালয়ে যে ভাবে পথচলা, সেখানে আর সেই অভ্যস্ত জীবনধারা নয়, প্রতি পদক্ষেপেই নাকি শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লেশ বোধ। এখন থেকে রাত্রিবাস গৃহকোণে নয়, তাঁবুর আচ্ছাদনে। যে পোষাক পরে এতদিন থাকা, ঘোরা,—সেই বেশ ছেড়ে পরতে হবে ভারী, পুরু একাধিক শীতবস্ত্র। এখন আর নিজদলে একা একা পথ চলা নয়—সঙ্গে চলে বিচিত্রবেশী, বিভিন্ন ভাষী লোকজন, ঘোড়াখচ্চরের দল,—যোগ দেয় ভিন্ন যাত্রীদলও।

পাহাড়ের জনহীন পথে এ যেন এক মিছিল চলে। তাকিয়ে দেখি সেই অভিনব দৃশ্য।

চারিদিকে অত্যুচ্চ তুষারশিখর। তারই পাদদেশে গ্রাম। লোকালয় ছাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত। সেই চাষের জমির বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথের সরু রেখা। ধীরে ধীরে নেমে যায় নীচে কালীনদীর ধারে। শিলাকীর্ণ সেই পথ ধরে সারি সারি যাত্রীদলও নামে। দূরপথের পথিক, তাই ধীর মন্থর গতি।

দূরে পুরোভাগে চলেছেন দুজন কর্ণাটী। গত দুদিন থেকে এঁরাও আমাদের যাত্রার দিনের খবর নিচ্ছিলেন। তাঁদের একজন ঘোড়ার পিঠে বসে চলেছেন। অপরজন পিছনে তাঁদের মালের ঘোড়ার পাশে হাঁটছেন। পিছু পিছু চলেছে ঘোড়ার সহিস। এর পরই সেই মাদ্রাজীর দল। দুজনেই পদব্রজে। সাধুজি এগিয়ে, পিছনে গেরুয়াবাস গৃহী। এঁদেরও সঙ্গে একটি মালবাহী ঘোড়া ও তার সহিস। তারপরই আমাদের মালপত্রের দ্বাদশ

অশ্ববাহিনীর দীর্ঘ লম্বা সারি। পাশে পাশে তিনজন চালক সতর্ক দৃষ্টি রাখে,—শ্রেণীভঙ্গ না হয়। এদের পিছনে আমাদের চড়বার পাঁচ ঘোড়া, এখন আরোহী বিহীন। ঘোড়াগুলির গলায় ও মাথায় সেই লাল নীল রঙের ঝালর চলার ছন্দে ও বাতাসে দোলে, গলার ঘণ্টাগুলিও টুংটাং শব্দ তোলে। যেন শোভাযাত্রার বাজনা বাজে।

অশ্বসারির পিছনে চলে দীর্ঘদেহী কিচ্ ও রঞ্জন। কিচ্-এর কাঁধে প্রকাণ্ড লাঠি, রঞ্জনের এক কুঠার। সকলের শেষে রুকুমের পিতা। হাতে হুঁকা, মুখে নল। মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়ে। সঙ্গে এক বৃদ্ধা। শুনি, রুকুমের মা। স্বামী-পুত্রকে বিদায় দিতে খানিক এগিয়ে চলেছে। রুকুমও তাদের নিকটে। দুটি কুকুরও পাছু পাছু চলেছে। প্রকাণ্ড তিব্বতী মাসটিফ। শুনি, একটি আমাদের সঙ্গে যাবে।

পাটোয়ারীজি ও গ্রামবাসী অনেকেই আমাদের পাশে পাশে চলেছেন এগিয়ে দিতে। কালীনদী পর্যন্ত তাঁরা যাবেন। আমাদের পিছনে ভান্‌সিং আসে। তাকে ঘিরে চলে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়ের দল। সুধীর বলে, ওকে কতকগুলো লজেন্স দিয়েছি বিলোতে।

মাইলখানেকের মধ্যেই নদীর ধারে পৌঁছুই। নিরাপানির পাহাড়-অঞ্চলে দেখা কালীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তি এখন আর নেই, গতিশীলা পার্বত্য নির্ঝরিণীর চির-চেনা রূপ। নদীর উপর কাঠের ছোট পুল। পাটোয়ারী ও অন্যান্য সকলে অভিবাদন করে শুভ-কামনা জানিয়ে গ্রামে ফিরে যান। পুল পার হয়ে আমরা নেপালে প্রবেশ করি। সেই দিক দিয়ে এখন কিছু দুর পথ। এধারেও ভোটিয়ারা চাষ করে, পাহাড়ের গায়ে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। পথের দুপাশে মাঝে মাঝে বন্যগোলাপের জঙ্গল। লাল ও সাদা ফুলের স্তবক বনভূমি আলো করে রেখেছে। ফুলগুলির পাঁচটি করে পাপড়ি।

খানিকটা চড়াই উঠতে হয়, কিন্তু ওঠার কষ্ট হয় না। ধীরে ধীরে পথ ওঠে। স্নিগ্ধ শীতল আবহাওয়া। হেঁটে চলতে মন আনন্দ পায়। সামনে কি ওখানে লোকালয়? কাছে পৌঁছে দেখি, না, ঘরগুলির শুধু পাথর সাজানো দেওয়াল, মাথার উপর আচ্ছাদন নেই। মনে পড়ে, বালুয়াকোটে গ্রামের বাইরে ভোটিয়াদের সেই ঘরগুলি। অনুভবানন্দজি বলেন, তাকলাকোটে এ ধরনের বহু ঘর দেখতে পাবেন। এখানে এগুলো হোল ভোটিয়াদের এ-অঞ্চলে চাষ-আবাদের সময় দু'তিন মাসের সাময়িক আস্তানা।

নীচে কিছু দূরে কালীনদীর সঙ্গে অপর এক নদীর সঙ্গম দেখা যায়। সে নদীর নাম শুনি, কুটি। দেখতে কালীর চেয়ে অনেক বড়, জলভারও বেশি। তবুও হয়ত নামের মাহাত্ম্যে সংযুক্ত ধারার নাম থেকে যায় কালী।

অনুভবানন্দজি বলেন, কুটি নদীর উপত্যকাতেও বিয়াসপট্টি,—বিয়াসী ভোটিয়াদের বাস। ওদিকের বড় গ্রামের নামও কুটি। সেদিক দিয়েও তিব্বতে যাবার পথ আছে,—লামপিয়া পাশ (১৮,১৫০ ফুট) পার হয়ে দরমা পাশ দিয়ে যে-পথ, তারই সঙ্গে মিলেছে। এখন চলুন, আমাদের আবার কালীর অপর পারে যেতে হবে—ঐ পুল এসে গেছে।

পুল পার হয়ে আবার বৃটিশ ভারতে ফিরে আসি। কালীনদীকে এখন যেন আর চেনা যায় না। সেই উদ্দাম বেগ নেই, দিগন্ত মুখরিত গর্জনও নেই। শান্ত সৌম্য মূর্তি, মৃদু মধুর কলধ্বনি।

এপারে এসেও বনভূমির মধ্যে দিয়ে পথ। অদূরে নদী। সানন্দে এগিয়ে চলি। মাইল দুয়েক যাবার পর রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেলার আয়োজন হয়, যদিও বেলা এখন সাড়ে তিনটে। স্বামিজী বলেন, কারণ কি, এখনি দেখতে পাবেন।

গার্বিয়াঙ্ থেকে আজ প্রায় আট মাইল আসা হয়েছে। ঘোড়া সঙ্গে থাকলেও অল্পক্ষণের জন্যই চড়েছি। পায়ে হাঁটার অনেক সুখ। তার উপর, পথও আজ দুরূহ ছিল না। শুধু এক জায়গায় চড়াই-এর মুখে পাহাড়-ধসার ফলে পথের পরিসর সঙ্কীর্ণ হওয়ায় সতর্কতার সঙ্গে পার হতে হয়েছিল। পথ সুগম হলেও কেবল ব্রহ্মচারীজিই ঘোড়া ছাড়েন নি। বলেন, সঙ্গে যখন চলেছেই, খালি-পিঠে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার কোন অর্থই নেই।

যে বনশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে আজ এলাম, এর নাম শুনি নাস্তির জঙ্গল। কোন কালে কার দেওয়া নাম জানি না। কিন্তু দেখি, নামকরণের সার্থকতা আছে। সামনে এসে গেছে বরফের পাহাড়, তারই কোলে থমকে দাঁড়িয়ে গাছগুলি যেন পথিককে বলে, আর না, এইখানেই থেমে গেলাম আমরা। আর আমাদের দেখা পাবে না। গিরিরাজের তুষার-মহলের দ্বারদেশে ঐ দেখ প্রস্তরফলকে নিষেধ আজ্ঞা : বনস্পতির প্রবেশ নাস্তি। কৈলাস-যাত্রা শেষ করে ফিরে এস, আবার তখন দেখা হবে।

অনুভবানন্দজি বলেন, এইবার বুঝতে পেরেছেন কেন আজ বেলা থাকতেও এখানে তাঁবু গাড়া? তিব্বতে যে অঞ্চলে চলেছি, সেখানে গাছপালার

অভাব, জালানী কাঠও তাই মেলে না। এই নাস্তির জঙ্গল থেকে যেটুকু পারা যায় সংগ্রহ করে সঙ্গে রাখা। নিয়ে যাওয়ার ঝঞ্ঝাট আছে, খরচাও হয়। গার্বিয়াঙ্ থেকে ঘোড়াওয়ালাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে আসতে হয়েছে, প্রত্যেক ঘোড়ার পিঠে দু'চারটে করে কাঠ চাপানো হবে।

মনে পড়ে যায়, কিচ্ ও রঞ্জনের সঙ্গে রাখা সেই কুড়ুল ও ভোজালির কথা।

বনের প্রান্তে তাঁবু পড়ে।

চারি পাশে আকাশচুম্বী পাহাড় মাথা তুলে ঘিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরই দুইটি শিখরের তুষাররাশি অপরাহ্ণ সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁবুর আশপাশে ছোট বড় নানান্ আকারের চারাগাছ। বিবর্ণ শুষ্কদেহ,—জরাজীর্ণ লোলচর্ম বৃদ্ধের মত। নির্মম শীতের দেশে কোনমতে পৃথিবীর বুকে অস্থিচর্মসার শিকড়গুলি আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধ বৃক্ষরাজির পাদদেশ ঘিরে দিকে দিকে নবজাতকের মধুর কলধ্বনি। বনভূমির অঙ্গ বেয়ে চতুর্দিক থেকে অগণিত ক্ষুদ্রতনু ঝরনাধারা নেমে আসে, কালীনদীর কোলে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাতাসে অবিরাম জলের কলকল ছলছল শব্দ। যেন, কোন বনদেবী অলক্ষ্যে জলতরঙ্গ বাজান। নদীর তটে, প্রবাহ পথেও রাশি রাশি শিলাখণ্ড মাথা তুলে স্তব্ধ হয়ে সেই সঙ্গীত শোনে।

প্রকৃতির এই অপরূপ পরিবেশে রাত্রিবাসের পঞ্চশিবির।

আমাদের তাঁবু তিনটি, মাদ্রাজীদের একটি, কর্ণাটীদের আরেকটি। জনশূন্য অরণ্যের মাঝে হঠাৎ আসা কয়টি মানুষের সাড়া ওঠে, কর্মব্যস্ততা দেখা দেয়। যেন, মৌচাক ঘিরে মৌমাছি ওড়ে, মধুও আনে। দেখি, আধঘণ্টার মধ্যেই ভান্‌সিং চা নিয়ে হাজির,—সঙ্গে চুরমা, সকালের ভাজা পুরি, গরম পাঁপরসেকা।

শৈলাসনে বসে জলযোগ সারি। এবার দেখতে চলি সহযাত্রীদের তাঁবুগুলি।

মাদ্রাজীদের ছোট্ট তাঁবু। তাহলেও, দুজন শোবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে ভিতরপানে তাকাই। গৃহী মাদ্রাজী তাঁদের দুজনের সামান্য মালপত্র একপাশে সাজিয়ে কম্বলশয্যা পাতছেন, সন্ন্যাসী সঙ্গী একটা পাত্রে অনেকখানি ছাতু জল দিয়ে মাখছেন। দেখেই মনে পড়ে,

গার্বিয়াঙ থেকে অনুভবানন্দজির অতো ছাতু সঙ্গে আনার উদ্দেশ্য। আগুনের প্রয়োজন থাকে না, জলটুকু পেলেই হোল। বুঝতে পারি, আজ রাত্রে এঁদের এই আহার। সন্ন্যাসী মুখ তুলে একবার তাকান, আবার আপন কাজে মন দেন।

গৃহী মাদ্রাজী দেখতে পেয়ে হাসেন, কম্বলের উপর হাত চাপড়ে ইসারা করে ভিতরে ঢুকে বসতে বলেন। বলি, না; এখন আর বসব না, ঘুরে ঘুরে দেখছি,—কিন্তু তখনি অবাক হয়ে যাই, তাঁবুর এককোণে তৃতীয় এক ব্যক্তি গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে আমার দিকে উঁকি মারেন। ইনি আবার কোথা থেকে এলেন? গার্বিয়াঙে বা পথে দেখি নি তো!

এখন জানতে পারি, তিনিও কৈলাসযাত্রী। গার্বিয়াঙ থেকে আসার পথে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। সঙ্গে কোন মালপত্র নেই, সঙ্গীসাথীও নেই। গায়ে ঐ একখানা কম্বল জড়িয়ে একাই চলেছেন। মাদ্রাজীরা তাঁকে সাদরে ডেকে নিয়েছেন, কথা দিয়েছেন তাঁদের তাঁবুতে থাকতে দেবেন, খাদ্যও যা আছে, ভাগাভাগি করে খাবেন।

নবাগত ব্যক্তিটির চেহারা তাঁবুর অস্পষ্ট আলোকে বোঝা যায় না, তবে ভাঙ্গা ধরা গলায় পরিষ্কার হিন্দীতে জানিয়ে দেন, তিনি সর্বত্যাগী সাধু। সঙ্গের লোটা কম্বলই তাঁর সম্বল। এই নিয়েই তিনি কৈলাস যাবেন।

শুনে ভাবি, বললেন ত যাবেন, কিন্তু এভাবে যাওয়া কি সম্ভব? তবে, সাধু-সন্ন্যাসীর ব্যাপার, কী জানি!

এগিয়ে যাই কর্ণাটীদের তাঁবুর দিকে। তাঁদেরও ছোট্ট তাঁবু। দুজনেই তাঁবুর বাইরে। সুমুখে পাথর সাজিয়ে উনুন পেতে আগুন জালিয়েছেন। একজন রান্না চাপিয়েছেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি রান্না হচ্ছে? 'খিচড়ি'। অপরজন আগুনের পাশে বসে একটা কাগজে কি যেন লিখতে ব্যস্ত। ইনিই ঘোড়ায় চেপে আসছিলেন। মধ্যবয়সী ভদ্র ব্যক্তি। বিশুদ্ধ হিন্দীতে কথা বললেন। দেশভ্রমণে তাঁর অসীম আগ্রহ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরেছেন। একাই বার হন। এবারও তাই হয়েছেন। সঙ্গের ঐ যুবকটি? তাঁর 'দেশওয়ালী' হবে কেন? ওর ঘর আলমোরায়। সেইখানে এসে তাঁকে যোগাড় করেছেন। সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাঁর রান্নাবান্না কাজকর্ম করে দেবে।—ভদ্রলোক দেখি বেশি বাক্যালাপে উৎসুক নন্, লেখায় আবার মন দেন। দৈনিক হিসাব, না, কাব্যরচনা? আমিও চলে আসি।

আমাদের তাঁবুর পিছনে সহিসদের ও গাইডদের তাঁবু। কলকাতা থেকে সঙ্গে আনা সেই বড় তাঁবুটা। খোলা মুখটাতে একটা কম্বল টাঙ্গানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এখানেও তাঁবুর বাইরে পাথর সাজিয়ে উনান পাতা। প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করেছে। দাউদাউ করে আগুন জলছে। প্রকাণ্ড একটা ডেকচিতে সবুজ শাকের মত কি যেন টগবগ করে ফুটছে। প্রশ্ন করে যা শুনি, তাতে স্তম্ভিত হই,—বিছুটির পাতা সিদ্ধ হচ্ছে। বিছুটির জঙ্গল লোপের মহৎ-উদ্দেশ্য নয়, কোন আয়ুর্বেদীয় ঔষধের পরিকল্পনাও নয়, মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই এই অভিনব আয়োজন। কিচ্ বোঝাতে চেষ্টা করে, এর ব্যঞ্জন নাকি অতি উপাদেয়!

মনে পড়ে যায়, এক ভোজনবিলাসীর সগর্ব মন্তব্য, আমি খাই না কী, শুনতে চাও? চারপেয়ের মধ্যে—খাটিয়া, আর যা' ওড়ে তার মধ্যে ঘুড়ি!

আগুনের চারপাশ ঘিরে সকলে বিশ্রাম করছে। কেউ শুয়ে, কেউবা বসে। রুকুমের বাবার হাতের হুঁকার কলকেতে আগুন অনির্বাণ জলছে। মুখ থেকে নল সরিয়ে মৃদু হেসে নিমন্ত্রণ জানায় তাদের খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করতে। কিন্তু খেতে সাহস হয় না। বিছুটির নামের 'মহিমা' ত আছেই, তার উপর সবুজ পাতার মাঝে লঙ্কার সহস্র রক্তচক্ষু সাবধান করতে থাকে, পাহাড়ীদের যা খাদ্য, বাঙালী উদর তার কাছে ততখানি উদারতা নাও পেতে পারে!

এদের এই বিছুটি-পাক পথের আর একদিনের এক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলমোরা থেকে গার্বিয়াঙ আসার পথে এক জায়গায় পোর্টারদের মধ্যে একজনের হঠাৎ প্রবল জর দেখা দেয়। অতিরিক্ত রৌদ্রভোগ অথবা অপরিসীম পরিশ্রম এর কারণ হতে পারে। বেচারী জরের ঘোরে আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, তবুও তারই ভিতর ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে—ম্যালেরিয়া রোগীর মত। গুঁ-গাঁ শব্দ করে। ব্রহ্মচারীজির কাছে খবর যেতেই চলে আসেন, দেখেন, ঔষধ দেন। পোর্টারদের সেই এক চক্ষু সর্দার—'মেট্'—কিন্তু গম্ভীরবদনে রায় দেয়, না ব্রহ্মচারীজি, এ বেমারির ও দাওয়াই-এ কাম হবে না, এর দুসরা দাওয়াই আছে।—বলে আর এক পোর্টারকে ডাক দিয়ে কি যেন আদেশ করে। অল্প পরে রোগের অত্যদ্ভুত চিকিৎসা চলে। প্রথমে রোগীর দেহের কম্বল সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে মেট্ কিছুক্ষণ

ঝাড়ফুঁক করে, তারপর কি এক গাছের পাতাসমেত ডাল এনে তাই দিয়ে তার সারা অঙ্গে নির্মমভাবে চাবকাতে থাকে।

শুনি, বিছুটির ডাল!

মেট্ এক চোখ কুঁচকে অবিচলিত কণ্ঠে বলে, একে দানোয় পেয়েছে,—এই এর দাওয়াই। তারপর, পূর্ণ উদ্যমে সেই পাশবিক চিকিৎসা আরও কিছুক্ষণ চলে।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখি, ব্রহ্মচারীজির ঔষধের গুণেই হোক, অথবা দেহগত স্বভাবধর্মেই হোক, কিংবা, কী জানি, বিছুটির তাড়নাতেই হোক, রোগীর জর ছেড়েছে, স্বাভাবিকভাবে সে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

মেট্ গম্ভীরভাবে তার বদ্ধমূল অভিমত জানায়, এ তাদের তাজ্জব দাওয়াই।

ভাবি, ভাগ্যে আমাদের দেশের ডাক্তার কবিরাজরা এই অমোঘ ঔষধটির এখনও সন্ধান পান নি!

আজ বিছুটির ব্যঞ্জন দেখে তাই মনে হয়, অভিশপ্ত বিছুটির হিমালয়ে জন্মগ্রহণ সার্থক হয়েছে।

বিছুটির তরকারির পাশে আগুনের উপর আর এক প্রকাণ্ড ডেকচিতে রঙীন তরল পদার্থ ফুটছে। শুনি, তিব্বতী চা।

সকলের সমুখে একটি করে কাঠের গোলাকার পাত্র,—বড় বাটির মত। কাঠের হাতা করে সেই ফুটন্ত চা ডেকচি থেকে সেই পাত্রে তুলে নিয়ে সবাই তৃপ্তিসহকারে পান করছে। কেউ কেউ সেই চায়ের সঙ্গে ছাতুও মেশাচ্ছে। এতে চিনি বা দুধের সংযোগ থাকে না,—পাবেই বা কোথায়? থাকলে, মাখন মেশায়। এ-চায়ের এমনি গুণ, বেশীক্ষণ ফোটাবার ফলেও লাল রঙ কালো হয় না। মনে পড়ে, একটা বই-এ পড়েছি, তিব্বতে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি নেই। চীনদেশের ইট-আকারের চা (Chinese brick tea) জলপথে ভারতে এসে হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যায়, তিব্বতীয়রা সেই চা ব্যবহার করে। প্রতি বছর এইভাবে দশ হাজার এগার হাজার মণ চা তিব্বতে চালান যায়। তিব্বতীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চা পান করে বলে প্রসিদ্ধি। এক একজন তিব্বতী দিনে গড়পরতা চল্লিশ থেকে ষাট কাপ চা পান করে। Roof of the world-এ বসে এই অঢেল চা-পান সম্ভবতঃ অত্যাবশ্যক বিলাস। এদের চা-পানের প্রথা ও মজলিস না দেখলে

বিশ্বাসই হয় না প্রতিজন এত চা খায় কি করে। দুর্দান্ত শীতের দেশে আগুনের চার পাশ ঘিরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা পান চলে, চায়ের সঙ্গে ছাতু ইত্যাদি মিশিয়ে খাদ্যেও রূপান্তরিত হয়। টেবিল না থাকলেও চায়ের-টেবিলের গল্পের সেখানেও অভাব থাকে না। গল্পগুজব ও হাস্য-বিদ্রূপে বিশ্রামের আসর সরগরম হয়ে ওঠে।

এখানেও দেখি, সেই আঙ্‌কেলকে নিয়ে রুকুম সিং কি যেন পরিহাসে মেতে আছে। আঙ্‌কেলের মুখে কিন্তু বিরক্তির চিহ্ন নেই। সেই পাগলাটে হাসি। আচরণও সার্কাসের ক্লাউনের মত।

কেবল একজনই এই দলছাড়া। প্রেমুয়া অল্প দূরে একটা পাথরের উপর বসে একমনে কি যেন করছে। কাছে গিয়ে দেখি, কোথা থেকে একটা ছোট কাঠ কেটে এনেছে, ছুরির সাহায্যে তাতে ফুটা তৈরি হচ্ছে। নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে ফুঁ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে,—বাঁশি হবে। মাথা নেড়ে বুঝতে পেরেছি জানাতে বড় বড় দাঁত বার করে হাসতে থাকে।

আমাদের রন্ধনশিবিরেও উঁকি মারি। এ কী! ব্রহ্মচারীজি উনুনের পাশে খুন্তি হাতে! সুরেন্দ্র মহারাজ সহাস্যে বলেন, আজ উনিই রাঁধবেন বলছেন, ভান্‌সিং সাহায্য করছে।

ব্রহ্মচারীজি বলেন, লিপুলেখের তলায় পৌঁছেও আজ রাত্রের পাতে কি 'মেনু', দেখবেন'খন।

তখনও দিনের আলো রয়েছে। তাই, নিজেদের তাঁবুর ভিতর ঢুকি না। বনতলে ঝরনাধারার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ খস্‌খস্ শব্দে চমকে উঠি। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি। নাঃ,—কোন বন্য জন্তু নয়; ওদিকপানে আমাদের ঘোড়াগুলি চরে বেড়াচ্ছে। তারাও খাদ্যের সন্ধানে ঘোরে।

ভাবি, বিশ্ববিধাতার এ কী নিষ্করুণ অখণ্ডনীয় বিধান। প্রাকৃতিক রূপসম্ভার চক্ষের তৃষ্ণা মেটায়, অন্তরে আনন্দ ও তৃপ্তি আনে, কিন্তু দেহধারীর উদরের ক্ষুধা-নিবৃত্তির প্রয়োজন হয় জগতের সর্বত্র,—এখানেও।

আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে বিকাল কেটে যায়। সন্ধ্যার আঁধার নামার আগে তাঁবুতে ফিরি।

ব্রহ্মচারীজিও রন্ধনকার্য শেষ করে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সকলে মিলে গল্প জমে। হঠাৎ তাঁবুর মুখে কারা এসে দাঁড়ান, হেঁট হয়ে উঁকি দেন। সেই গৃহী মাদ্রাজী, সঙ্গে নবাগত সাধু। ভিতরে ঢুকে বসতে বলা হয়। কদিন

আগে পথে কোথায় পড়ে গিয়ে মাদ্রাজীর পায়ে পাথরে চোট লাগে। আঘাত সামান্যই, তবুও সামনে তিব্বতের কঠিন পথ, সাবধান হওয়া ভাল। তাই ঔষধের সন্ধানে তাঁর আসা। ব্রহ্মচারীজির অনুমতি নিয়ে সুধীরই তাঁর চিকিৎসা করে। আইওডিন ও আইওডেক্স সঙ্গে মজুদ থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।

সাধুজিটির আগমন ভিন্ন উদ্দেশ্যে। স্বামিজীদের কাছে সন্ধান নেন, নেশা-টেশা কিছু আছে কিনা। গায়ে-জড়ানো কম্বলটা খুলে দেখান, খালি গা, পরনে হাঁটুঝুল খাটো একটা কাপড় মাত্র। জুতা, মোজার কথাই ওঠে না। বলেন, এই ঠাণ্ডার দেশে একটু নেশা পেলে দেহ গরম হয়।

নেশার সাহায্যেই যে তাঁর এতকাল শরীর গরম রাখার অভ্যাস,—কণ্ঠের কর্কশ স্বর তার অকাট্য সাক্ষ্য দেয়।

ব্রহ্মচারীজি দয়াপরবশ হয়ে একটা সিগার বার করে দেন। অন্য কিছুর অভাবে তাতেই সাধু মহাখুশী।

সাধুটির বয়স অল্প। মনে হয় বছর পঁচিশ হবে। সামান্য দাড়িগোঁফ। মাথায় জটার মত লম্বা চুল। দেহ শীর্ণ না হলেও তেমন সবল দেখায় না। তবে মনে নিশ্চয় অসাধারণ বল ধারণ করেন এবং অসীম কষ্টসহিষ্ণু ত বটেই, না হলে এমনভাবে বিবস্ত্রদেহে, নগ্নপদে হিমালয়ের এই দীর্ঘ দুর্গম পথ নিঃসঙ্গ এলেন কী করে? কিন্তু দুদিন পরেই লিপুলেখের বরফ, তারপর তিব্বতের দুর্দান্ত শীত। এভাবে কি যেতে পারবেন? তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। সাধুজি কিন্তু ভয়-ভাবনা শূন্য। কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে উত্তর দেন, আমি কি আর স্ব-ইচ্ছায় কৈলাস চলেছি? কেদার বদরী তীর্থ করে রাণীক্ষেতে পৌঁছে রাত কাটাচ্ছি, স্বপ্নে দেখি কৈলাসপতি ডাকছেন, অমনি চলে এলাম এই পথে। যিনি ডেকে নিয়ে চলেছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

অনুভবানন্দজি বলেন, মুখের বড় বড় বচন শুনে লাভ নেই, ও-সব অনেক শুনেছি, বহু দেখেছি। পরন্তু ঐভাবে খালি পায়ে বরফের ওপর দিয়ে বেচারী ত যেতে পারবে না, দলে যখন এসেই পড়েছে, ব্যবস্থা কিছু করতেই হয়।

ব্রহ্মচারীজি সিগারে টান দিয়ে বলেন, আমিও তো তাই ভাবছি।—বলে তখনি বিছানার পাশে রাখা ঝোলা খুলে তাঁর আনা অতিরিক্ত একজোড়া জুতা সাধুটিকে দেন। এক জোড়া গরম মোজারও ব্যবস্থা হয়।

সুরেন্দ্র মহারাজ বলেন, এইবার খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা যাক।

ভানুসিং তাগাদা দিয়ে গেছে।

খেতে বসে 'মেনু' দেখে সুধীর বলে, চিরকাল শুনে এসেছি হিমালয়ের পথে নাকি খাওয়ার কষ্ট, কিন্তু ব্রহ্মচারীজির মত সঙ্গী পাওয়ায় আমাদের অভাব ত দূরের কথা, এই বরফের রাজ্যে পৌঁছেও রীতিমত ভোজনবিলাস ভোগ করছি, —গরম গরম ভাত, ঘি, শাকভাজা, আলু-পিঁয়াজ দিয়ে ডাল, ডিমের ডালনা, চাটনি, পাঁপর সেঁকা।—এ ত নিমন্ত্রণের ভোজ।

আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করলে অনুভবানন্দজি বলেন, সুধীরবাবু, থুলমা বার করা হয়েছে, আজ ব্যবহার সুরু হবে, শুধু কম্বলে আর এখন থেকে শীত ভাঙবে না।

গার্বিয়াঙ থেকে সেই ভেড়ার লোমের চুটকা বা থুলমা আনা হয়েছে, ব্রহ্মচারীজি ও দুই স্বামিজীর জন্ম ছোট তিনটা, আর আমাদের দুজনের প্রকাণ্ড বড় একটা।

আমরা দুজনে নিজেদের কম্বল গায়ে চাপিয়ে শুয়ে পড়ার পর রুকুম সিং-এর সাহায্য নিয়ে স্বামিজী আমাদের গায়ের উপর সেই থুলমা বিছিয়ে দেন। সুধীর বলে ওঠে, করছেন কী? এ কি ভীমভবানী পেয়েছেন যে বুকের ওপর হাতি চাপিয়ে সার্কাসের খেলা দেখাব?

প্রকৃতই অত্যধিক ভারী। গায়ের উপর রেখে পাশ ফেরবার উপায় থাকে না, দু হাত দিয়ে একটু উঁচু করে ধরে তবে দেহ ঘোরানো চলে। গায়ে চাপিয়ে দিতেই মনে হয় যেন গোটা দশেক জীবন্ত ভেড়া জড়সড় হয়ে আমাদের দুজনের দেহ আবরণ করে বসেছে। যেমন ভারী, তেমনি বিকট গন্ধ। সেই দুর্ভেদ্য লোমশ আচ্ছাদন ভেদ করে শীতের সাধ্য কী।

তাই বুঝিবা শীতের সহায়তায় মধ্যরাত্রে বৃষ্টি নামে। কোথা দিয়ে তাঁবুর ভিতর জল ঢোকে; দেখি, থুলমা বর্ষাতিরও কাজ দেয়। কিন্তু, অনাবৃত মালপত্র জলসিক্ত হয়ে যায়।

॥ ২ ॥

সকালেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অনুভবানন্দজির মুখমণ্ডলেও দুর্ভাবনার মেঘভার। বলেন, তাই ত সুধীরবাবু, এমনটি ত কথা ছিল না; লিপুলেখের কাছে এসে আবহাওয়ার মেজাজ খারাপ দেখব! তা' হোক্, কি বলেন? কৈলাসপতির যা' অভিলাষ তাই হবে। একবার প্রাণ খুলে বোল ছাড়ুন, জয় কৈলাসপতি!

ওদিকে তাঁবুর বাইরেও যাত্রীদের প্রস্তুতির সাড়া জাগে। পাকশালায় ভানুসিং রান্না চড়ায়। সুরেন্দ্র মহারাজ ভাঁড়ার বার করে দিয়ে আবার বাক্স থলি বন্ধ করেন। কিচ্ ও কুকুম সিং গতরাত্রের বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া জিনিস-পত্র বাইরে বার করেছে। স্তূপীকৃত কাঠে আগুন জ্বালিয়ে সেগুলি যথাসম্ভব শুকিয়ে নেবার চেষ্টা চলেছে। সহিসরাও ঘোড়াগুলিকে সাজসজ্জা পরিয়ে তৈরি করতে ব্যস্ত। আমরাও যে-যার প্রস্তুত হই।

বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটে খাওয়া দাওয়া সেরে সকলে আবার যাত্রা সুরু করি।

কালীনদীর ধার দিয়ে পথ। কখন বা নদীর তীর ছেড়ে কিছু চড়াই। আজ পাঁচজনই ঘোড়ায় চেপে চলেছি। তাই দেখে ব্রহ্মচারীজি মহাখুশী। বলেন, এই তো চাই। ঘোড়া আনা হয়েছে, হাঁটবেন কেন?

কিন্তু মাঝে মাঝে কোথাও নেমে আমাদের হাঁটতেও হয়। পথের উপর এক এক জায়গায় এমনি ছোট বড় অসংখ্য পাথর ছড়ানো, তার মধ্যে পা ফেলে ঘোড়ারও ডিঙিয়ে চলতে অসুবিধা হয়, আবার একটু বড় পাথর সুমুখে পড়লে ঝাঁকানি দিয়ে তার উপর ঘোড়া উঠে দাঁড়িয়ে পার হয়, আরোহীর দেহ সামনে পিছনে হেলে প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে, তার সামলানো দায়।

সুধীর বলে, এ যে obstacle race দেখছি। এর চেয়ে হেঁটেই এ-সব জায়গা পার হওয়া ভাল।

মাঝে মাঝে মেঘ নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে' চারিপাশ ঝাপসা হয়ে যায়। দেখতে বেশ লাগে। আবছা দেখায়, সারি সারি যাত্রীদল চলে —ছায়ামূর্তির মত—কেউ ঘোড়ায়, কেউ হেঁটে—দূরে ঐ মালবাহী ঘোড়া-গুলি। সাজসজ্জার বর্ণবৈচিত্র্য এখন আর চোখে ধরা পড়ে না,—কানে শুধু বাজে ঘণ্টার টুং টাং শব্দ। হঠাৎ ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামে। রঙ্গমঞ্চে যেন পর্দা পড়ে। সব কিছু চোখের আড়ালে যায়। অল্প পরে আবার বৃষ্টি থামে; মেঘ সরে, আকাশ দেখা দেয়, পাহাড়গুলিও যেন জেগে ওঠে, মৃদুগতি যাত্রীদলের রঙবেরঙের শোভা খোলে।

মাইল দুই যাবার পর কালীনদীর উপর ছোট পুল আসে। আবার অপর পারে নেপালে রাজ্যে প্রবেশ।

সামান্য একটু উঠে গিয়ে দেখা যায়, পাহাড়ের পাদদেশে বড় বড় পাথর— যে পত্থারস্—তারই তলা থেকে দু'তিনটি ঝরনাধারা বেরিয়ে আসে,—

একসঙ্গে মিলিত হয়,—অতি ক্ষুদ্র নদীর আকার ধরে, অল্প নেমে নীচে বড় নদীর সঙ্গে মিশে যায়। এই ঝরনাধারা কালীনদীর উৎসমুখ বলে প্রচারিত আছে। রুকুম সিং বলে, এই ঝরনার জল পাহাড়ের অপর দিক থেকে গুপ্তপথে এসে এখানে বার হয়েছে,—এইখান থেকে স্বরু হোল কালীনদী, আর এই ঝরনার নাম কালাপানি ; এ জায়গাটারও নাম তাই থেকে কালাপানি।

ঝরনার জলের দিকে তাকালে কালাপানি নামকরণের কারণ বোঝা যায়। কালিবর্ণা ঝরনা। কিন্তু, অঞ্জলি ভরে জল তুললেই চোখের ভুল প্রকাশ পায়। সঙ্গদোষে দুর্নাম রটে, এ তারই নিদর্শন।

জলের বর্ণ স্বাভাবিকই ; কালো পাথরের উপর দিয়ে বয়ে আসে, তাই দেখায় যেন কালো জল, নামও হয়ে যায় কালাপানি।

কিন্তু কালীনদীর এইখানে উৎপত্তি বলার কারণ বুঝি না ; এই ক্ষীণকায় প্রবাহ অল্প নীচেই যে নদীর জলে গিয়ে মেশে সে নদী ত স্পষ্টই দেখা যায় লিপুলেখের দিক থেকে নেমে আসে, এই ধারার চেয়ে তার বিস্তার অনেক বেশী, জলভারও অধিক।

রুকুম সিং সে-নদীর নাম বলে লিলিংতী।

যাই হোক, কালীনদীর যখন এইখানেই স্বরু, তাহলে নেপাল রাজ্যের এইখানে শেষ, কারণ কালী হল নেপালের সীমানা।

কালাপনি জায়গাটাতে প্রচণ্ড বাতাস, শীতবোধও হয় বেশী। বারো হাজার ফুট উঁচুতে, হবার কথাই।

কালাপানি ছাড়িয়ে এসে লিলিংতী নদীর কূল ধরে চলা, নদী পার হয়ে দক্ষিণ তীরে আসা। পথ ক্রমশঃই আরও উঠতে থাকে।

বৃক্ষ-সীমা অতিক্রম করে এসেছি, এখন উদ্ভিদ্ জগৎও লুপ্তপ্রায়। চারিপাশে কেবলি রুক্ষ কালো প্রস্তরস্তূপ। মাঝে মাঝে দেখা যায় পাহাড়ের অঙ্গ বিদীর্ণ করে কলস্বনে জলধারা নির্গত হচ্ছে। যেদিকে তাকাই তুষারকিরীট গিরি-শ্রেণী। চারপাশ ঘিরে যেন কারাগৃহের পাষাণ প্রাচীর। এখন আর তুষার-ক্ষেত্র দূরবর্তী নয়। পাহাড়ের মাথা থেকে বরফের অংশ নেমে পথের কাছাকাছি আসে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে-আসা ঝরনার জলধারাও এক এক স্থানে জমাট বরফে পরিণত হয়েছে। যেন ভস্মমাখা সন্ন্যাসীর শুভ্র জটাভার কাঁধ ঘিরে নামে।

মনে হয়, কালাপানি থেকে আরও হাজার খানেক ফুট উপরে আসা

হয়েছে। এই তুষারশিখর বেষ্টিত পাষাণরাজ্যে আচম্বিতে দেখা দেয় মনোরম সমতলভূমি। কচি কোমল সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর। তারই প্রান্তে অদূরে সেই লিলিংতী নদী অল্প নীচে দিয়ে বয়ে চলে। স্বচ্ছ সুনীল তার জলধারা। যেন বিছিয়ে রাখা সবুজ কার্পেটের ঘন নীল বর্ডার। কারুকার্যের এই শেষ নয়। সবুজ কার্পেটের বুকে ও ধারে ধারে নানান রঙের ফুলের নক্‌শা কাটা। পথের পাশপাশে ও মাঠের মাঝে ছোট ছোট চারাগাছ কতো রঙের ফুল ফুটিয়ে আলো করে আছে। নানা জাতির Alpine ফুলের রাশি।

সুধীর বলে, আলমোরায় যোশীদার দেওয়া সেই ঝুড়িতে কিছু ভরে নেওয়া যাক।

বলি, ওভাবে নিলে ততদিন থাকবে না, আর যার যেখানে জন্মগত শোভা, তার সেখানেই থাকা ভাল। একই ফুল,—বাগানের হট্‌-হাউস্‌-এ টবের মধ্যে জন্মানো ও হিমালয়ের এই পরিবেশে ফোটা—রূপের প্রভেদ হয়ে যায় আকাশ-পাতাল।

স্থানটির নাম শুনি নাবিদাং। কালাপানি থেকে মাত্র মাইল চারেক দূর হবে। এখনও বেলা দেড়টা বাজে নি। তবুও এইখানেই রাত কাটানোর আয়োজন হয়।

স্বামিজী জানান, এখান থেকে মাইল দেড়েক এগিয়ে গেলে সংচাম—আরও হাজার খানেক ফুট্‌ উঁচুতে—অর্থাৎ ১৫,০০০ ফুটে। সেইখানেই আজ থাকবার কথা। কিন্তু ঘোড়াওয়ালারা এখন আর সেখানে যেতে রাজী নয়। গতরাত্রের বৃষ্টির পর আজও যেটুকু বৃষ্টি হয়েছে ও আকাশ এখনও যে রকম মেঘে ঢাকা, তাতে সেখানে বরফ পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা, প্রচণ্ড শীত ত হবেই। তা ছাড়া সংচামে ঘোড়ার ঘাসও পাওয়া যাবে না। কথাগুলা ঠিকই। তাই এখানেই তাঁবু ফেলতে বলা হোল। কি বলেন সুধীরবাবু ?

সুধীর বলে, খুব ভাল হোল। থাকবার কারণ যে যাই দেখাক, আমি তো ভাবি, এমন চমৎকার জায়গায় তাঁবু ফেলে রাত কাটানো, এত বড় সৌভাগ্য জীবনে কত জনের হয় ? আজ আর সেই নিরপানির পাহাড়ে সিদ্ধিগাছের ডালপালার ওপর শোয়া নয়, রাশি রাশি ফুলের মাঝে কম্বল বিছানো।—

অল্পক্ষণের মধ্যেই কিচ্‌ ও কুকুম সিং আমাদের তাঁবু খাটিয়ে দেয়। শয্যা পেতে, জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে, বসতে না বসতেই ভানসিং গরম চা এনে পরিবেশন করে। শীতের দেশে গরম পানীয় প্রাণে নবীন উৎসাহ জাগায়।

তাঁবুর ভিতর আবদ্ধ থাকতে মন চায় না। সারাবেলা একা একা ঘুরে বেড়াই পাহাড়ের কোলে, নদীর কূলে। শিলাসনে বসে ভাবতে থাকি কতো কথা। মন ভেসে চলে কোন্ অজানায়।

হঠাৎ চোখে পড়ে, সুমুখের পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি চমরী গাই ঘোরে, দু'তিনটি নেমে এসেছে আমাদের তাঁবুর নিকটে। হয়ত কিছু দূরে তিব্বতী অথবা ভোটিয়া ব্যবসায়ীর তাঁবু পড়েছে। পশুগুলির গা ভরা লম্বা লোম। তিব্বতের গৃহপালিত গাভী এরা। পার্বত্য হিমানী রাজ্যে বাস। অথচ, এই সুদূর প্রদেশ থেকে এদেরই পুচ্ছজাত চামর কতকাল ভারতের মন্দিরে মন্দিরে, গৃহস্থের গৃহে গৃহে সংগৃহীত হয় দেবার্চনার পুণ্যকাজে। চমরী গাই-এর সন্ধান পেল ভারতবাসী প্রথম কবে, কোন্ যুগে? আমাদের ধর্ম অনুষ্ঠানে চামরের বহুল ব্যবহার তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রমাণ দেয় সেই প্রাচীন কাল থেকে। মহাকবি কালিদাসও তার বর্ণনা দেন। আজ এই তুষার-রাজ্যে বিচরণকারী প্রাণীগুলি সেই কথাই স্মরণ করায়। ভাবি, পুচ্ছের সৌন্দর্যই কি এদের গৌরবের একমাত্র কারণ, অথবা শিবলোকে জন্ম বলেই এদের এমন ভারতব্যাপী পদমর্যাদা?

সুধীরের ডাক শুনে ফিরে তাকাই, ওখানে একমনে বসে কী গভীর চিন্তা হচ্ছে? চল্, ঐ ধর্মশালাটা দেখে আসি।

ধর্মশালা? ও ত কতকগুলা পাথর সাজিয়ে একটা পাঁচিলের মত।

এগিয়ে গিয়ে দেখি। দেওয়াল ঘেরা একটা ছোট ঘর। প্রবেশ পথ এত সঙ্কীর্ণ যে মাথা নীচু করেও ঢুকতে কষ্ট হয়। ভিতরে সোজা হয়ে দাঁড়াবারও উপায় নেই। আলোবাতাস প্রবেশেরও অন্য কোন পথ নেই। আদর্শ অন্ধকূপ। দেখে ভাবি, পাহাড়ীরা হয়ত ভেড়া ছাগল রাখার জন্য ব্যবহার করে। ঘরের মধ্যে উৎকট দুর্গন্ধ ও ঘরের বাইরের প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত জঞ্জাল ও বিষ্ঠা।

আমাদের এইদিকে আসতে দেখে কিচ্‌ও এখানে এসেছে। অসুরের মত চেহারা, কিন্তু মুখে শিশুর সরল হাসি।

বড় বড় ঝকঝকে দাঁতগুলি প্রকাশ করে গর্বভরে বলে, আমাদের ঘর দেখছেন? প্রশ্ন শুনে মনে হয় যেন ছোট মেয়ে হাতে তার পুতুল তুলে ধরে সগৌরবে দেখায়, আমার ছেলে দেখেছ?

কিচকে জিজ্ঞাসা করি, এ ঘর কি মানুষ থাকবার জন্যে?

তখন শুনি, এই দুর্গম স্থানে অকস্মাৎ তুষার ও বৃষ্টিপাতে বিপন্ন যাত্রীর এই আশ্রয়ই প্রাণরক্ষার একমাত্র অমূল্য সহায় হয়। তখন কি আর মানুষ ও পশুর ভেদাভেদ বিচার থাকে! কোনমতে জড়সড় হয়ে এরই ভিতর ঢুকে সেই দুর্যোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

কিচ্ বলে, তাকেও কয়েকবার এইখানে যাত্রীদের নিয়ে রাত কাটাতে হয়েছে। এ রকম আরও ঘর উপরে দেখা যাবে।

সুধীর মন্তব্য করে, কাল ভালয় ভালয় লিপুলেখ পার হয়ে যেতে পারলে হয়।

কিচ্ ভরসা দেয়, কোন ভয় নেই বাবুজি, ঠিক পার হয়ে যাব সকলে,—বলে দেহ ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়,—দেখায় যেন নির্ভয়তার প্রতিমূর্তি।

তাঁবুতে ফিরতেই স্বামিজী বলেন, আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়ুন,—কাল রাত থাকতে উঠে যাত্রা করা চাই। সূর্য ওঠার আগে পাশ-এ পৌঁছনো দরকার, রোদ উঠে গেলে বরফ গলতে সুরু হবে—তখন পার হওয়ার আরও বিপদ।

তারপর তিনিও উৎসাহ দিয়ে বলেন, কৈলাসপতিকে স্মরণ করে ঠিক চলে যাওয়া যাবে, কী বলেন সুধীরবাবু?

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যেই সকলে শয্যাগ্রহণ করি।

কিন্তু ঘুম কি আর সহজে চোখে নামে? শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি, হিমালয়ের বরফের পাহাড় কাল অতিক্রম করা,—কতো গভীর সে বরফ? কতোখানিই বা যেতে হবে? ক'বছর আগে কেদারনাথের পথেও বরফের উপর দিয়ে খানিক হাঁটতে হয়েছিল,—তুষারক্ষেত্রের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। কিন্তু সে হোল ১১,৭৫০ ফুটে শীতকালে-পড়া এবং তখনও-না-গলা ক্ষণজীবী তুষার। আর এখানে? ১৬,৭৫০ ফুটে চিরস্থায়ী তুষারের অখণ্ড প্রতাপ! তাই, এই তুষার-সাগরের কাছে কেদারনাথের বরফ গোষ্পদ। আর কয় ঘণ্টা পরে তারই সম্মুখীন হওয়া। সশঙ্ক কৌতূহলে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আধ-ঘুমঘোরে শুয়ে থাকি। মাঝে মাঝে টর্চ জেলে ঘড়ি দেখি, এই বুঝিবা যাত্রার প্রস্তুতির সময় এল!

॥ ৩ ॥

তখনও রাত পোহায় নি। সাড়ে তিনটা বাজে। এই প্রচণ্ড শীতের রাজ্যেও এরই মধ্যে সকলে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়েছি। 'সাজ সাজ' রব ওঠে মনের মাঝে। মুখ ধুতে তাঁবুর বাইরে যাই। অনুভবানন্দজি কখন উঠেছেন জানি না। রন্ধনশালার তাঁবু থেকে তাঁর ডাক শুনি, এদিকে চলে আসুন, ভানুসিংকে দিয়ে গরম জল করিয়ে রেখেছি, ঝরনার বরফ গলা জল হাতে মুখে লাগাবেন না যেন।

বাইরে নিবিড় অন্ধকার। চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। আকাশের তারাগুলি দেখা ত দূরের কথা, চারিপাশের হিমালয়ের সেই গগনভেদী গিরি-প্রহরীগুলিও দৃষ্টির অগোচর। শুধু পাঁচটি তাঁবুর আলো অন্ধকারে জোনাকির মত মিট্‌মিট্ করে জ্বলে, আর টর্চের আলো ফেলে ছায়ামূর্তির মত কয়েকটি মানুষ এদিকে ওদিকে যাতায়াত করে। ঝরনাধারাগুলিও তুষার আবৃত হয়ে অর্ধসুপ্ত! নিথর নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দতা ভঙ্গ হয় অলক্ষ্যে কোথায় ঘোড়াগুলির চলাফেরায়, মাঝে মাঝে তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার ধ্বনিতে। বোধ করি তাদের সাজসজ্জা পরাতে সহিসরা তৎপর হয়েছে।

আমরাও চা-পর্ব শেষ করে মালপত্র বেঁধে প্রস্তুত হই।

স্বামিজী বলেন, অন্ধকার একটু না কাটলে যাত্রা করা চলবে না। প্রেমসিং এসে গেছে কাল সন্ধ্যাবেলায়। বলে গেল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রওনা হতে। তাই করা যাক, উপায় কী। সেই বোতলটা ব্যাগ থেকে বার করে ওভারকোটের পকেটে নিয়েছেন ত? ওটা দরকার না হলে আর খুলবেন না। ব্রহ্মচারীজি যেটুকু এনেছেন, সেই শিশিটাও কাছে রাখুন—প্রয়োজনে সেইটেই ব্যবহার করা যাবে। সাবধানে নেবেন,—ভাঙ্গে না যেন।

বোতলের ইতিহাসটা এখানে বলি।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শমত কলকাতা থেকে এক বোতল একস্' ব্র্যাণ্ডি (Exshaw Brandy) কিনে সঙ্গে আনা হয়েছে। দাম নিয়েছে সাড়ে ন' টাকা। খাঁটি বিলাতি মাল। বোতলের গায়ে তারের জালের আবরণ। মুখের ছিপিতে সীসা দিয়ে সীল করা। ঝক্‌ঝকে কাঁচের মধ্যে স্বর্ণকান্তি তরল পদার্থ। শুনেছি, তুষাররাজ্য পার হতে এবং তিব্বতের দুর্দান্ত শীতের মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা ও আশু শুভ ফল বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে।

ব্রহ্মচারীজিও উপদিষ্ট হয়ে তাঁর ওষুধের বাক্সে একটা শিশিতে কয়েক আউন্স নিয়ে এসেছেন। সেই বোতল ও শিশি ভাল ভাবে কাপড়ে জড়িয়ে আজ প্রকাণ্ড ওভারকোটের দুই পকেটে ভরে নিই। পথে হঠাৎ কোথায় এর প্রয়োগ প্রয়োজন হয় বলা যায় না।

সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত। গাঢ় অন্ধকার তরল হবার অপেক্ষায় সময় কাটে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আঁধার যেন চোখের কাছে ধরা দেয়। অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে। পথের রেখা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। পাঁচটা বাজবার আগেই 'জয় শিব শম্ভো' রব তুলে যাত্রীদল যাত্রা সুরু করে।

ঘোড়ায় চেপে সকলে চলি। আজ সেই তুষারাবৃত লিপুলেখ অতিক্রম! মনের ভিতর কল্পনার তুলিতে যেমন অজানা দুর্গম পথের অস্ফুট রেখা আঁকতে থাকি, চোখের সামনেও তেমনি দেখি কুয়াশায় আবৃত অস্পষ্ট চারিপাশ,—যেন পুরু পর্দার আড়ালে আলোকের ক্ষীণ আভাস। সেই আবছা আলোয় পথ দেখে চলা নিজের উপর নির্ভর করে নয়, ঘোড়ার উপরই সম্পূর্ণ বিশ্বাস। নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে সে চলবেই,—আমার শুধু ঠিকভাবে ভারসাম্য রেখে বসে থাকা। কিন্তু স্থাণু হয়ে শীতের দেশে বসে থাকার শাস্তিও ভোগ করতে হয়। জামা-জুতা ভেদ করে শীতের হিম-স্পর্শ সারা অঙ্গে শিহরণ জাগায়। অথচ, সাজসজ্জা যা করেছি তার বেশি আর পরবই বা কী?

পায়ে মোটা চামড়ার জুতা। সাইকেল-হোস্—মোজার উপর সৈনিকদের মত গরম পট্টি জড়ানো। পরনে গরম পশমের ফুল-আণ্ডারওয়ার। তার উপর গরম riding breeches—প্যাণ্ট। গায়ে সুতি ও গরম—দুইটি গেঞ্জির উপর খাঁকি শার্ট। তার উপর হাত-কাটা পুলওভার ও পুরোহাতা মোটা লালিমলি সোয়েটার। এতেও শেষ নয়। গরম কোটের উপর প্রকাণ্ড ভারী ও মোটা ওভারকোটও উঠেছে। বৃষ্টি না থাকায় ওয়াটারপ্রুফ—বর্ষাতি—অঙ্গচ্যুত হয়ে ঘোড়ার পিঠে আপাততঃ শায়িত, যে কোন মুহূর্তে তার প্রয়োজন হতে পারে। দু হাতে উলের দস্তানা। মাথা, কপাল, কান ঢেকে ব্যালাক্লাভা ক্যাপ, তার বানর-টুপি নামকরণের সার্থকতা প্রচার করে। গলায় জড়ানো মোটা মাফ্লার গলাবন্ধ—কোলাব্যাঙের মত ফুলে উঠেছে। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্লাদেশের অধিবাসীর সে এক অভিনব বেশ। ঘোড়ার উপর উঠে বসবার সময় অবোধ পশুও পা ছুঁড়ে আপত্তি জানায়; হয়ত ভাবে, বুঝিবা ভুল করে দুজন সওয়ার আজ তার পিঠে চেপে বসে।

এইভাবে নিজের দেহকে রজকের কাপড়চোপড়ের বস্তায় পরিণত করে অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। চলছি আমি নয়। নিয়ে চলেছে আমার বাহন। কোথায় পথ, কোন্‌দিকে যেতে হবে, চারিপাশে আছেই বা কী, কিছুই বোঝা যায় না। শুধু কানে শুনি, ডানদিকে কিছু নীচে অদৃশ্য এক বেগবতী জলধারার কলধ্বনি এবং সারিবন্দী যাত্রীদলের ঘোড়াগুলির গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুংটাং শব্দ। হঠাৎ কুয়াশা গাঢ়তর হয়ে আসে। পাহাড়ের গুহায় গুহায় কি কি হিমালয়বাসী সাধু-মহাত্মাদের ধুনি জ্বলে? ধূম্রকুণ্ডলীর ন্যায় কুজ্ঝাটিকা চারিদিক থেকে এসে ঘিরে ফেলে। দু'হাত দূরের বস্তুও আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আশ্চর্য লাগে, এমন ঘন কুয়াশাও ঘোড়ার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। সহজ স্বচ্ছন্দ তালে সে এগিয়ে চলে। এ যেন আমার চোখ বেঁধে হাত ধরে কে নিয়ে যায়। কেন জানি না, মনের গভীরে কোন ভয়ভাবনা জাগে না, অজানা কার হাতে আত্মসমর্পণ করে যেন চোখ বুজে বসে থাকি, অটুট বিশ্বাস থাকে গন্তব্যে নিশ্চিত পৌঁছুব। প্রায় মাইল দুই এইভাবে যাবার পর কুয়াশার জাল ছিন্ন হয়। দিনের আবছা আলো ফোটে। পথের পাশে নাবিদাং-এর সেই ধর্মশালার মত দু'একটা পাথরের ঘর দেখা যায়। প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে। স্বামিজী বলেন, সংচামে এসে গেলাম, প্রায় পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে। আর একটু পরেই লিপুলেখ পাশ শুরু হবে। চারদিকে এখনও যা কুয়াশা, বোঝা যাচ্ছে না কতোখানি বরফ পার হতে হবে।

পনেরো হাজার। বরফ পার হওয়া। শুনে দেহে শীতের কাঁপন আরও বেশী বোধ হয়। সুধীর বলে, স্বামিজী। ঘোড়ার পিঠে বসে চলার চেয়ে একটু হাঁটলে শরীর গরম হবে নিশ্চয়? নেমে পড়ি, কি বলেন?

অনুভবানন্দজি নিষেধ করেন, ব্যস্ত হবেন না, এখন যতদূর পারা যায়, ঘোড়ায় বসে চলুন, কে জানে, বরফের ওপরই হয়ত হাঁটতে হবে। এখন থেকে কষ্ট করলে হাঁফিয়ে পড়বেন, সে-সময়ে দম থাকবে না। গলা ছেড়ে কৈলাসপতির স্তব করুন, শরীর মন সব চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বলুন সবাই 'জয় শিব শম্ভো—হর হর মহাদেও'—বলে স্বামিজী উচ্চৈঃস্বরে শিব-স্তোত্র বলেন :

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।...

কিচ্, রঞ্জন, রুক্কুমসিং, প্রেমুয়া—তারাও সবাই সমবেত কণ্ঠে একটানা স্বরে 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ'—মন্ত্রোচ্চারণ করে ঘোড়ার সঙ্গে চলে। অন্য যাত্রীদেরও কণ্ঠ শোনা যায়। মনে মনে ভাবি, কী অপূর্ব এই তীর্থযাত্রা! তুষার-গিরি দেবতার মন্দির-তোরণ পানে বহু দূরদেশাগত যাত্রীদল ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। উষার আলোক আজ কুয়াশার জালে বন্দী। যাত্রাপথের দুর্গমতা ভীতি ও নিরাশার ছায়া ঘনিয়ে তোলে। ভক্ত যাত্রীদল পাষাণ দেবতার কৃপাকণার ভিখারী হয়ে স্তবগান ধরে। কোন্ মুহূর্তে বুঝিবা দেবতার আশিস্-বাণী আলোকের রূপ ধরে এই শুভ-যাত্রার পথ উজ্জ্বল করে তোলে।

হঠাৎ সুমুখে একটি ছোট ঘটনা ঘটে। এমন কিছুই নয়, কিন্তু অনেক কিছুই হতে পারত।

পাহাড়ের গায়ে পথের খানিক অংশ ভাঙা। হাতখানেক মাত্র চওড়া পথের ভগ্নাংশ কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করে ঝুলে আছে। পাশেই গভীর খদ। নীচে কালী বা লিপিংতী নদীর হিংস্র রূপ। আমার ঠিক আগে স্বামিজী ঘোড়ায় চড়ে চলেন। চোখের সামনে দেখি, সেই অপরিসর পথটুকু পার হতে গিয়ে তাঁর ঘোড়ার পিছনের দুই পায়ের তলা থেকে মাটি ধসে পড়ে, খদের দিকে ঘোড়া ঝুলে যায়। নিমিষমাত্র। আবার তখনি সামনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে ঝাঁকানি মেরে টাল সামলে পথ ধরে ঘোড়া চলতে থাকে। স্বামিজীর দেহও সেইমত সজোরে আন্দোলিত হয়, কণ্ঠের সঙ্গীতও ক্ষণিকের জন্যে বাধা পেয়ে কেঁপে ওঠে। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে আবার গলায় স্বর ফোটে।

সময়মত ঠিক সামলাতে না পারলে কী যে ঘটত কল্পনা করতেও অন্তর শিউরে ওঠে।

স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করি, ঠিক আছেন তো?

স্বামিজী হেসে ওঠেন। 'জয় শিব শম্ভো' বলে গান ধরেন।

এতক্ষণে দিনের আলো স্পষ্ট হয়। পথের আশপাশে বরফ। তারই মাঝে মাঝে মাথা তুলে শিলাখণ্ড। তার গায়েও কোথাও বট গাছের ঝুরির মতন জমা বরফ ঝুলছে। কোথাও বা মনে হয় যেন নিবে-যাওয়া বাতির গায়ে মোম গলে জমে রয়েছে। পথের মাঝে কখনো বা ছোট নদী ও ঝরনা পার হতে হয়। অতি ক্ষীণ জলধারা। তুষারের লেপের তলায় শিশুরা যেন

ঘুমিয়ে আছে, ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কারো কারো দেখা যায়। মচ্ মচ্ শব্দ তুলে সেই তুষার আবরণ খণ্ড খণ্ড করে ঘোড়াগুলি অক্লেশে ও নির্ভয়ে পার হয়ে যায়। স্বামিজী বলেন, বেলা বাড়লে এইসব ঝরনার ধারার চেহারা বদলে যাবে। বরফ গলে জলের স্রোত তোড়ে বইতে থাকবে।

সুধীর পথের অদূরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, স্বামিজী। ওখানে ওটা কী? বরফের ওপর একটা কীসের কঙ্কালের মতন?

স্বামিজী বলেন, সুধীরবাবু, চলেছেন শিবঠাকুরের দেশে। মাঝে মাঝে এ-সব শ্মশান-দৃশ্য দেখতে পাবেন। ওটা একটা চমরীর কঙ্কাল। পাশ্ পার হতে গিয়ে তুষারপাতের ফলে কবে মারা পড়েছে। অথচ, এরা হোল এই বরফের দেশের প্রাণী। এখানে দুর্যোগের মধ্যে পড়লে এদেরও নিস্তার থাকে না,—মানুষ তো কোন্ ছার। সেইজন্তেই এই সব পাশ পার হতে গেলে এত সতর্কতা ও খোঁজখবর নেওয়ার দরকার হয়।

কথা শুনে ভাবি, এই বর্ণহীন নিষ্কলুষ শুভ্র তুষাররাজ্যে যেন জীবন্ত প্রাণীর কোন স্থান নেই। চারিদিক ঘিরে শুধু মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ। প্রয়োজন বোধে জীবজন্তু মানুষ এখান দিয়ে যায় আসে, থাকতে পারে না। দুর্যোগে প্রাণনাশ বিচিত্র নয়।

পথ ক্রমশই উঠে চলে। সংচাম থেকে মাইল দেড়েক আসার পর লিপুলেখ পাশ-এর পাদদেশে পৌঁছুই। এ যেন সীমাহীন শ্বেত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মাঝে হারিয়ে যাওয়া। যেদিকে দৃষ্টি ফেরাই, শুধু বরফের পর বরফ। সুমুখেও মাথা তুলে তুষার-গিরি প্রাচীর। এই জগতে যেন কেবলমাত্র অমলধবল তরঙ্গেরই খেলা। মাথার উপর আকাশও বিবর্ণ পাণ্ডুর। কুজ্ঝটিকার অন্তরালে। ক্ষণকালের মধ্যে সেই কুয়াশা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে, দৃষ্টির গতিপথ অবরোধ করে। চারিদিকে সাদা বরফের উপর আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলে।

এই অপরূপ নূতন দেশ ও দিগন্তব্যাপী তুষার-দৃশ্য সকলেরই মনে সানন্দ উৎসাহ জাগায়। সাথী তিব্বতী কুকুর স্ফূর্তিতে বরফের উপর ছুটাছুটি করে, লাফিয়ে বেড়ায়, কখনো বা পা দিয়ে আঁচড়ায়, বরফ ছিটায়, তুষারপিণ্ড নিয়ে বলের মত খেলা করে।

তার নির্ভয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস যাত্রীদের মনে পুলক ও সাহস যোগায়।

ঘোড়ার উপরে বসে থেকে ব্রহ্মচারীজি হঠাৎ আদেশ করেন, ভানুসিং।

বরফ লে আও।

আর সবাই ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছি। সুধীর জিজ্ঞাসা করে, ব্রহ্মচারীজি। ব্যাপার কী? বরফে নিয়ে কি করবেন?

তিনি সহাস্তে জানান, এই বরফের দেশে এসেও বরফ খাব না?

সবাই ত্রস্ত হয়ে নিষেধ করি, অসুখ করবে। করেন কী।

তিনি ক্ষুণ্নমনে নিরস্ত হন।

ইতিমধ্যে প্রেমসিং এগিয়ে এসে স্বামিজীকে এক কঠিন সংবাদ জানান। গত কয়দিন নীচে যে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখানে তা তুষারপাতে পরিণত হয়েছে। সেই নতুন বরফ পড়ার ফলে পাশ-এর পথরেখা বিলুপ্ত হয়েছে। এখন পথ খুঁজে বার করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি তারই সন্ধানে চলেছেন। আমরা সকলে যেন তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করি। বরফের উপর কোনদিকে কেউ না এদিয়ে যাই।

প্রেমসিং-এর সঙ্গেও দেখি তাঁর একটি কুকুর এসেছে। তেমনি ঝাঁকড়া লোম, বিরাট দেহ, তিব্বতীয় মাসটিফ। সেই কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমসিং একাকী পথের সন্ধানে তখনি যাত্রা করেন। যাবার আগে আমার দূরবীনটি চেয়ে নিয়ে যান।

বিপুল তুষাররাশির উপর ধীরপদে এগিয়ে চলেন। ক্রমে বিরাট হিমগিরির কুজ্ঝটিকার অন্তরালে সেই বিন্দুপ্রায় মনুষ্যমূর্তি অদৃশ্য হয়।

সবিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে থাকি। তাঁর মৃত্যু-ভয়-হীন অসীম সাহসের প্রতি নীরবে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

স্বামিজী বলেন, বুঝতে পারছেন এইবার, প্রেমসিংকে সঙ্গে আনবার জন্তে কেন অতো ব্যস্ত হয়েছিলাম? এইসব দুর্গম অঞ্চলে এদের শক্তি ও সাহস দেখলে অবাক হতে হয়। দেখবেন মানুষটির অসীম ক্ষমতা। চারদিক এই সাদা বরফে ঢাকা,—কোথাও পথের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না, সে কিন্তু ঠিক বার করবে কোন্ ধার দিয়ে আমাদের যেতে হবে। প্রায় প্রতি বছরই প্রেমসিংকে এই লিপুলেখ পার হয়ে তিব্বত যাতায়াত করতে হয়, তবুও বরফের তলায় পথ চাপা পড়লে সে-পথ খুঁজে বার করা কি সহজ কথা?

স্বামিজীর অভয়বাণী শুনেও ভাবি, সহজ ত নয়ই, অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবুও আশা নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ও ত নেই।

এই পাশগুলির প্রতি বৎসরান্তে নব-জন্মকাহিনী এই সুযোগে এখানে বলে রাখি।

হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে যাতায়াতের জন্যই এই গিরিবর্ত্ম বা পাশগুলির ব্যবহার। পাশ বলতে সাধারণ ধারণা, দুদিকে সোজা খাড়া পাহাড়, তারই মাঝ দিয়ে সরু পথ। কিন্তু সর্বত্র তা নাও হতে পারে। সু-উচ্চ দুর্গম গিরিশ্রেণী অতিক্রম করতে পর্বতের শীর্ষভাগের যে-অংশ দিয়ে মানুষ চলাচল সম্ভব, তারই পাশ নামে পরিচয়। লিপুলেখ পাশ ভারত-তিব্বতের সীমান্ত প্রদেশে। হিমালয়ে নয়, ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী জাস্কর গিরিশ্রেণীর Zaskar Range-এর উপর দিয়ে। এই পাশ-এর উচ্চতা ১৬,৭৫০ ফুট। সারা বছর এই স্থান তুষার-আবৃত থাকে। তবে গ্রীষ্মকালে —অর্থাৎ জুন জুলাই, আগস্ট মাসে—বরফ গলে কমে যায়, সে-সময়ে লোক চলাচলও সম্ভবপর হয়ে ওঠে। প্রতি বছর যখন বরফ গলা সুরু হয় তিব্বতী ব্যবসায়ীরা তাদের ঝব্বু ও চমরী পশুপাল এনে বরফের উপর ছেড়ে দেয় এবং ভারতবর্ষ অভিমুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। হিমাঞ্চলবাসী এই পশুগুলির প্রকৃতিদত্ত এক আশ্চর্যময় ক্ষমতা আছে। তুষার-প্রান্তরের যে অংশ দিয়ে চলাচল সম্ভব ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তারা কীভাবে ঠিক বুঝতে পারে, এবং সেই দিক ধরে চলে। ফলে, এইভাবে ঝব্বু ও চমরীদলের বিচরণে ও তাদের পদ-নিষ্পেষণে পথরেখার সৃষ্টি হয়, বরফও সেখানে জমাট হয়ে বেঁধে ওঠে। তখন সেই চমরী-পদ-চিহ্নিত পথ ধরে লোক-চলাচলও সুরু হয়। প্রচার হয়ে যায়, পাশ খুলেছে।

এই বছরও কিছুদিন আগে লিপুপাশ সেইভাবেই খোলে। লোক-যাতায়াতও আরম্ভ হয়। কিন্তু, সম্প্রতি অতিরিক্ত নূতন তুষারপাতের দরুণ পথের নির্দিষ্ট চিহ্নগুলি লোপ পেয়েছে। সেই অবলুপ্ত পথের দিঙ্‌নির্ণয়ে প্রেমসিং-এর দুরূহ অভিযান।

সশঙ্ক চিত্তে যেন অপার তুষারসাগরতীরে সেই পারের কাণ্ডারীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করে থাকি। ভেবে কূল পাই না, ঐ সুবিস্তীর্ণ তুষার অতিক্রম করব কী ভাবে? চারদিকের কুয়াশার আবরণ ভেদ করে কভু সূর্যকিরণ দীপ্ত হয়ে উঠবে এমনও বোধ হয় না।

'আরে! লোকটা করে কী? মরবে নাকি ঐখানে বরফের মধ্যে?'—অনুভবানন্দজির উৎকণ্ঠিত তীক্ষ্ণ তিরস্কার শুনে সেদিকে ফিরে তাকাই,

দেখি, ভানুসিং নূতন পড়া বরফের ভিতর নেমে লাফালাফি করে। স্বামিজীর নিষেধ আজ্ঞার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নেই।

স্বামিজী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, লোকটা বিপদে পড়বে এখনি,—ওর কি আজ কাণ্ডজ্ঞান আছে? মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে।

প্রকৃতই এক কাণ্ড ঘটে। ভানুসিং-এর দুই পা উরুত পর্যন্ত বরফের মধ্যে ডুবে যায়, লোকটা 'মাই গড্' বলে আস্ফালন করে হাতের লাঠির উপর কোনমতে ভর দিয়ে টলতে টলতে নরম বরফ থেকে উঠে আসে।

কয়েক বছর আগে মিলিটারী অফিসারের নিকট সে যে চাকরি করেছিল তখনকার শেখা ইংরাজি বুকনি আজ অসম্বন্ধ প্রলাপের মত অনবরত তার মুখ থেকে বার হচ্ছে।

স্বামিজী রুকুমসিংকে ডাক দিয়ে বলে দেন, তাকে যেন কাছে কাছে রাখে, যে রকম বেসামাল হয়েছে কখন কি করে বসে ঠিক নেই।

কিন্তু সামলাবেই বা কে? ওরা সকলেই আজ ভিতর গরম করে চলেছে। না এসে তাদের উপায়ও নেই,—এই নিদারুণ শীত ও দুর্গম পথ-হাঁটার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা পাবে কোথা থেকে? তবে, এদের মধ্যে কিচ্ ও রুকুমসিং কিছু প্রকৃতিস্থ আছে বলেই রক্ষা।

সুধীর বলে, ওদিকে ঐ কুয়াশার মধ্যে প্রেমসিংকে দেখা যাচ্ছে,—এইদিকেই ফিরে আসছে. পথের সন্ধান পেল কিনা কে জানে।

আশা-নিরাশায় মন দোলে। অসীম আগ্রহে সেদিকে তাকিয়ে থাকি। ছায়ামূর্তি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চলার সতেজ ভঙ্গি ও মুখের হাবভাব বিজয়গর্ব প্রকাশ করে। হবার কথাও। এই নিঃসীম নির্দেশ-শূন্য তুষার-প্রান্তরে কুজ্মটিকার আবরণ ছিন্ন করে সে আজ অসহায় যাত্রীদের কাছে পথের সন্ধান এনেছে!

এসে সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, যেন আত্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। বলে, স্বামিজী, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে দেখে এলাম। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া চলবে না, রাস্তা খুব খারাপ,—হেঁটেই যেতে হবে। আর, আমি যেখান দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চলব, আমার ঠিক পিছু পিছু সবাই একে একে আসবেন,—বরফের ওপর আমার জুতার ছাপ দেখে ধীরে ধীরে এগোবেন,—আশপাশে কোথাও কেউ যেন না নামেন, তাহলে বিপদ হতে পারে।

কারণ আর কিছুই নয়, চারপাশের পাহাড়ের খদ, ফাটল, গহ্বর প্রভৃতি

উঁচু নিচু অসম স্থানগুলি নতুন-পড়া বরফে একাকার হয়ে ঢাকা পড়েছে। সর্বত্রই সমভূমি বলে ভ্রম হয়। পাহাড়ের সেই সব প্রচ্ছন্ন গভীর ফাটল বা crevasse-এর উপরিভাগের পাতলা বরফে পা পড়লেই তুষার-সমাধি,—জীবনসংশয়। অনুভবানন্দজি যাত্রীদের কথাটা বুঝিয়ে বলেন। রঙিন চশমা পরতেও নির্দেশ দেন। বরফের উপর সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে যে সুতীক্ষ্ণ আলোকরাশির বিচ্ছুরণ ঘটে, তাতে দৃষ্টিনাশের আশঙ্কা থাকে।

ঘড়িতে বেলা সাতটা বাজলেও ভাগ্যক্রমে তপনদেব এখনও চোখ মেলেন নি, —কুয়াশা বা ফগ-এ মাথা মুড়ি দিয়ে।

প্রেমসিং-এর হাতে লক্ষ্য করি, দুরবীনটি নেই।

জিজ্ঞাসা করলে অতি সহজ কণ্ঠে বলেন, সেটা পাশ-এর মাথায় বরফের ওপর রেখে এসেছি, সঙ্গে আর ত কিছু ছিল না, তাই সেইটেই ঐখানে নিশানা হয়ে আছে।—বলে কুয়াশাবৃত তুষার-শিখর উদ্দেশে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেন।

মনে মনে খরচের খাতায় দুরবীনটি লিখে রাখি। ঐটুকু দুরবীন ত দূরের কথা, মানুষ হারালেও এখানে সন্ধান পাবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু, বিচিত্র এই স্থানকালের প্রভাব। সেই প্রিয় বস্তুটির হারানোর কোন দুঃখই মনে জাগে না। ক্ষয়ক্ষতির মূল্যবোধই আজ অন্তরে স্থান পায় না।

প্রেমসিং-এর নির্দেশমত তার পদানুসরণ করে সকলে সারি বেঁধে সেই হিমশৈল অতিক্রম করতে সুরু করি। ঘোড়াগুলি পিছনে পড়ে থাকে। মালবাহক ঘোড়া এখনও আসে নি। এলে একসঙ্গে বরফ পার হবে। সহিসরাও তাই থেকে যায়। কিচ্ আমাদের সঙ্গে থাকে। বাহন-ছাড়া ব্রহ্মচারীজি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তাই তো! সঙ্গে ঘোড়া এনেও হেঁটে চলা! চড়াইটা কি খুব বেশী হবে? কুয়াশায় কিছুই ত দেখা যাচ্ছে না দূরের পাহাড়।

প্রকৃতই দূরে লিপুলেখের এখনও কতোখানি চড়াই, দেখার উপায় নেই। নিকটে চারপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখি কেবলি সাদা বরফ আর বরফ। তবুও কেন জানি না, মনে ভয় হয় না। মাঝে মাঝে নরম বরফের মধ্যে পা বসে যায়, কোথাও বা পিছলায়,—লাঠির সাহায্যে তাল সামলাই, পড়লে ত

ঐ বরফের উপরই পড়া, গড়িয়ে কোথাও যাবার আশঙ্কা নেই,—প্রেমসিং যদি ঠিকপথেই নিয়ে চলে। তার উপর সে বিশ্বাস রেখে নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলি। বোঝা যায় ক্রমশঃ পাহাড়ের উপরে উঠছি,—যদিও চড়াই অতি অল্পই। কিন্তু একটা বিষয় সকলেই কম-বেশী লক্ষ্য করি। অত্যুচ্চতা ও সূক্ষ্ম অবিমিশ্র বায়ুমণ্ডল—rarefied air-এর দরুণ শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ভাবে পড়ে না, কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হয়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট লাগে। এক দমে কয়েক পা চলবার পরই ক্লান্তি নামে। মনে হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে। পা যেন চলে না। তা হলেও মনে দৃঢ় বল ধরি, এ-পথ অতিক্রম করতেই হবে। বার বার বিশ্রাম নিলে পথ শেষ হবে না। যেমন করে হয়, অতি ধীরে ধীরে এক এক পা ফেলে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। বরফের রাজ্যে এই নূতন অভিজ্ঞতাও মনে আনন্দ আনে। চলার পরিশ্রমে দেহে উত্তাপ থাকে। তুষাররাশির মধ্যেও শীতের তেমন প্রখরতার অনুভূতি থাকে না।

হঠাৎ কুকুমসিং-এর ডাকে পিছন ফিরে তাকাই। দেখি, বরফের উপর সেই হিন্দুস্থানী যুবা সাধুটি বসে পড়েছেন। তাঁর কাছে এগিয়ে যাই। ভেউ ভেউ করে তিনি চেঁচিয়ে কাঁদেন। তিনি যে আর বাঁচবেন না,—এখনি তাঁর মৃত্যু সুনিশ্চিত, চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দেন। বুঝতে পারি, তাঁর সেই একখানি মাত্র গাত্রবস্ত্রে কি আর লিপুলেখের শীত নিবারণ সম্ভব? প্রশ্ন করে শুনি, তাঁর বুকের মধ্যে অসম্ভব কি-এক কষ্ট হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। মুখ হাঁ করে অনবরত দম নেওয়ায় গলার ভিতর শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, বলেন।

তাঁর এই দুঃসহ অবস্থা দেখে ভাবি, ব্র্যাণ্ডির শক্তি পরীক্ষার এবার বুঝি সময় এল। সাধুজিকে মাথা তুলে হাঁ করতে বলি। প্রায় আউন্স দুই সেই তরল পদার্থ শিশি থেকে একেবারে তাঁর মুখে ঢেলে দিই।

এমন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া জীবনে পূর্বে কখনও দেখার সুযোগ হয় নি। সাধুজি একবার চোখ কুঁচকান, মুখ বিকৃত করেন, তারপরেই মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ফট্ করে সোজা উঠে দাঁড়ান এবং চক্ষের নিমেষে সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে প্রেম-সিং-এর পিছু নেন।

এর কিছু পরেই লক্ষ্য করি, ব্রহ্মচারীজিও ঘন ঘন দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন,

দলছাড়া হয়ে পিছিয়ে পড়ছেন। অবশেষে এক সময়ে বরফের উপর বসে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করে জানি, সাধুজির মতন তাঁরও দুরবস্থা।

পকেট থেকে শিশি বার করে বলি, বাকি যেটুকু আছে খেয়ে ফেলুন।

তিনি কোনমতেই রাজি হন না। ফলে, আবার হেঁটে দু'তিন পা মাত্র গিয়েই বসে পড়েন। খানিক পরে উঠে কয়েক হাত এগিয়ে আবার বসা। এবার আর ওঠবার নাম করেন না। ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট! গা গুলোচ্ছে, চোখ জলে যাচ্ছে,—শরীরে কি রকম ভীষণ গরম লাগছে, মাথা থেকে আগুন বেরুচ্ছে—ব্রহ্মতালু যেন ফেটে পড়ছে,—বলে মাথার টুপিটা টেনে খুলে ফেলেন, গায়ের জামাও খোলবার চেষ্টা করেন। কাতরভাবে জানান, ভেতরে ঘেমে একেবারে ভিজে গিয়েছি যে! তাঁর হাত ধরি। বলি, করছেন কী? ঠাণ্ডায় মারা যাবেন যে। বলে হুকুমসিংএর সাহায্য নিয়ে জোর করেই চার আউন্স শিশিটির অবশিষ্ট দু' আউন্স তাঁর গলাধঃকরণ করিয়ে দিই।

ফল ফলে। খানিকটা পথ সহজেই এগিয়ে যান। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার বরফের উপর বসে পড়েন, "আর এক পাও আমার চলা সম্ভব নয়"—বলে হাঁফাতে থাকেন।

কিচ্ এগিয়ে আসে। তাঁর এই একান্ত অসহায় অবস্থা দেখে কারও আদেশের প্রত্যাশায় থাকে না, তখনি অনায়াসে তাঁকে পিঠের উপর তুলে ঝুলিয়ে নেয় এবং সেইভাবেই পাশ-এর মাথার উপর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে চলে।

আর সকলেও ধীরে ধীরে পাশ-এর মাথায় পৌঁছুই।

ব্রহ্মচারীজি সেখানে কিচ-এর পিঠ থেকে নেমে বরফ-ঢাকা একটা পাথরের উপর বসেন। মনে হয়, অনেকটা সুস্থবোধও করেন। পকেট থেকে মনি-ব্যাগ বার করে তখনি কিচকে একটা দশ টাকার নোট বখশিশ দেন। কিচ্ বড় বড় শুভ্র দন্তপঙ্ক্তি প্রকাশ করে হাসতে থাকে। বালকের মত সকৌতুক সরল হাসি। যেন একটা সামান্য সহজ খেলা দেখিয়ে কেমন পারিতোষিক লাভ হোল!

স্বামিজী বলেন, এই দুর্গম পথে বিপন্নের সাহায্য করা, অক্ষমকে কাঁধে তুলে পার করিয়ে দেওয়া,—শুধু এই কিচ্ কেন, যে-কজন সঙ্গে এসেছে প্রত্যেকেই হাসিমুখে করতে পারে, করেও থাকে। এর মধ্যে কোন বাহাদুরি মনে করে না। অদ্ভুত মানুষ সব। এই তীর্থপথে এদের অযাচিত ভাবে

সাহায্যদান যাত্রীদের অমূল্য সম্পদ্।—বলে এগিয়ে গিয়ে কিচ-এর পিঠ চাপড়ান।

সুধীর হঠাৎ বলে ওঠে, আরে। ঐ যে দুরবীনটা ওখানে বরফের ওপর পড়ে রয়েছে।

তাই ত! ভুলেই গিয়েছিলাম দুরবীনের কথা,—বলে সেখান থেকে তুলে নিই। এ-যেন ভেসে যাওয়া জিনিস আবার স্রোতের টানে ফিরে পাওয়া।

প্রায় নটা বাজে। ঘণ্টা দুই লেগেছে পাশ-এর বরফ পার হতে। হয়ত মাইল দুই পথ, কিন্তু মনে হয়েছে তিন-চার মাইল। ১৬,৭৫০ ফুটে উঠে আসা, তবুও চড়াই তেমন কিছু দুরূহ মনে হয় নি, বরফের উপর হাঁটতে শীতের প্রখরতাও বেশী কষ্ট দেয় নি, altitude-এর জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বস্তি বোধ অবশ্য ছিলই।

পাশ-এর মাথাতেও বরফ। একপাশে স্তূপীকৃত পাথর সাজানো। তার গায়ে বাঁধা নানান রঙের কাগজ ও কাপড়ের টুকরা, তিব্বতী ভাষায় কি সব মন্ত্র লেখা। পাশ-এর মাথায় কোন দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনার প্রতীক স্বরূপ এসব সাজিয়ে রাখা। তিব্বতীরা বলে Laptche লাপ্‌ৎচে। নিশানের মত ঝোলানো কাপড় ও কাগজগুলি বাতাসে ওড়ে। হয়ত পাশ-এর দিকে আসার সময় নীচে দূর থেকে দেখাও যায়,—যাত্রীদের পথ-নির্দেশের সাহায্যও হয়। আজ কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন থাকায় আমরা দেখতে পাই নি।

যাত্রীদল সকলেই উপরে চলে এসেছি। এখনও কুয়াশা কাটে নি। বরফের উপর ওয়াটারপ্রুফ বিছিয়ে বিশ্রামের আয়োজন হয়। সুধীর আশ্চর্য হয়ে দেখায়, ও কী! মাদ্রাজী সাধুটি আবার বরফের উপর দিয়ে নেমে ফিরে চলেছেন! কি ব্যাপার কেউ বুঝতে পারি না। দেখি, খানিক পথ নেমে গিয়ে পথের বরফের উপর উবু হয়ে বসে তিনি দু হাত দিয়ে বরফ সরান। অবশেষে, কালো কি এক বস্তু প্রকাশ পায়; সেইটে হাতে ধরে হৃষ্টচিত্তে আবার উপরে উঠে আসেন। নিকটে পৌঁছুলে দেখি, তাঁরই পায়ের একপাটি মাদ্রাজী চটি! আসবার সময় নিশ্চয় বরফের মধ্যে পা বসে জুতার পাটি ভিতরে থেকে গিয়েছিল, তাই ফেলে খালি পায়ে চলে এসেছিলেন, এখন সবাইকে বিশ্রাম নিতে বসতে দেখে ফিরে গিয়ে হৃতরত্নের পুনরুদ্ধার হোল।

সুধীর বলে, অবাক কাণ্ড। ঐ চটি পায়ে দিয়ে এই বরফ পার হয়ে এসেছেন।

স্বামিজী বলেন, সুধীরবাবু, যাত্রীদের এখানে মনোবলই হোক প্রকৃত সম্বল।

শুনেছিলাম, লিপুলেখ পাশ-এর মাথা থেকে ভারত ও তিব্বত দুই দিকের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। আজ এখন চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। তার উপর তুষারপাতও সুরু হয়। সকলের মাথার টুপিতে ও পোষাকে পেঁজাতুলার মত সাদা সাদা বরফের flakes নিঃশব্দে এসে পড়ে। জামা টুপি সাদা দেখায়। ঝেড়ে ফেলতেই ঝরে পড়ে। তখনি আবার জমে। সেই সঙ্গে হিমশীতল বাতাসও দেখা দেয়। সুচের মত জামা জুতা ভেদ করে সর্বাঙ্গে বেঁধে। কেমন করে কোথা দিয়ে প্রবেশ করে বোঝাই যায় না।

প্রেমসিং এসে বলে, জোর হাওয়া উঠেছে, বরফও পড়ছে,—তাড়াতাড়ি ওদিক দিয়ে নামতে সুরু করুন। পাশ-এর মাথায় আর বসা নয়।

বেলা ৯টা ২৫ মিনিট।

এবার পাশ-এর অপর দিক দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামা। ভারতবর্ষ পিছনে ফেলে তিব্বত দেশে প্রবেশ।

নামতে সুরু করতেই বরফ পড়া বন্ধ হয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই কুয়াশাও কাটতে থাকে। এ পাশেও পাহাড়ের গা বরফে ঢাকা। কিন্তু নামতে কষ্ট হয় না। অপেক্ষাকৃত শক্ত বরফ, পা বেশী বসে না। তবে মাঝে মাঝে পিছলে যায়, লাঠিতে ভর দিয়ে সর্‌সর্‌ করে নেমে যেতে হয়। খাড়া উৎরাই। এক এক সময়ে বরফের উপর বসে পড়ে গড়িয়ে চলি। ভয়ের কোন কারণ থাকে না। এখন আর পথের ধারে অতল খদ বা প্রচ্ছন্ন গহ্বর নেই, হিংস্র জলস্রোতও নেই। সকলেই যে যার টাল সামলে বরফঢাকা ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে মহাস্ফূর্তিতে নেমে চলি। ব্রহ্মচারীজি এগিয়ে যান্। মুখ ফিরিয়ে ডাক দেন, কই সুধীরবাবু! পিছিয়ে কেন ?

সুধীর বলে, দেখছি, ওদিকপানে বরফের ওপরে একটা কী প্রকাণ্ড জানোয়ার ঘুরছে।

তাকিয়ে দেখি। ভাবি, একটা ঋক্ষ বা চমরী হবে। কিন্তু এখানে কাছে কোন লোকজন দেখি না, এল কোথা থেকে ?

অনুভবানন্দজী হেসে ওঠেন। বলেন, সুধীরবাবু, ওটা প্রেমসিং-এর সেই

কুকুরটা। বরফের ওপর অমন প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে,—যেন magnifying glass (বিবর্ধক কাঁচ) দিয়ে দেখা। সাদা বরফের ওপর এমন দৃষ্টিভ্রম হয়। তিব্বতে এ ধরণের আরও কতো ভুল দেখবেন। অদ্ভুত দেশ।

কিছুদূর নামবার পর পাহাড়ের গায়ের বরফ শেষ হয়ে আসে। স্থানে স্থানে কালো শিলাখণ্ড দেখা দেয়। ক্রমশঃ পাথর, বালি ও মাটি দিয়ে গড়া পাহাড়ের নগ্ন অঙ্গ প্রকাশ পায়।

স্বামিজী বলেন, এও এক নজর করার ব্যাপার। বরফের পাহাড়ের ঐ দক্ষিণ অঞ্চলে—অর্থাৎ ভারতবর্ষের দিকে হিম-রেখা—স্নো-লাইন—তেরো হাজার ফুটের ওপর উঠে এলে তবে পাওয়া যায়। ওদিকে বৃষ্টিপাতও বেশী। কিন্তু, তিব্বতের দিকে পাহাড়ের গায়ে হিমরেখা পনের-ষোল হাজার ফুট এ। এ-সব অঞ্চলে শুক্‌না খট্‌খটে আবহাওয়া,—বৃষ্টি পড়েও খুব কমই। আমরা এখন এদিক্কের পাহাড়ের বরফ পার হয়ে এলাম। কি রকম সুধীরবাবু, লিপুপাশও তাহলে পার হয়ে এলেন? আর এখন তো সোজা পথ এসে যাবে। প্রাণ খুলে বলুন, জয় শিব শম্ভো।

শুধু স্বামিজীর মুখেই অভয়বাণী শুনি না, তাকিয়ে দেখি, দিগদিগন্ত সম্পূর্ণ কুয়াশামুক্ত। মেঘহীন স্বচ্ছ নীল আকাশ থেকে দীপ্ত সূর্যের সহস্র কিরণ শুভাশিস রূপে বর্ষিত হয়। পিছনে ফেলে-আসা হিমালয়ের তুষারশিখরগুলি এখন রৌদ্রোজ্জ্বল, নির্মল শুভ্রকান্তি।

অপরদিকে সুমুখে তিব্বতের গিরিশ্রেণী। কোথাও কোন গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। কেবলি পাথর। বহুদূরে দেখা যায় গুরলা মান্ধাতার তুষার-চূড়া। কিন্তু হিমালয়ের সেই চির-পরিচিত দৃশ্য এখানে নয়। তিব্বতের পার্বত্যভূমি সম্পূর্ণ এক পৃথক রাজ্য। নীরস শুষ্ক কঠোর, যেন পাষাণপুরী। তবুও এরি মাঝে দেখি বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ সৌন্দর্যবোধ। দূরে পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব বর্ণবিন্যাস। দিকে দিকে পাহাড়ের পাথরগুলির উপর সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে বহুবর্ণে রঞ্জিত দেখায়। লাল-নীল-পীত-হরিৎ কতো বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ। যেন, কোন নিপুণ শিল্পীর দিগন্তব্যাপী বিচিত্র এক চিত্রশালা।

পাহাড়ের বুকে এমন রঙের খেলা আর কোথাও দেখি নি।

সুধীর মন্তব্য করে, স্বামিজী, এ যে দেখি আমাদের মহাদেবের প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম, অজিন ও পার্বতীর চিত্রবিচিত্র বল্কল সব রোদে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

স্বামিজী উৎফুল্ল হয়ে বলেন, দেখুন, দেখুন, সুধীরবাবু, এই আজব দেশের কতো রকম অদ্ভুত রূপ। আশ্চর্য এই দেশ,—রুক্ষ শুষ্ক পাহাড় পর্বত,—তবুও কেমন রঙের রঙ্গভূমি।

আবার সকলে পাহাড়ের গা বেয়ে শিলাস্তূপের মধ্যে দিয়ে নেমে চলি। হিমালয়ের দিকে লিপুলেখে উঠতে যেমন কালী কিংবা লিলিংতী নদী পাশে সঙ্গী থাকে, তিব্বতে এসে এদিকেও তেমনি এক ছোট নদীর সঙ্গ পেয়ে নেমে যাওয়া। নাম শুনি, হিস্তী।

মনে হয়, লিপুলেখ পাশ থেকে মাইল দুই নামা হয়েছে। স্বামিজী বলেন, এইবার ঘোড়া ও অন্য লোকজনের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার।

ঘড়িতে দেখি, বেলা ১১টা ৪০। সেই ভোর পাঁচটার আগে যাত্রা সুরু। এতক্ষণ এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসে শরীরও ক্লান্ত। বিশ্রামের আশায় নদীর ধারে পাথরের উপর সকলে বসি। পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়েও পড়ি। ধরিত্রীর কোলে ভূমিশয্যার অপূর্ব আনন্দস্বাদ পাই। পথের পাশে তিব্বতের দুর্দান্ত ঝড়ো বাতাসের হাত থেকে পথিকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিব্বতীদের পাথর সাজানো ছোট ছোট দেওয়াল ঘেরা জায়গা। ঘরের মতন,—অথচ মাথার উপর ছাদ নেই।

শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে দেখি। মেঘশূন্য নির্মল আকাশের কী গাঢ় নীল রঙ। আজ সকালে লিপুলেখ পাশ-এর কুয়াশা, তুষারপাত, সবই এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। এমন উজ্জ্বল আকাশ জগতের আর কোথাও কি দেখা যায়? কিন্তু সৌন্দর্যভোগেরও সীমা থাকে। সেই সুনীল রত্নসিংহাসনে বসে মধ্যাহ্ন-সূর্য এখন যেন অগ্নিবর্ষণ করেন। কোথাও গাছের ছায়া নেই। আশ্রয়ের অন্য কোন স্থানও নেই। সেই পাথরের উপর শুয়ে প্রখর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হতে থাকি।

সুধীর মাথার টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে বলে, এ এক আজব দেশই বটে। এই ঘণ্টা দুই আগে বরফে জমে যাবার অবস্থা, এখন আবার রোদে পোড়ার দুর্দশা।

সুরেন্দ্র মহারাজ ওদিকের পাথরে বসে অনুভবানন্দজির সঙ্গে পরামর্শে ব্যস্ত,—তাই তো! মস্ত এক ভুল হয়ে গেছে! পাশ-এর ওপর ভানুসিংকে রেখে আসা হোল, ঘোড়াগুলো ও মালপত্র বরফের ওপর পার করবার জন্যে তার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে, অথচ, তার কাছ থেকে খাবারের টিফিন

কেরিয়ারটা চেয়ে আনা হয় নি! এখন খাওয়ার ব্যবস্থা হবে কী?

প্রকৃতই, পাশ পার হবার সময়ে আহারের কথা কী কারো তখন মনে ওঠে? কিন্তু এখন ক্ষুধার তাড়নায় সকলেই অস্থির হই। উপশমের উপায়ান্তরও থাকে না। নির্জীবের মত পড়ে থাকি। দলের লোকজনও আসে না। সময়ও যেন কাটতে চায় না।

অবশেষে, দূরে ঘোড়ার গলার ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে। ক্রমে তাদের দেখাও যায়। নিকটে সবাই এসেও পৌঁছায়। বেলা এখন ১টা ৪০। এই দীর্ঘ বিলম্বের হেতু শুনি। বরফের উপর দিয়ে ভার-সমেত ঘোড়াগুলিকে আনা সম্ভব না হওয়ায় তাদের পিঠের বোঝা নামিয়ে সহিস ও গাইডরা সেই সব ভার নিজেরাই বয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়। ভারশূন্য হয়েও ঘোড়াগুলি যখন শক্ত বরফের উপরে কেবলি পা পিছলে পড়তে থাকে এবং নরম বরফে তাদের পা বসে যায়, তখন গাইডরা নিরুপায় হয়ে আমাদের বিছানাগুলি খোলে, সব কম্বল বার করে এবং সেই বরফের উপর কম্বল বিছিয়ে ঘোড়াগুলিকে তারই উপর দিয়ে হাঁটিয়ে তবে কোনরকমে পার করিয়ে আনে। সেই কারণেই তাদের পৌঁছুতে এত সময় লেগেছে। দুটা ঘোড়া পায়ে সামান্য আঘাতও পেয়েছে। রুকুমসিং কৈফিয়ত দিয়ে বলে, স্বামিজী, এভাবে আনা ছাড়া উপায়ই ছিল না।

অনুভবানন্দজি সমর্থন করে বলেন, পার করে আনতে পেরেছ, কারো কোন জখম হয় নি, তোমাদের অনেক বাহাদুরি।

তখনি টিফিন কেরিয়ারও খোলা হয়। গত রাত্রের তৈরি করে রাখা লুচি, তরকারি ও চুরমা জলযোগ করে বেলা দুইটার সময় আবার যাত্রা সুরু করি।

লিপুলেখ থেকে নেমে আসা নদী পার হয়ে অপর দিক দিয়ে পথ। আশপাশেও জলের ধারা। পাহাড়ের উপরিভাগ থেকে তুষার গলে ঝরনাধারা পথের মাঝ দিয়েও বয়ে চলে। ছপছপ শব্দ তুলে জল ছিটিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নদী ও ঝরনা পার হতে হয়। ক্রমে দুপাশের পাহাড় সরে যায়। সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

স্বামিজী বলেন, এবার নেমে এলাম তিব্বতের মালভূমিতে।

ধু ধু করে দিগন্তপ্রসারী সমতল ক্ষেত্র,—মরুভূমির মত। তারই উপর দূরে দেখা যায় পাহাড়ের শ্রেণী,—হিমালয়ের তুলনায় কতো ক্ষুদ্র মনে হয়।

তিব্বতের সমতলভূমিতে নেমে এলেও সাগরবক্ষ থেকে এখানকার উচ্চতা তেরো-চোদ্দ হাজার ফুট-এর কম কোথাও নেই।

স্বামিজী বলেন, এখন যে কদিন তিব্বতে বাস, এর চেয়ে নিম্নতর 'অলটিটিউড'-এ আর নামবার উপায় নেই। খাড়া চড়াই উৎরাইও এদিকে বিশেষ পাবেন না, উঁচুতে উঠতে হলে পথ ধীরে ধীরে উঠবে। এ-জায়গাটার নাম 'পালা'। ১৪,০০০ ফুট উঁচু। লিপুলেখ পার হয়ে এসে দরকার বোধ করলে যাত্রীরা এখানেও রাত্রিবাস করে, পরের দিন তাকলাকোট যায়। আজ এখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে, আমরা তাই তাকলাকোটেই চলেছি।

এখানেও পথের পাশে পাথর সাজানো দেওয়াল ঘেরা ঘরের মত। যাত্রীদের বিশ্রামগৃহ, ভেড়াছাগল রাখবার খোঁয়াড়ও। দুর্বিপাকে মানুষের ও পশুর আশ্রয়স্থলের ভেদাভেদ থাকে না।

তবে, নেহাৎ কোন বিশেষ কারণ না হলে যাত্রীরা এখানে রাত্রিবাস করে না। মাত্র মাইল চার পাঁচ এগিয়ে গেলেই তাকলাকোট। সোজা সমতল ভূমির উপর দিয়ে পথ। ভাবি, এখনি পৌঁছে যাব। কিন্তু, আজ দিনশেষে এই সামান্য ও সহজ পথটুকু যেন আর শেষ হতেই চায় না।

পথের নিকটে নদী। নদী থেকে খাল কেটে দিকে দিকে নিয়ে গেছে। এই মরুপ্রায় প্রান্তরেও ফসল ফলাবার চেষ্টা। যব ও মটরের ক্ষেত। তারি মাঝে মাঝে দু'চারটে পাথরের ছোট ছোট ঘর। দূরে দেখা যায় একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে তাকলাকোটের লোকালয়। পাহাড়টি তেমন কিছু উঁচু নয়,—তিনশ' ফুট মাত্র হবে, তবুও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মাথার উপর বিশাল এক অট্টালিকা। সেখানে সিম্বিলিঙ্ গুম্ফা ও তিব্বতের এই অঞ্চলের জুংপান অর্থাৎ গভর্নর বা শাসনকর্তার প্রাসাদ। তিনি সেইখানে বসে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, লিপুলেখ পাশ পার হয়ে কারা তিব্বতে প্রবেশ করছে।

অবশেষে সেই পাহাড়ের নিকটে পৌঁছাই। ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হই। নদীর নাম শুনি ইয়াংসি। দুই তীরেই তিব্বতীদের বসবাস। মাটি ও পাথর গেঁথে চারকোণা ঘর,—বাক্সের মতন। সমতল ছাদ। ছাদে ঘাসের মতন কী সব জন্মেছে। রঙ্গিন লোমের আলখাল্লা-পরা তিব্বতী মেয়ে পুরুষ রাস্তার উপর ছুটে আসে। অবাক হয়ে আমাদের দেখে।

তাকলাকোটের উচ্চতা ১৩,১০০ ফুট। তিব্বতের এই অঞ্চলকে পুরাঙ বলে।

নদীর খাড়া উঁচু পাড়। ওপারে তারই উপর উঠে তাঁবু ফেলা হয়। আশপাশে সারিবদ্ধ ছাদবিহীন পাথর-গাঁথা দেওয়াল। কয়েকদিন পরে এইখানে তাকলাকোটের হাট বা মণ্ডী বসবে। দলে দলে ভারত থেকে বিয়াস্, চৌদাস ও দর্মা পট্টির ভোটিয়া ব্যবসায়ীরা আসবে। এইসব দেওয়ালের মাথায় ছাদের আচ্ছাদন পড়বে, এই শূন্য পরিত্যক্ত স্থান জনপূর্ণ কোলাহলমুখর হয়ে উঠবে। এই বার্ষিক হাটের জন্যই তাকলাকোটের প্রসিদ্ধি। জুলাই ও আগস্ট মাসে মণ্ডী বসে। তিব্বতের বহু অঞ্চল থেকে তিব্বতীরা ব্যবসা করতে আসে। তারা সঙ্গে করে আনে তাদের দেশজ পণ্যদ্রব্য,—উল্, গরম কাপড়, কার্পেট, কম্বল, চামড়া, শিঙ্, লবণ, সোহাগা, সোডা, মাখন, চামর, এমন কি সোনাও, এ ছাড়া তিব্বতী ঘোড়া, কুকুর, ঝব্বু, ভেড়া ছাগল ইত্যাদি বেচাকেনারও হাট বসে। ভারতীয় ও নেপালী পাহাড়ীরা বিক্রয় করতে আনে,—চাল গম যব চিনি, গুড়, মিছরি, শুক্‌না ফলমূলাদি খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, তামাক, মশলা, কেরোসিন তেল, বাসনকোসন ইত্যাদি। প্রায় দুমাস কাল এইভাবে বাজার চলে। উভয়পক্ষের পণ্য বিনিময়ে—barter প্রথায়—ক্রয়বিক্রয় হয়। তিব্বতে তিব্বতীয় মুদ্রার প্রচলন আছে, কিন্তু এ বাজারে তার বিশেষ ব্যবহার হয় না। রূপা মিশিয়ে তৈরি তিব্বতী মুদ্রাকে ওখানে বলে,—তঙ্কা। আমাদের দেশের অনেকটা আধুলির আকার। তবে পাতলা, ও তেমন সুগোল নয়। ভারতীয় টাকার হিসাবে মাত্র সাড়ে চার আনা মূল্য। তিব্বতে আমাদের দেশের টাকাও যথেষ্ট চালু আছে। তিব্বত মরুপ্রায় ঊষর প্রদেশ। চাষআবাদ অতিশয় অল্প। তিব্বতীরা তাই সারা বছরের আহার্য সংগ্রহ করে রাখে এই ধরনের মণ্ডী থেকে। সেই সুযোগে বিলাতী ও জাপানী সুলভ শৌখিন সামগ্রীরও এদেশে প্রচলন হচ্ছে, কয়েকজন তিব্বতীর বেশভূষা ও অলঙ্কার দেখে তার প্রমাণ পাই।

তিব্বতে ব্যবসায় করতে যাবার জন্যই হিমালয়ের বিভিন্ন তুষারগিরিবর্ত্ম বা পাশগুলির ব্যবহার। গার্বিয়াঙের নিকটে যেমন লিপুলেখ পাশ, তেমনি আরও কিছু দূরে মিলাম গ্রামের নিকট মিলাম পাশ, আরও পশ্চিমে নিতিগ্রাম ছাড়িয়ে নিতি পাশ, বদরীনাথের উপরে মানাপাশ প্রভৃতি। প্রতি বছর এই সকল পাশ দিয়ে তিব্বত প্রবেশের অনুমতি দেবার আগে ঝুম্‌পান একজন প্রতিনিধি পাঠান, ভারতের পার্বত্য লোকালয়ে বা ভারবাহী পশুদের মধ্যে কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে কিনা তারই অনুসন্ধান নিতে। ভোটিয়া

ব্যবসায়ীগণ সেই প্রতিনিধিকে একটা শিলাখণ্ড দেন এবং তিব্বতে কোন রকম রোগ প্রবেশ করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁরা তিব্বত সরকারকে সেই শিলাখণ্ডের ওজন অনুযায়ী সোনা দেবার অঙ্গীকারে তিব্বত প্রবেশের অনুমতি পান। তিব্বতে ব্যবসায় করার জন্য তিব্বতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট থেকে অনুমতি বা ট্রেড-লাইসেন্সও ভারতীয়দের নিতে হয়, এর জন্যও নগদ টাকা বা পণ্যদ্রব্যের অংশ ফী-বাবদে দেব। এ ছাড়া মণ্ডীতে বেচাকেনার উপরও তিব্বত সরকার কমিশন বা দস্তুরি আদায় করে।

তাকলাকোট বড় বাণিজ্য কেন্দ্র হলেও এ-সময়ে শান্ত।

আজ ভোরে পাঁচটার আগে যাত্রা সুরু করে এই বেলাশেষে সাড়ে পাঁচটায় সাঙ্গ করা। প্রায় মাইল ১৫।১৬ পথ অতিক্রম করে আসা। পরিমাপে দীর্ঘতা তেমন কিছু অস্বাভাবিক না হলেও, দুর্গমতায় এ-যাত্রা অবিস্মরণীয়।

সকলেই আজ অতিশয় ক্লান্ত। দেশে সুধীরের মাথা-ধরা রোগ ছিল। কিন্তু এই কৈলাস-যাত্রাপথে এতদিন পরে আজ প্রথম সেই রোগ দেখা দিল। সারাদিন ব্যাপী এত অনিয়ম, এত অত্যাচার, এত কষ্ট ও ভয়ভাবনার ফলে যদি মাথা ধরে আশ্চর্য হবার কী আছে?

ভিষক্‌রাজ ব্রহ্মচারীজি তার এক অদ্ভুত চিকিৎসা করেন। সুধীরের দুই হাত দৃঢ় বাঁধনে বেঁধে শুইয়ে দেন, তার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে ঝাড়ফুঁক করেন, বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্রোচ্চারণ করেন। বেচারী সুধীর কিছুক্ষণ পরে স্বীকার করে, মাথা ধরা কমেছে।

আজ ক্লান্তদেহে আমরাও ব্রহ্মচারীজির শরণার্থী। সকলকেই তিনি বিষাণ-ভস্ম সেবন করালেন। তাঁর ঔষধগুলির যাতে সদ্‌ব্যবহার হয় এবং বিনা ব্যবহারে ফিরেও না যায়, এই সাধু উদ্দেশ্যে কয়েকদিন থেকে যখন যেটার অনুপান পাওয়া যায়, তাই খেতে আরম্ভ করেছি। তার মধ্যে কয়েকটি ঔষধ অতি মুখরোচক, অম্লমধুর, চাটনির মতন।

সাতটার সময় চা, বিস্কুট ও ব্রহ্মচারীজির ঔষধ সেবন করে শুয়ে পড়ি।

পাশের তাঁবুতে ভানসিং রান্না চড়ায়, তার শব্দ শুনি।

সুরেন্দ্র মহারাজ নিঃশব্দে তাঁর ভাণ্ডারের জিনিসপত্র গোছগাছ করেন। বলেন, যে ভাবে আজ সব আনা, দেখে নিই, কোন কিছু ভাঙল বা পড়ে গেল কিনা।

ঝুম্‌পানের চর এসে হাজির হয়। আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য জানা ও

গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা তার কাজ।

অনুভবানন্দজি প্রেমসিং ও কিচকে ডেকে পাঠান। তাদের সাহায্যে তাকে বোঝাতে থাকেন, আমরা নিছক কৈলাস তীর্থযাত্রী, তিব্বতে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

লোকটি সংবাদ জেনে সন্তুষ্ট মনে চলে যায়।

ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের তিব্বতের এ অঞ্চলে আসার কোন বাধানিষেধ নেই। তীর্থপথ ছেড়ে অন্যত্র কোন দিকে যেতে হলে ঝুম্‌পানের অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয়।

আজ আহারাদি শেষ হতে রাত দশটা বাজে।

শয্যাগ্রহণের পূর্বে তাঁবুর বাইরে আসি। আশ্চর্য লাগে দেখে, এখনও বাইরে সুস্পষ্ট দিনের আলো।

স্বামিজী হেসে বলেন, সুধীরবাবু, এটা দিনের আলো নয়, তিব্বতের রাত্রেরও এমনি রূপ। তাকিয়ে দেখুন আকাশের দিকে। এও এদেশের এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

অবাক হয়ে দেখি, রজনীর ঘনকালো আকাশ নয়। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যেন নির্মল নীল সরোবর। শুধু চন্দ্রমার শুভ্রজ্যোতি নয়, অগণিত নক্ষত্রের হীরকোজ্জ্বল দীপ্তি। দেখে মনে হয়, যেন আকাশের দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছি। কতো নিকটে দেখায় তারাগুলি।

স্বামিজী বলেন, এখানে ত আর আপনাদের সভ্য শহরের ধোঁয়া ধুলা নেই, বায়ুমণ্ডলও অতি সূক্ষ্ম, তাই তারাগুলিও জ্বলে যেন এক-একটা টর্চের আলো।

॥ ৪ ॥

সকালে উঠে জিনিসপত্র গোছগাছ করে আবার যাত্রার জন্য তৈরি হতে হয়। ইচ্ছা ছিল, পাহাড়ের উপর উঠে সিম্বিলিং গোম্ফা দেখে আসি। কিন্তু, অনুভবানন্দজি বলেন, তিব্বতী মঠ ওদিকে মানস সরোবরের ধারে গিয়ে দেখবেন, আর, ফেরবার পথে এখান থেকে খোচরনাথ যাবেন। এখন আর পথে দেরি করা নয়, মানস সরোবর কৈলাস দর্শন আগে হয়ে যাক্। আমাদের যাত্রার সব আয়োজন গার্বিয়াঙ থেকেই করে আনা হয়েছে, তাকলাকোটে থাকবার তাই কোন প্রয়োজন নেই। এখানে নিশ্চিন্ত মনে সুস্থির হয়ে

থাকবার উপায়ও নেই দেখবেন। তাঁবুর বাইরে এরি মধ্যে কি রকম ভিড় জমতে সুরু হয়েছে! বেলা হলে আরও বাড়বে।

প্রকৃতই তাই। তাঁবুর বাইরে যাতায়াতের পথ বন্ধ হবার উপক্রম। দলে দলে গ্রামবাসীরা এসে জমায়েত হচ্ছে।

সুধীর বলে, এ যেন আমরা সার্কাস পার্টি, গ্রামে এসে তাঁবু ফেলেছি! বাইরে গিজ্‌গিজ করছে লোকজন আমাদের দেখবার জন্যে।

আমরাও বাইরে বেরিয়ে তাদের দেখতে থাকি। তারাও আমাদের দিকে তাকায় বিস্ময় ও কৌতূহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে। ভাবে হয়ত, এরা কোথাকার অদ্ভুত মানুষ! বেশভূষাও কী বিচিত্র!

আমরাও তাদের দেখি, কী লম্বাচওড়া এক-একটা দেহ,—দৈত্যদানবের মত। লম্বাটে ধরনের মুখ। পুরুষদেরও দাঁড়িগোঁফ নেই,—মাকুন্দ। সবারই মাথায় বেণী। কে যে পুরুষ, কে যে মেয়ে বোঝাই শক্ত। প্রকাণ্ড শরীরের উপর ঝলঝলে লোমসমেত চামড়ার পোশাক,—ডবল ব্রেস্‌টেড আলখাল্লার মতন। কোমরে কোমরবন্ধ। গাঢ় লালরঙের প্রচলন বেশী। পুরুষদের অনেকের মাথায় 'ফেল্‌ট হ্যাট'! তাদেরও কানে ও গলায় অলঙ্কার। বুকের কাছে পিতল বা তামার চৌকা ছোট লকেটের মত,—তাতে মণি-মন্ত্র লেখা। গহনাগুলি বেশীর ভাগ রূপার তৈরি—পলা এবং নীল ও সবুজ রঙের পাথর-বসানো। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু পশমী জুতা, তাতেও নানা রঙের বাহার। শুনি, এ ধরনের জুতাকে লাম Lham বলে। মেয়ে ও পুরুষ প্রভেদ করার কয়েকটি উপায় আছে। কোন কোন মেয়েদের দেহের সুমুখ দিকে কোমর থেকে পা পর্যন্ত লম্বা ডুরেকাটা রঙ্গিন একটা গরম কাপড় ঝোলে—apron-এর মত। সম্ভবতঃ লজ্জারক্ষণী ভাবে এর ব্যবহার। অনেকের হাতে উলের বাণ্ডিল,—মোজা, জুতা বা জামা বুনছে। ওদের মধ্যে যারা সঙ্গতিপন্ন বা ভদ্র পরিবারের তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে কারো কারো পিঠে-ঝোলানো বেণীতে নানারকম অলঙ্কারের সাজ,—রঙ্গিন পাথর, কড়ি, প্রবাল ইত্যাদি বসানো। কেউ আবার পিঠের দিকে একটা পশুলোমের আবরণী চাদরের মত ব্যবহার করে। অধিকাংশ মেয়েদের গালে, নাকে ও কপালে লাল অথবা কালো রঙের কী এক পদার্থের প্রলেপ লাগানো। মুখমণ্ডলের অঙ্গরাগরূপে এর ব্যবহার কিনা জানি না,—কিন্তু আমাদের চোখে দেখায় যেন সঙ্‌-এর মতন। তবে, দেশকাল ভেদে সৌন্দর্যের পরিকল্পনা বিভিন্ন হওয়া

বিচিত্র নয়। না হলে, চীনদেশে মেয়েদের পা ছোট করে বিকলাঙ্গ হয়ে কাঠের জুতা পরার প্রথা চালু হয় কি করে ?

কিন্তু এখানে এই প্রলেপ ব্যবহারের হয়ত অন্য এক যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে। তিব্বতে প্রতিদিন বেলা দশটা-এগারোটা থেকে ঝড়ের মত বাতাস হইতে স্বরু হয়। এ বাতাস কতো হিমশীতল ও তীক্ষ্ণ, ভুক্তভোগী ভিন্ন কারও কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এক দিকে এই নিষ্করুণ প্রচণ্ড বায়ুবেগ, অপর দিকে তেমনি প্রখর সূর্যকিরণ,—বিপরীতধর্মী এই দুই প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। গায়ের চামড়া প্রথমে গাঢ় রক্তবর্ণ ও পরে পোড়া কয়লার মত কালো হয়ে ফেটে যায়, রক্ত ঝরে পড়ে। এরই হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই বোধ করি ঐ প্রলেপের ব্যবহার। সম্ভবতঃ মাখন জাতীয় কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি।

আমরাও অতি যত্ন সহকারে দুদিন থেকে দেহের যেটুকু অংশ জামাকাপড়ে ঢাকা থাকে না—অর্থাৎ মুখ ও নাকে,—তেলা ক্রীম্ লাগিয়ে রাখি।

তাঁবুর একেবারে নিকটে এসে যে তিব্বতীরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাদের বেশভূষা অত্যন্ত ময়লা ও শতচ্ছিন্ন। তালি-লাগানো ভেড়ার চামড়ার ঝলমল পোশাক। মুখ-হাতও তেমনি নোংরা। গা থেকে বিকট দুর্গন্ধ বার হচ্ছে। অনেকেরই চোখের অসুখ। পিচুটি ভরা। ঘোর রক্তবর্ণ। হয়ত এখানকার বাতাস ও তীব্র রৌদ্রই এর কারণ। লোকগুলিকে দেখলেই মনে হয় বর্বর। আচরণও তেমনি। কয়েকজন হুড়মুড় করে তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ে। আমাদের জিনিসপত্র ঘাঁটতে স্বরু করে। বারণ করব কি, চেহারা দেখে সাহস হয় না। দেখে মনে হয়, তাদের এই আচরণ যে কতোখানি অন্যায়, অভদ্র ও অশোভন সে কাণ্ডজ্ঞানই তাদের নেই। ভাবটা যেন, মনে কৌতূহল জেগেছে, এগিয়ে এসে তাই মেটাচ্ছি, এতে আবার হয়েছে কি ?

কিন্তু আমাদের আশঙ্কা জাগে, কোনটা বুঝি বা ভাঙে, কিংবা নিয়েই চলে যায়।

সুধীর ব্যস্ত হয়ে কিচ্ ও কুঙ্কুমসিংকে ডাকে। তারা এসে জিনিসপত্র রক্ষা করে, কী সব বলে তাদের তাঁবুর বাইরে কোনমতে নিয়ে যায়।

এই সম্পর্কে তিন বছর আগেকার এক ঘটনা শুনি।

সাধারণ যাত্রী নয়,—মহীশূরের মহারাজা তাকলাকোটে পৌঁচেছেন।

ঝুম্‌পান খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা চলছে। মহারাজার হাতের আঙুলে হীরার আংটি। আলো পড়ে মাঝে মাঝে জল্‌জ্বল্‌ করে উঠছে। ঝুম্‌পানের হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সেই আংটির উপর। কথা নেই বার্তা নেই, ফট করে এগিয়ে গিয়ে মহারাজার হাত ধরলেন। আংটি খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। অবশেষে নিজের হাতের আঙ্গুলে পরে চোখ কুঁচকে দাঁত বার করে মুখে মহা খুশি-খুশি ভাব প্রকাশ করলেন।

মহারাজা সে আংটি আর ফেরত পান নি। তিব্বতে বসে ঝুম্‌পানের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়ত সাহসীও হন নি। শুনি, তিনি নাকি তিব্বত থেকে স্বদেশে ফিরে মন্তব্য করেছিলেন, ও-দেশ অসভ্য দস্যুর জায়গা।

বহুমূল্যের অভিজ্ঞতা তাঁর!

তাঁবুর ভিতরে বসে তিব্বতীদের লক্ষ্য করি। স্বামিজীদের 'কাশীলামা' বলে উল্লেখ করে তারা আঙুল দিয়ে দেখায়।

অনুভবানন্দজি বলেন, ভারতীয় সব সাধুসন্ন্যাসীদের এখানে কাশীলামা নামেই প্রচার। ভারতের প্রধান ধর্মক্ষেত্র কাশী, এ খবরটা এরা জানে, তাই হয়ত ভাবে, সাধুরা সকলে সেখান থেকে আসেন।

তাঁবুর বাইরে একপাশে রোদে একটি তিব্বতী সরে গিয়ে বসল দেখলাম। তার পিঠে ঝোলানো কি এক কালো বস্তু। হাত ঘুরিয়ে সেটা টেনে নিল। তারপর দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেতে শুরু করল। জিনিসটা কী, কৌতূহল জাগে। কিচ্‌কে জিজ্ঞাসা করে যা শুনি তাতে শিউরে উঠি। কাঁচা মাংস ভক্ষণ চলেছে।

তিব্বতে জ্বালানী কাঠের অভাব। দরিদ্র তিব্বতীরা আগুন পাবে কোথায়? তাই কাঁচা মাংস পিঠের উপর ঝুলিয়ে রাখে, রোদের তাপে যতটুকু ঝল্‌সে যায়, তাই লাভ। প্রচণ্ড শীতের দেশে মাংস পচে নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, প্রকৃতি 'রেফ্রিজ্যারেটরের'—হিমায়ন যন্ত্রের কাজ করে।

সুধীর বলে, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, তিব্বতীরা এতো নোঙ্‌রা অপরিষ্কার ভাবে থাকলেও তাদের দাঁতগুলো অমন ঝকঝকে পরিষ্কার আর আকারেও বড় হয় কেন। কাঁচা মাংস সভ্য জগতের টুথ্‌-ব্রাশ-এর চেয়েও অনেক ভাল কাজ করে, জাজ্বল্য প্রমাণ দেখছি।

স্বামিজী বলেন, আরও কতো কী দেখতে পাবেন এ-দেশে, সুধীরবাবু

কিন্তু রাক্ষসের ভোজন দেখবার আর সময় নেই, আমাদেরও আহারপর্ব শেষ করতে হবে, চলুন। সুরেন মহারাজ তাগাদা দিচ্ছেন। খাওয়াদাওয়া সেরে এবার যাত্রা করতে হবে।

বেলা ১০টা ২০ মিনিটে তাকলাকোট ছাড়া হয়। গতকালের সেই লিপুলেখ অতিক্রম করে আসার অপরিসীম ক্লান্তি ও দুর্বহ দুশ্চিন্তা এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। মনে হয় যেন সে কোন্ এক অতীত যুগের ঘটনা।

পথের সুমুখে এখন আর দুরূহ চড়াই উৎরাই নেই, কুজ্ঝটিকার ঘন অন্ধকারও নেই। ধূ ধূ করে বালুময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রখর সূর্যালোকে দিগ্‌দিগন্ত তপ্তকাঞ্চনের মত দেখায়।

তাকলাকোটের ঘরগুলি ছাড়িয়ে আসতেই সুধীর সবিস্ময়ে বলে ওঠে, ওদিকে মাঠের ওপর দিয়ে লোকটা এগিয়ে আসছে কীসের ওপর চড়ে? ভালুক নাকি?

নিকটে এলে দেখি, ভালুক নয়,—ঝব্বু। দেখতে ভালুকেরই মতন,—তেমনি কালো, তেমনি লোমশ, তেমনি বীভৎসও!

স্বামিজী বলেন, ইয়ক্ হোল খাস তিব্বতী বলদ। তিব্বতের প্রচণ্ড শীতে, বরফের মধ্যে কিংবা অতি দুর্গম পথ দিয়ে তারা যাতায়াত করতে কাবু হয় না, কিন্তু পাহাড়ের নীচের দিকে নিয়ে গেলে—বা শীতের রাজ্য ছাড়তে হলে তারা আর কোনমতেই সেখানে থাকতে পারে না। ঝব্বুগুলো হোল তিব্বতী বলদ আর ভারতীয় গোরুর মিলনজাত জীব,—তারা শীতের দেশেও যেমন, খানিক গরম জায়গাতে নেমে গেলেও তেমনি কাজ দিতে পারে। এদেশে এইসব ইয়ক্, ঝব্বু শুধু ভার বইবার কাজেই ব্যবহার হয় না, এদের নাকে দড়ি বেঁধে পিঠে চড়েও লোকজন যাতায়াত করে, দেখতেই পাচ্ছেন। সুধীরবাবু, এসেছেন দেবাদিদেব মহাদেবের রাজ্যে, তাঁর বাহনের মর্যাদা কেমন অক্ষুণ্ণ আছে এখানে, দেখুন একবার।

আধ মাইলটাক যাবার পর খানিকটা নীচে কর্ণালী নদীর কূলে নামতে হয়। নদীর পাড়ে পাহাড়ের মতো উঁচু জমির সৃষ্টি হয়েছে পিণ্ডীভূত নুড়ি, মাটি, বালি, কাঁকর ও পাথরের টুকরার সংমিশ্রণে (conglomerated earth) সেই পাহাড়ের খাড়া গায়ে বহু গুহা। যেন প্রকাণ্ড দেওয়ালে বড় বড় পায়রার খোপ। তার মধ্যে লোকজনও বসবাস করে দেখতে পাই। গুহায় দরজা জানলাও রয়েছে। জায়গার নাম শুনি গুকুং। পথের পাশে রোদে বসে মেয়েরা

তাঁতে কাপড় বুনছে। নদীর ধারে মাঠে চাষ হচ্ছে। কড়াইশুঁটি, জোয়ার, যব ও গমের ক্ষেত। মেয়েরাই ক্ষেতের কাজ করে। নদী থেকে ছোট খাল কেটে চারপাশের ক্ষেতে জল সরবরাহ হয়েছে।

কর্ণালী বা মাপচু নদীর উপর ছোট পুল। পুলের এমন অবস্থা, ঘোড়ায় চড়ে পার হওয়া বিপজ্জনক। তবে জলের স্রোত হিমালয়ের নদীগুলির মত ভয়ঙ্কর নয়।

স্বামিজী বলেন, ফেরবার সময় খোচরনাথ মঠ দেখতে এই নদী ধরে যেতে হবে,—তাকলাকোট থেকে মাইল বারো দূর। এখন আমাদের চলা—ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে মান্ধাতা পর্বত,—তাই লক্ষ্য করে। ঐ পাহাড়ের অপর দিকে রাক্ষসতাল।

নদীর এদিকেও সবুজ ক্ষেত। পুরাঙের এই অঞ্চল দেখে মনে হয় না তিব্বত মরুপ্রায়। নদীর জলের সুবিধা থাকায় ও তার সদ্ব্যবহারের ফলে এখানে কিছু পরিমাণ ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে। না হলে তিব্বতে বৃষ্টি হয় অতি কম, যদি বা কচিৎ কখনো দুচার ফোঁটা পড়ে তাতে মাটি ভেজে না, শুষ্ক আব্‌হাওয়ায় তখনি মিলিয়ে যায়। ক্ষেতের আশপাশের জমি ও পথের চেহারা দেখলে এ কথা বোঝা যায়, এখানে জমি বলতে শুধু বালি ও পাথর। যেমন চাষের জমির এদেশে অভাব, তেমনি জনবিরলতাও। তাকলাকোট ও গুকুং ছাড়িয়ে এসে ক্ষেতের কাছাকাছি যে কয়েকটি লোকালয় দেখছি, তাদের গ্রাম বলা সাজে না,—দু'তিনখানা মাত্র ঘর। কিন্তু এরাই গ্রাম বলে এখানে পরিচিত। সেই রকম :একটা গ্রামের নিকটে একঝাড় পপ্‌লার গাছ দেখে মনে আনন্দ পেলাম। বোধ করি বহু যত্নের ফলে এদের এদেশে জন্ম হয়েছে।

পথের মাঝখানে এক জায়গায় প্রকাণ্ড দুটি চোরটেন,—বৌদ্ধস্তূপের মত। গায়ে বহু পাথর সাজানো। পাথরের উপর তিব্বতী ভাষায় নানান কিছু লেখা। কোথাও বুদ্ধদেবের বা কোন দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা। 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' লেখাগুলি পরিষ্কার পড়া যায়।

স্বামিজী বলেন, এখন থেকে মাঝে মাঝে পথে এই ধরনের চোর্‌টেন ও মণিপ্রাচীর দেখতে পাবেন। এসব চোর্‌টেন কোন বৌদ্ধ ধর্মগুরুর উদ্দেশ্যে কিংবা কোন মৃত ব্যক্তির স্মারক স্তম্ভ ভাবে তৈরি হয়। তিব্বতী ভাষায় লেখা পাথর যেগুলা ওর গায়ে সাজানো রয়েছে, সাধারণতঃ সেসব পুণ্যার্থী তীর্থ-যাত্রীদের রেখে যাওয়া,—তাদের নামধাম লেখা। যেমন, আমাদের দেশে

মন্দিরের উঠানে নাম-ধাম লেখা মার্বেল পাথর বসানো দেখতে পাওয়া যায়। এইসব চোর্‌টেন ও মণিপ্রাচীর পথের মাঝখানে থাকলে সেগুলি দক্ষিণে রেখে বাঁ দিকের পথ দিয়ে যেতে হয়, ফেরবার পথেও ঐ এক নিয়ম,—অর্থাৎ যাতায়াতে এগুলার পরিক্রমা হয়ে যায়। এ নিয়ম গাইড্ ও সহিসরা নিজে মেনে ত চলেই; ঘোড়াগুলিও যাতে ঠিক সেইমত যায় তার দিকেও দৃষ্টি রাখে। ঐ দেখুন, মালের একটা ঘোড়া চোর্‌টেনের ডান দিকের পথে এগুচ্ছিল,—রঞ্জন ছুটে গিয়ে এদিকে ফিরিয়ে আনছে মুখের দড়ি ধরে। এরা বিশ্বাস করে পুণ্যলাভে অধিকার শুধু মানুষেরই নয়, সব জীবজন্তুরও।

আরও মাইলখানেক এগিয়ে গিয়ে আবার একটি গ্রাম। নাম শুনি টোয়ো। পথের অদূরে চোর্‌টেনের অনুরূপ পাথরের প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ গাঁথনি। জোরাবর সিং-এর সমাধি। তিনি ছিলেন জম্মুর মহারাজা গুলাব সিংজির প্রধান সেনাপতি। তিব্বতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে তিনি লাডাক জয় করেন এবং ১৮৪১ সালে লাসা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সৈন্যবল নিয়ে মানস সরোবর কৈলাস অঞ্চলে উপস্থিত হন। সংগ্রাম-অনভিজ্ঞ তিব্বতীরা সেই রণকুশল সেনাদলের হাতে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। বিজয়ী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যাত্রাপথে যতগুলি তিব্বতী গোম্ফা, মঠ, গ্রাম ইত্যাদি পড়ে সব লুঠতরাজ হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তিব্বতের এই পুরাঙ্ অঞ্চল দেখায় যেন শ্মশানভূমি। তাকলাকোটেও জোরাবর সিং সেনাসমাবেশ করে কিছুকাল কাটান। ইতিমধ্যে তিব্বতীদের সহায়ক বিপুল চীনা সৈন্যবল এসে হাজির হয়; তিব্বতের দুর্দান্ত শীতঋতুও দেখা দেয়। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে জোরাবর সিং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন্। তাঁর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে তিব্বতীরা জয়োল্লাস করে। কিন্তু, পরম রহস্যময় মানবমনের পরিণতি। জোরাবর সিং তিব্বতের শত্রুতা করে সেদেশে প্রাণ হারান। অথচ, সেই তিব্বতীরাই জোরাবর সিং-এর বীরত্ব দেখে এমনি সম্মোহিত হয় যে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিরাট তান্ত্রিক পুরুষ ছিলেন এবং শত্রু হলেও, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র ও মৃতদেহের খণ্ডিত অংশ তিব্বতী মঠে সযত্নে রক্ষা করে; তাঁর মৃত্যুস্থলে —টোয়োতে—এই স্মৃতিস্তম্ভও গড়ে তোলে। পরম শত্রুর এইভাবে স্মৃতিরক্ষা জগতে আর কোথাও কি আছে?

আজ প্রায় একশ বছর পরে সেই রণভূমির পাশ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে এখন চলেছি। প্রচণ্ড রৌদ্রের প্রখর দীপ্তি চারদিক থেকে ঠিকরে আসে। আবার,

তুষার-শীতল তীক্ষ্ণ বাতাসও ঝড়ের মত বইতে থাকে। বালুকণা উড়ে এসে চোখেমুখে বেঁধে। বাতাস ও রৌদ্রের হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে চোখে রঙ্গিন চশমা লাগাতে হয়েছে। 'বানর'-টুপি ও গলাবন্ধে মাথা, মুখ সবই ঢাকা। নাকের যে সামান্য অংশটুকু বাইরে রয়েছে সেই রন্ধ্রপথে কিছুক্ষণ থেকে একটা দুর্গন্ধ পেতে থাকি। ভাবি বুঝিবা পথের একপাশে কোথা থেকে আসছে। কিন্তু এগিয়ে চললেও গন্ধ কমে না, এ যে সঙ্গে সঙ্গে চলে! ব্যাপার কী? সুধীর অনুসন্ধান করে। দুর্গন্ধের উৎসও ধরা পড়ে।

গতকাল লিপুলেখ পার হবার সময় যে দুটি ঘোড়া সামান্য আঘাত পেয়েছিল, তার মধ্যে হতভাগ্য আমার ঘোড়াটিও ছিল। তাই তাকে খানিক বিশ্রাম দেবার জন্যে রুকুমের বাবার মালবাহক ঘোড়াটি আজ আমাকে চড়তে দিয়েছে। আমার ঘোড়াটির পিঠে সামান্য বোঝা চাপিয়ে নিয়ে চলেছে। এখন যে-ঘোড়ার পিঠে বসে আমি চলি, তার একপাশে চামড়ার থলিতে রুকুমের বাবার আনা মদের রসদ ঝুলছে এবং সেখান থেকেই এই দুর্গন্ধ ওঠে। ঘোড়ার পিঠ থেকে খুলে অন্যত্র কোথাও নিতে বলায় বৃদ্ধ কারণ বোঝে না, অবাক হয়, হাবভাবে প্রকাশ করে,—এ তো খুব ভাল জিনিস,—অতি সুগন্ধি,—এতে আপত্তি হবার আছে কী।

তিব্বতের বিস্তীর্ণ মালভূমি। কেবলি কাঁকর, বালি, পাথর। মাঝে মাঝে দু'একটা শীর্ণ নদীর স্বচ্ছ জলের ধারা। ছপ্‌ছপ্ শব্দ তুলে জল ছিটিয়ে ঘোড়াগুলি অনায়াসে পার হয়। হয়ত কোথাও সামান্য চড়াই। পথের পাশে পাথর-জড়-করা স্তূপ বা লাপ্‌ৎচে। ধু ধু করে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর—মরুভূমির মত। বহুদূরের পাহাড় দেখায় যেন অতি নিকটে। সেখানকার পাথরের গায়ের রেখাগুলি পর্যন্ত অতি স্পষ্ট বোঝা যায়। সুধীর বলে, ওখানে বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। স্বামিজী হেসে ওঠেন। বলেন, ও কী এখানে মনে করছেন? ব-হু-দূ-র! এখানকার পরিষ্কার আব্‌হাওয়ায় মনে হয় নিকটে;—চোখের এমন ভ্রম এই আজব দেশে আরো হবে, সুধীরবাবু!

ঘোড়ার ওপর বসে সবাই এগিয়ে চলি। তাকলাকোট থেকে মাইল দশ এগার আসা হয়। বেলা ৩টা ১০ মিনিট। একটা নদীর ধারে পৌঁছুই। আজ এইখানে তাঁবু পড়বে। নদীর ওপারে কিছুদূরে দু'তিনটি ঘর। তিব্বতী ছোট মঠ বা গোম্ফা। জায়গার নাম শুনি রুঙ্‌গুঙ্,—১৪,৪০০ ফুট উঁচুতে।

নদীর নামও তাই। চারদিকের ময়দান দেখে বিশ্বাসই হয় না অতো উঁচুতে রয়েছি।

তাঁবুগুলি খুব কাছাকাছি খাটানো হয়। যেন জড়সড় করে এক জায়গায়। শীতভয়ে নয়, এখানে নাকি তিব্বতী দস্যুদের উৎপাতের আশঙ্কা।

সারা বিকেল নদীর ধারে ঘুরে ঘুরে কাটাই। আমাদের দল ব্যতীত জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। বালি কাঁকর ভরা নদীর বিশাল চর। তারই বুকে আঁকাবাঁকা অগভীর কয়েকটি জলধারা। যেদিকে তাকাই প্রকৃতির নিঃসীম শূন্যতা। খাঁ খাঁ করে চারিদিক। নদীর পাড়ে আশেপাশে মাঝে মাঝে কাঁটাগাছের ঝোপ। পাতা নেই, কাঁটা সার। আমাদের ঘোড়াগুলি ছাড়া পেয়ে দেখি সেই কাঁটাগুলিই টেনে ছিঁড়ে খায়। ভাবি, অভাবে সবই সম্ভব। উটও তো মরুভূমিতে কাঁটা খেয়ে থাকে শুনি। এদেশে আবার জ্বালানী কাঠের অভাবে এই কাঁটাগাছগুলিই আগুন জ্বালাতে কাজ দেয়। অবশ্য সহজে জ্বলতে চায় না, হাপরের সাহায্যে কোন রকমে জ্বালানো চলে। জুনিপার জাতীয় দেখতে। তিব্বতীরা বলে, ডামা। জ্বালানী রূপে ঘুঁটেরও অবশ্য ব্যবহার আছে।

সহযাত্রীদের সংবাদ নিতে চলি। সকলেই বেশ আনন্দে রয়েছেন। মাদ্রাজীরা ছাতু ভিজিয়ে খাবার আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁদের সেই অতিথি যুবা সাধুটি সুস্থবোধ করছেন,—কম্বল জড়িয়ে জড়সড় হয়ে তাঁবুর মধ্যে বসে আছেন। মনে হয়, শীতে কাবু হয়েছেন।

গাইড্ ও সহিসদের তাঁবুর সুমুখে উনান জ্বলছে। সেই কাঁটাগাছ সংগ্রহ করে এনেছে। হাপরের সাহায্যে আগুন জ্বলছে, একজন সারাক্ষণ হাপর চালাচ্ছে। উনানের উপর ডেকৃচি চাপানো,—টগবগ করে চা ফুটছে। চায়ের মজলিশ সরগরম।

দুপুরের সেই দুর্দান্ত ঝড়ো বাতাস বিকেলবেলা শান্ত হয়েছে, শীতের প্রবলতা আরও আত্মপ্রকাশ করছে। নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এসে কম্বলে গা ঢাকা দিয়ে বসি।

কিচ্ আসে। আমাদের তাঁবুর সামনে বসে। সুধীরের সঙ্গে গল্প জমায়। ভাঙা ভাঙা বাঙ্‌লায় কথা বলে। বাঙ্‌লাদেশ—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার তার অসীম কৌতূহল। তিব্বতের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তুলনামূলক উল্লেখ করে। বলে আপনাদের মুলুকে একজন পুরুষ, শুনেছি,

কয়েকটা বিয়ে করতে পারে—

সুধীর বলে, সে-প্রথা এখন উঠে গেছে —

কিচ্ ঘাড় নেড়ে বলে, তা হলেও আপনাদের দেশে এক এক বাড়িতে কয়েকজন ভাই থাকলে ততগুলি বউ আনতে হয়, তাদের ছেলেপিলেও অনেক হয়, আবার তাদেরও বউ আসে। একটা বাড়ির সংসার কতো বড় হয়ে পড়ে। তিব্বতে কিন্তু তা হয় না। এখানে এক ভাই শাদি করলে, সেই জানানাই সব ভাই-এর বৌ হয়ে থাকে। জমিজমা যা কিছু সবাই মিলে ভোগ করে। সুধীর হেসে বলে, জমি নিয়ে ঝগড়া না বাঁধলেও হয়ত বৌ নিয়ে বাঁধে। এ দেশে মেয়ের সংখ্যা কম,—তাই হয়ত এই প্রথা। এই জন্তেই এদেশে দেখছি লোকজনও বোধ হয় কম জন্মায়।

কিচ্ বলে এদেশে লোক বেশি হলে খেতে পাবেই বা কী করে? ফসল কতোটুকুই বা হয়?

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা নামে। কিচ্ উঠে পড়ে, বলে, দেখি ঘোড়াগুলা সব এনে ঠিক করে বাঁধা হোল কিনা।

এখানে পৌঁছানোর পর ঘোড়াগুলিকে চরবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন একে একে তাদের ধরে এনেছে। তাঁবুর সামনে সারি সারি কয়টা কাঠের খুঁটি পোঁতা হয়েছে, তাতে লম্বালম্বি ঝব্বুর-লোমে তৈরি মোটা দড়ি বাঁধা, তাইতেই ঘোড়াগুলিকে বেঁধে রাখা হয়,—সারারাত ঐভাবেই থাকবে।

রাত্রে খেতে বসে দেখি, সহযাত্রীদের আজ মাংসভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। সমীপস্থ মঠ থেকে রুকুম সিং সংগ্রহ করে এনেছে। তিব্বতী ভেড়ার মাংস।

অনুভবানন্দজি বলেন, সুধীরবাবু, এদেশে ভেড়া মারবার অদ্ভুত এক পদ্ধতির কথা শুনে নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন। এদের বৌদ্ধধর্মে জীবের রক্তপাত নিষেধ। তাই এরা করে কি, ভেড়ার মুখ নাক দড়ি দিয়ে এমনি শক্ত করে বাঁধে যে শ্বাসরোধ হয়ে প্রাণীটি মারা যায়। এরা ততক্ষণ ক্রমাগত ওঁ মণি পদ্মে হুঁ মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে,—যাতে মৃত জীবাত্মার সদ্গতি হয়,—পরজন্মে মানব দেহ পায়।

সুধীর মন্তব্য করে, ভেড়া হয়ত তাই পরজন্মে মানুষই হবে, আর এ লোকগুলো মরে তখন ভেড়া হয়ে জন্মাবে।

রাত সাড়ে দশটায় থুলমা গায়ে চাপিয়ে নিদ্রার চেষ্টা। গাঢ় ঘুম হয় না, কেমন যেন আধ-ঘুম-ঘোরে পড়ে থাকা,—'অল্‌টিটিউডের' প্রভাবে সহজ স্বচ্ছন্দ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

॥ ৫ ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি রাত্রে কিভাবে ঘোড়ার দড়ি খুলে যায়। একটা ঘোড়া নিখোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজি চলে চারপাশে। সকলেরই মনে দুশ্চিন্তা। একজন অবশেষে খবর আনে, মঠের ওদিকে পাহাড়ের পাশে সেটাকে দেখা গেছে। ধরে আনতে খানিক সময় কাটে। যাত্রা সুরু হতে বিলম্ব ঘটে।

ইতিমধ্যে রুকুম সিং এসে অদ্ভুত এক প্রস্তাব করে। এখন কদিন যে অঞ্চল দিয়ে যাওয়া, সব চেয়ে বেশি ডাকাতির ভয় এধারেই। এইমাত্র যারা ঘোড়ার খোঁজে গিয়েছিল তারা খবর এনেছে, দুদিন আগে ক মাইল দূরে এক যাত্রাদল ডাকাতদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তিন-চারজন যাত্রীর প্রাণনাশ ঘটেছে। সেই ডাকাতের দল নিশ্চয় এখন আশপাশেই কোথাও ঘুরছে। তাদের অস্ত্রবল কতো, জানা নেই। আমাদের কাছে রুকুমের ও কিচ্‌-এর দুটা বন্দুক ও প্রেমসিং-এর একটা রিভলবার আছে বটে, তা হয়তো পর্যাপ্ত নয়। তাই রুকুম এসে বলে, আপনার ক্যামেরার স্ট্যাণ্ডটা চাই। ওটার সাজগোছ করে একটা অস্ত্রের রূপ দেব। সুধীর আশ্চর্য হয়ে বলে, ওটায় আবার কি কাজ দেবে ?

রুকুম রঙ্গিন চশমা চোখে গম্ভীর মুখে জানায়, দিন তো, আমি কি করি দেখবেন।

যাত্রার সময় দেখি, স্ট্যাণ্ডের তিনটে পিতলের পায়া লম্বা করে টেনে বার করেছে। নিচের দিকে মোটা করে কাপড় জড়ানো। সেই পায়া-টেনে-বার-করা লম্বা স্ট্যাণ্ড রঞ্জন উঁচু করে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলে। আলো ও রোদ লেগে পিতলের পায়াগুলি ঝিক্‌মিক্ করে। বিচিত্র এক যন্ত্রের মত দেখায়। শুধু এই চোখের দেখানোই নয়। মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে, এটি এক নব-আবিষ্কৃত ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র। একসঙ্গে অনেক শত্রুকে মারা যায়। লিপুপাশের অপর পারে এক বড় মিলিটারী সাহেব এসেছেন। শীঘ্রই এদিকে আসছেন। আমরা তাঁরই অগ্রগামী দল।

সুধীর হেসে বলে, ছোকরার বুদ্ধি খুব। কলকাতা-ঘুরে-আসা গাইড্ তো। মাথায় সোলা হ্যাট্ পরেছে, চোখে রঙ্গিন চশমা উঠেছে, ওস্তাদি বুদ্ধিতেও শান পড়েছে।

কিন্তু যে-জায়গাটা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখলেই মনে হয় স্থানটা নিরাপদ নয়। চারপাশ মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করে। মাঝে মাঝে কাঁটাগাছের ঝোপ। পথের আশপাশে ছোট ছোট পাহাড়। ঢেউ-খেলানো ঢিবি মত। যেন পৃথিবীর শুক্‌না খস্‌খসে গায়ে ফোস্কা পড়ে ফুলে আছে। রুকুম সিং বলে, এই সব জায়গাই বিপজ্জনক। এই পাশের ঢিবিটার অপর দিকে—এখান থেকে ক'হাত দূরেই হয়ত ডাকাতের দল ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ সামনে এসে বন্দুক উঁচিয়ে আক্রমণ করবে। ঘাড়ে এসে পড়বার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত—দেখা তো দূরের কথা, জানতেও পারা যায় না।

সুধীর বলে, তা না যাক্, আপাততঃ তাকিয়ে দেখ,—ডাইনে ঐ গুর্‌লা মান্ধাতার বরফ-ঢাকা মাথাটা কেমন রোদ পড়ে চমৎকার দেখাচ্ছে।

স্বামিজী জানান, আজ ঐ গুর্‌লার পাহাড়ই তো ডিঙিয়ে যেতে চলেছি।

ব্রহ্মচারীজি একবার গুর্‌লার মাথার দিকে তাকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে স্বামিজীর পানে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ফেলেন।

স্বামিজী হেসে বলেন, ভয় নেই। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে না। ধার দিয়ে গা বেয়ে পার হয়ে যাওয়া।

মাঝে মাঝে ছোট নদী। সবই গুর্‌লার উপর থেকে নেমে আসে। ঘোড়ার পিঠে বসে পার হই। জলের গভীরতা নেই। অপর পারে আবার খানিক পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা। আবার আর এক ধারা। ওপারে গিয়ে আবার চড়াই। খানিকটা হয়ত কাঁকর বালিভরা ময়দান। এইভাবে মাইল পাঁচেক যাবার পর বল্‌ডাক্ (১৫,০০০ ফুট্)। নদীর ধারে এক পড়াও,—বিশ্রামস্থল। এখান থেকে ডাইনে পূব দিকে একটা পথের রেখা চলে যায়। স্বামিজী দেখিয়ে বলেন, ঐ পথ ধরে গেলে গুর্‌লা পাশ পার হয়ে সোজা মানস সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নামা যায়। মাইল এগারো দূর এখান থেকে। আমরা যাব বাঁ দিকে ঐ যে আর একটা পথের দাগ দেখা যায়—ঐটে ধরে গুর্‌লা রেঞ্জ পার হয়ে একেবারে রাক্ষসতালের ধারে গিয়ে নামব। আর মাত্র পাঁচ-ছ' মাইল দূরে। রাক্ষসতালের তীরে আজ রাত কাটিয়ে সেই দিক দিয়ে কাল মানস সরোবরে পৌঁছনো যাবে। দুই হ্রদের মধ্যে ৬।৭ মাইলের

মাত্র ব্যবধান। মধ্যিখানে একটা ছোট পাহাড় হ্রদ দুটিকে আলাদা করে রেখেছে।

বলভাকে নদীর ধারে চড়ার বুকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হয়। কিছুদূরে ভেড়ার পাল নিয়ে দুজন তিব্বতী তাকলাকোটের দিকে চলেছে দেখে রুকুম ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যায়। ডাকাতদের খোঁজখবর নেয়। ভাবি, এই সুযোগে হয়ত তার নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা কীর্তনও করে আসে।

ফিরে এসে জানায়, ডাকাতি সম্প্রতি হয়েছে ঠিক খবরই, তবে লোক মরেছে কিনা ওরা জানে না। কদিন খুব হুঁশিয়ারিতে থাকতে হবে।—বলে কাঁধের বন্দুক ঝাঁকানি দিয়ে সোজা করে রাখে।

এবার খানিক চড়াই। ঘোড়ায় চড়ে ওঠা, বুকে হাঁফ লাগে না। কিন্তু একভাবে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকায় অস্বস্তি বোধ হয়। অথচ, হেঁটে চলার এক গুরুতর অন্তরায়,—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস। হাঁটতে গেলে বাতাসে-উড়ে-আসা বালি ও কাঁকর-কুচি মুখে চোখে বেঁধে—তীক্ষ্ণ সূঁচের মত। যেন ধুলা-বালির উদ্দাম স্রোতের বিরুদ্ধে মাথা হেঁট করে এগিয়ে যাওয়া,—আপ্রাণ শক্তি সংগ্রহ করে। ঘোড়ায় চড়ে গেলে ততো লাগে না। রোদের তেজও আগুনের মত। এই জন্যেই হয়ত তিব্বতীরা আলখাল্লা গায়ে থাকলেও দিনের বেলা দেহের এক অংশ খুলে রাখে। যেদিকে ছায়া, দেহের সেদিক জামায় ঢাকা। যেদিকে রোদ,—খালি গা, হাত-কাঁধ বার করে রাখা। এ-যেন একই সঙ্গে আগুন ও বরফের স্পর্শানুভূতি।

মাইল দেড় দুই চড়াই ওঠার পর পথের আশপাশে কয়েকটি পাথরের স্তূপ,—লাপ্‌ৎচে। তাতে ছেঁড়া কাপড়, নিশান ইত্যাদি টাঙানো। হিমালয়ের বৌদ্ধ তীর্থপথে যেমন পাশ-এর মাথায় দেখা যায়। এখান থেকে বহু দূর দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে। নিচে দূরে রাক্ষসতালের বিশাল জলরাশি। নির্মল নীল কান্তি। আঁকাবাঁকা তটরেখা। রুক্ষ শুষ্ক নগ্ন পাহাড়ে ঘেরা। কিন্তু সেই বিপুল বারিধির মোহিনী মায়া কাটিয়ে মুগ্ধদৃষ্টি তড়িৎগতিতে দিগন্তে ছুটে চলে। থমকে দাঁড়ায় সে এক স্বর্গরাজ্যের প্রাসাদতোরণে। দূর থেকে প্রথম দর্শন কৈলাস শিখরের। ঐ কৈলাস। ধরিত্রীর মেরুদণ্ড সুমেরু পর্বত। মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। পুলকে সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। তিব্বতের শুচিস্নিগ্ধ অমলিন গাঢ় নীল আকাশ। উত্তরদিগন্তপ্রসারী ধূসর শৈলমালা। তারই মধ্যমণি,—গগনস্পর্শী উন্নতশির এক গিরিশিখর। যেন

শ্বেত চন্দনচর্চিত বিরাট শিবলিঙ্গ। নিষ্কলঙ্ক তুষারকিরীট। সূর্যকিরণোজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বী।

দেখে মনে হয়, প্রস্তর-তুষারময় বাস্তব জগতের কোন শৈলশিখর নয়। পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়েও যেন বিশ্বচরাচরের বহু ঊর্ধ্বলোকে। সীমারেখায় চিহ্নিত হলেও অসীম, রূপময় হয়েও অরূপ। লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে যেন যোগমগ্ন বিরাট মহাপুরুষ। কী যেন এক অলক্ষ্য আকর্ষণ মর্মে মর্মে অনুভব করি।

কেউ কথা বলি না। শব্দ করি না। পাছে দেবাদিদেব মহাদেবের বুঝিবা ধ্যান ভেঙে যায়! ধীরে ঘোড়া থেকে সবাই নামি। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। কিচ্, রুকুম সিং, রঞ্জন—অপর সকলেও ছোট পাথর তুলে আনে, লাপ্‌ৎচা স্তূপের উপর সাজিয়ে রাখে। দেব-দর্শন-স্থানে এই তাদের পূজার্ঘ্য। তাদের দেখাদেখি আমরাও করি। যুগযুগান্তরের যাত্রীদলের উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্যের মাঝে আমার ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডটিও স্থান পায়। ফুল নয়, বিল্বপত্র নয়, ধরণীর বুক থেকে তুলে নেওয়া প্রস্তরখণ্ড, শিলারূপী শিবের উদ্দেশে নিবেদন করা,—যাঁর ধন তাঁকেই দেওয়া। তবুও, কেন জানি না, অন্তরে অপূর্ব তৃপ্তি ও আনন্দবোধ হয়।

কৈলাসশিখর মাত্র ২২,০২৮ ফুট্ উঁচু। হিমালয়ে এর চেয়ে আরও উঁচু পর্বতচূড়া আছে। ঐ তো অদূরে গুর্লা মান্ধাতার শিখরগুলির উচ্চতা—২৫,৩৫৫ ; ২২,৬৫০ ; ২২,১৬০ ফুট্। কিন্তু তবুও কৈলাসশিখরের এক অনুপম অপার্থিব দীপ্তি।

কেবল ভারতবাসীর চোখেই নয়। ভিন্নধর্মী বিদেশী অভিযাত্রী দলও এই শিখর দর্শনে বিমুগ্ধ হন। ১৮৪৬ সালে হেনরি স্ট্রাচে কৈলাস দেখে লেখেন, "In picturesque, beauty Kailas far surpasses the big Gurla, or any other of the Indian Himalaya that I have seen ; it is full of majesty, a king of mountains."

কৈলাস-দর্শনে উল্লসিত মন। উৎসাহবশে হেঁটে নেমে চলি রাক্ষসতালের তীরে। ঘোড়াগুলিও সবেগে নামতে থাকে। তাদের গলায়-বাঁধা ঘণ্টা ও রঙ্গিন ঝালর দুলে ওঠে। টুংটাং শব্দ তোলে। তাদেরও চলার ছন্দে আনন্দ ফুটে ওঠে। হ্রদের তীরে পৌঁছে ভারবাহী ঘোড়াগুলি এক কাণ্ডই করে বসে। পিঠের মালসমেত মাটির উপর গড়াগড়ি দেয়। স্বামিজী চিৎকার করে কিছ

রঞ্জন ও কুকুমকে ধমকে দেন, শীগ্‌গীর মালগুলা খুলে দাও, জিনিসপত্র ভেঙে একছায় হয়ে যাবে যে।

সেই অবস্থায় সিনেমার কিছু ছবিও তোলা হয়ে যায়।

সুধীর বলে, জানোয়ার হলে হবে কি? ভারমুক্ত হবার জন্তে সবারই ছট্‌ফটানি।

অনুভবানন্দজি হেসে বলেন, দুষ্টুবুদ্ধি ওদের কম নয়। মাল ফেলে দেবার কেবলি চেষ্টা। চলার পথে ইচ্ছে করে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মেরে মালের ক্ষতি করে। সুযোগ পেলেই মাটিতে শুয়ে পড়ে। সেইজন্তেই তো সহিসরা নজর রেখে সঙ্গে সঙ্গে আসে।

হ্রদের জল থেকে কিছুদূরে বালির চড়ায় তাঁবু খাটানো হয়। কুকুম আবার সাবধান করে, এখানেও কাছাকাছি থাকতে হবে, রাক্ষসতাল জায়গাটাও ভাল নয়।

স্বামিজীর দৃষ্টি অন্তদিকে। জলের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে দেখে বলেন, নজর রেখে পা টিপে টিপে যাবেন,—জলের কাছে এক এক জায়গায় ভীষণ চোরাবালি। খুব সাবধান।

হ্রদের ধারে সারাক্ষণই প্রচণ্ড বাতাস। গাঢ় নীল জল। বাতাসে ঢেউ তোলে। ছলাৎ ছলাৎ করে তীরে এসে আছড়ে পড়ে। মনে হয়, যেন সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রায় ১৪০ বর্গমাইল হ্রদের বিস্তৃতি। পরিধি ৭৭ মাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বালম্বি প্রায় ১৭ মাইল। পূর্ব-পশ্চিমে ১৩ মাইল। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম তীর থেকে মাইল আড়াই দূরে একটিমাত্র তিব্বতী মঠ বা গোম্ফা আছে শুনি। নাম,—চেপ্‌তো গোম্ফা।

হ্রদের চারিধার পাহাড়ে ঘেরা। সেই সব পাহাড়ের উপর থেকে নদী নেমে এসে হ্রদের জলে মেশে। শুধু উত্তর-পূর্ব কোণে মানস সরোবর থেকে এক ধারা এসে রাক্ষসতালে পড়ে এবং রাক্ষসতালের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে এক নদী বার হয়ে যায়। এই ধারাই শতদ্রু বা সাটলেজের উৎস বলে প্রচার। রাক্ষসতালের আর কোন অংশ থেকে অপর কোনো ধারা প্রকাশ্যে বার হয় না। তিব্বতে ১৪,৯০০ ফুট্‌ উঁচুতে এই হ্রদ। তিব্বতীরা বলে লাঙাক্‌ সো Langak tso। তীরের কোথা থেকেও সম্পূর্ণ হ্রদ দেখা যায় না। তটভাগের আকার এমনি অসম, বাঁকাচোরা। আশপাশের পাহাড়ের নিম্নদেশ

এঁকেবেঁকে জলের ভিতর অনুপ্রবেশ করে। তাই সমুদ্রবিশেষ হ্রদে কোথাও বা উপদ্বীপ, কোথাও উপসাগর, কখনো বা অন্তরীপ। জলের মাঝখানে দুটি দ্বীপও মাথা তুলে। হ্রদের গভীরতা প্রায় দেড়শ' ফুট। মানস সরোবরের গভীরতা এর প্রায় দ্বিগুণ, শুনি।

সি-গাল্ Sea-gull-এর মত পাখি হ্রদের পাড়ে ঘোরে, জলের উপর ওড়ে; অপর পারে দূরে কৈলাস। পিছন ফিরে তাকালে গুরলা মান্ধাতা।

সুধীর বলে, এমন অপরূপ আবেষ্টনে এত সুন্দর হ্রদ, তবু পুণ্যতীর্থের খ্যাতি পায় নি, আশ্চর্য।

স্বামিজী বলেন, হবে কি করে? এর জন্মকাহিনী-ই যে বাদ সেধেছে। রাবণ রাজা ছিলেন পরম শিবভক্ত। তপস্যা করে শিবকে তুষ্ট করলেন। বর চাইলেন, কৈলাসসমেত তোমাকে নিয়ে যাব লঙ্কায়, সেখানে প্রতিষ্ঠা করব। শিব বললেন, তথাস্তু, কিন্তু সূর্যোদয়ের আগে নিয়ে যাওয়া চাই, পরে হলে হবে না। রাবণ ভাবলেন, এ ত অতি সহজ কথা। কিন্তু কৈলাসে পৌঁছুতে পথ হারিয়ে তাঁর দেরি হয়ে গেল। ক্ষেপে গিয়ে কৈলাস উৎপাটন করে নিয়ে যাবার মতলবে পাহাড় টলাতে লাগলেন। চারদিকে পাথর ছিটকে গড়িয়ে পড়ে। বনের পশুরা ভয় পেয়ে ছুটে পালায়। শিবের নন্দীভৃঙ্গী সব অনুচররাও ভীত-ত্রস্ত। পার্বতী সভয়ে শিবের দেহ-সংলগ্ন হয়ে বসেন। শিব কিন্তু নির্বিকার, নির্বিচল। ডান পা-টা শুধু হাঁটু তুলে বসে পায়ের বুড়া আঙুল দিয়ে একটু চাপ দেন। তখনি সব শান্ত স্থির। রাবণের সাধ্য কি আর কৈলাস টলায়। তবে ভক্তের যা একমাত্র সম্বল,—আবার ঘোর তপস্যায় বসেন। শিবও তুষ্ট হন। লোকে বলে, শিবের আঙুলের চাপে কৈলাসের তলায় নিষ্পিষ্ট হয়ে রাবণের ঘামে এই হ্রদের সৃষ্টি। শিব তাঁকে বর দেন, এই হ্রদের নাম হোক তোমার নামে। যতদিন এই কৈলাস থাকবে তোমার নামও সেই সঙ্গে অক্ষয় হয়ে থাকবে। হ্রদের নাম হয়,—রাবণ হ্রদ বা রাক্ষসতাল।

স্বামিজীর বর্ণিত কাহিনী শুনে মনে পড়ে, হায়দ্রাবাদের ইলোরার বিখ্যাত কৈলাস মন্দিরের কথা। একটা পাহাড়ের অংশ কেটে গড়া সেই অত্যাশ্চর্য স্বয়ংসম্পূর্ণ শিলাময় মন্দির—Rock Temple। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পকলার অপূর্ব এক নিদর্শন। E. B. Havell তাঁর এক গ্রন্থে,—The Himalayas in Indian Art,—যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন, দক্ষিণ ভারতের

সেই প্রসিদ্ধ মন্দির কৈলাস পর্বতের অনুকরণে গঠিত। এমন কি এক সময়ে সেই মন্দিরের সারা বাইরের অংশ সাদা চুন দিয়ে এমনভাবে পালিশ করা ছিল, দেখাত যেন প্রকৃতই শুভ্র তুষারাবৃত কৈলাসশিখর। শুধু তাই নয়। সেই মন্দিরের মণ্ডপগাত্রে রাবণের কৈলাস-উৎপাটন-প্রচেষ্টার কাহিনীর যে অপরূপ (bas relief) প্রতিকৃতি আছে,—আজ স্বামিজীর মুখে যেন তারই নিখুঁত বর্ণনা শুনি। বম্বের নিকট এলিফ্যান্টা গুহা-মন্দিরেও অনুরূপ আর এক শিলামূর্তি আছে। ইলোরার ও এলিফ্যান্টার গুহামন্দিরগুলির সৃজন কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে।

আজ ভাবতেও বিস্ময় জাগে, ভারতের সেই সুদূর প্রান্তে, সেই প্রাচীনকালেও তিব্বতের এই কৈলাসশিখর কী প্রভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল শুধু ভারতবাসীর অন্তরের ধর্মবিশ্বাসেই নয়, শিল্পজগতেও।

হঠাৎ সুধীরের প্রশ্নে চমক ভাঙে।

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, স্বামিজী! রাবণের ঘামে তৈরি বললেন,—হ্রদের জল নোনা নাকি?

স্বামিজী বলেন, আগে নোনা ছিল বলে প্রবাদ। এখন আর তা নয়। তারও এক গল্প আছে। মানস সরোবরে দুটো সোনালী মাছের মধ্যে একবার ঝগড়া বাধে। একটা মাছ অপরটাকে তাড়া করে। সে মানস সরোবর থেকে ভয়ে বেরিয়ে পালাতে থাকে, রাক্ষসতালে গিয়ে পড়ে। যে-পথ দিয়ে সেটা যায় মানসের জলও সেখান দিয়ে রাক্ষসতালে ঢোকে। ফলে, এ হ্রদের জলও পরিষ্কার হয়। লোকেরাও পান করতে শুরু করে। সেই ধারা কৈলাস যাবার পথে আমরা পার হব।

হ্রদের তীরে বিকেলে ঘুরে বেড়াই। সহযাত্রীদের তাঁবুতে তাঁদেরও খবর নিতে চলি। মাদ্রাজীদের সঙ্গী সেই প্রায়-বিবস্ত্র তরুণ সাধুটিকে দেখতে পাই না। শুনি, কৈলাস দর্শনের মাত্র আধ ঘণ্টা আগে তাকলাকোট অভিমুখী যে তিব্বতী দলটিকে দেখি, তাদের সঙ্গে তিনি ফিরে গেছেন। পথের কষ্ট অসহ্য বোধ হওয়ায় আমাদের সঙ্গ ছাড়েন। আর খানিক এলেই অন্ততঃ কৈলাস দর্শন হোত, সে সৌভাগ্যটুকু থেকেও বঞ্চিত হলেন, এমনি ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

স্বামিজী শুনে বলেন, প্রতি বছরই এমন দু'চারটে ঘটে থাকে। পথ থেকেই ফিরে যায়। মুখে অমন বড় বড় বোল ছাড়লে হবে কী। আমার সেদিন দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আসতে পারবে কি না।

সূর্যাস্তের সময় চারদিকে—আকাশে পাহাড়ে, জলে—রঙের খেলা শুরু হয়। পেন্‌সিলে আঁকা রেখাচিত্রের উপর কোন্ অদৃশ্য শিল্পী যেন নানা রঙের প্রলেপ লাগান।

রাত্রে প্রচণ্ড শীত। গায়ের উপর গার্বিয়াং থেকে আনা মোটা—থুলমা। তারই মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে রাত কাটানো।

হঠাৎ কুকুরের ডাকে ঘুম ভাঙে। থুলমার মধ্যে মাথা চাপা দিয়ে সবাই শুয়ে। সুধীর চুপি চুপি বলে, ডাকাত এল নাকি রে?

বাইরে কিচ্ ও কুকুম সিং-এর গলা শোনা যায়। স্বামিজী উঠে বসেন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি?

এমন কিছু নয়। ঘোড়ার দড়ি খুলে গিয়েছিল। কুকুরের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নি। কিচ্‌রা উঠে আবার ভাল করে বেঁধে দেয়। ভাবি, অদ্ভুত মানুষ এরা। শীতের কাতরতা নেই, আলস্যের গড়িমসিও নেই।

॥ ৬ ॥

আজ মানস সরোবর দর্শন হবে। হৃদয় আনন্দে উদ্বেল। ভাবি, সত্যিই কি আজ সেই কতোকালের স্বপ্নে-দেখা, কল্পনার রঙ্গিন তুলিতে আঁকা—মানস সরোবর এই জাগ্রত চক্ষে দেখব? সঙ্গীরাও সকলে আগ্রহে আকুল। যাত্রার আগে আজ আর খাওয়াদাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। নিরম্বু উপবাসী থেকে বিশুদ্ধ চিত্তে সেই পবিত্র হ্রদ-তীরে এগিয়ে যাওয়া, সেই পুণ্য তীর্থসলিলে অবগাহন স্নান-করা। আজ এই ক্ষুদ্র দেহ-রথে অদৃশ্য কাকে যেন সযত্নে বসিয়ে নিয়ে চলি। পরম আনন্দে উদ্ভাসিত সারা অন্তর।

রাক্ষসতালের তীর ধরে খানিক দূর পথ। তারপর হ্রদের কিনারা ছেড়ে ডানদিকের পাহাড়ের উপর ধীরে ধীরে ওঠা। একটু উঠতেই নিচে রাক্ষসতালের তীরে একধারে তিব্বতীদের ঘন কালো রঙের কয়েকটা তাঁবু দেখা যায়। তাঁবুগুলির আশেপাশে বহু ভেড়া চরে। অনুভবানন্দজি বলেন, দুরবীন লাগিয়ে দেখুন, তাঁবুগুলার মাথার মাঝখানে ফাঁক, ভেতরে আগুন জ্বাললে ওটা ধোঁয়া বেরোনোর পথ। তিব্বতের এ-অঞ্চলে গ্রাম খুব কম। তিব্বতীরা অধিকাংশই যাযাবর। ঐ রকম তাঁবুতে থাকে। ভেড়ার পাল নিয়ে ঘোরে। নিকটে জল দেখে তাঁবু ফেলে। আজ এখানে, কাল সেখানে। দেখছেনই তো এখানকার জমি কাঁকর, বালি, পাথরে ভরা। চাষ করা বা ফসল ফলানো

এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। তাই জমির সঙ্গে এদেশের মানুষের মায়ার বাঁধন নেই। প্রধান খাদ্য,—ভেড়ার মাংস, রোদে বা আগুনে ঝলসে রাখে। পিঠে নিয়ে ঘোরে, খিদে পেলে চিবিয়ে খায়। তাকলাকোটেই দেখেছেন।

কুকুমসিং গাইড্ সদা সতর্ক আছে। দুরবীনটা চেয়ে নেয়। ভাল করে দেখে। মাথা নেড়ে আশ্বাস দেয়, ওরা ডাকাত নয়।

রাক্ষসতালের বিশাল বিস্তৃতি ক্রমে চোখে ছোট দেখাতে থাকে। পাহাড়ের উপরে উঠে চলেছি, বোঝা যায়। সেই কাঁকর-নুড়ি-বালি ভরা পাহাড়ের গা, পথের পাশে কচিৎ সেই কাঁটাগাছের ঝোপ। চারিপাশ নিঃসাড়, নিস্তব্ধ, স্পন্দনহীন। হঠাৎ সেই ঝোপঝাড়ের কাছে মাটিতে কিসের ছোটাছুটি দেখে চমকে তাকাই। বড় বড় খরগোশ এদিক থেকে ওদিকে লাফাতে লাফাতে ছুটে পালায়। অল্প দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। লেজে ভর দিয়ে দু পা তুলে বসে। দু কান খাড়া করে পিটপিট করে দেখে। আমরা এগিয়ে যেতেই আবার লাফিয়ে দূরে সরে যায়। যেন এই নীরস নিঃসার বর্ণহীন রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ নৃত্যের ছন্দ জাগে। নানান্ রঙের বৈচিত্র্য ফোটে। খরগোশ-গুলার দেহের উপর অংশ, মাথা, কান—পাঁশুটে রঙ্। কিন্তু বুক, পেট, পায়ের ভিতর দিক সাদা। পিছন ভাগ—লেজের কাছাকাছি পর্যন্ত নীলাভ-ধূসর। দীর্ঘপুষ্ট লেজটি আবার সাদা। এদের শুনি 'রিগং' বলে। ভাবি, এরা কি মানস-রাজ্যের ক্ষুদ্র অগ্রদূত? ছুটে গিয়ে এখনি খবর দেবে সুদূরের যাত্রী আসে।

পাহাড়ের অপর দিকে নামা সুরু হয়। চোখের সামনে নিচে মানস সরোবরও দেখা দেয়।

যেন, ধূসর-তসর-বস্না জননী বসুন্ধরা স্বচ্ছ সুনীল চোখ মেলে তাকান। সারাদেহে আবার কীসের এক অপূর্ব স্পন্দন অনুভব করি। নির্নিমেষ নয়নে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। ঘরছাড়া ছেলে যেন বহুকাল পরে মায়ের স্নেহসিক্ত স্নিগ্ধ আঁখিতলে এসে দাঁড়ায়। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানাই।

মানস সরোবর। মানস সরোবর।—মনে মন্ত্রের মত বেজে ওঠে। সত্যই এসে গেলাম মানস সরোবরে।

নেমে চলি দ্রুতপদে হ্রদের ধারে। তীরে বালুচরে অসংখ্য ছোট ছোট পাথর নুড়ি। কতো বিচিত্র তাদের বর্ণবিন্যাস। স্ফটিকস্বচ্ছ জলের ভিতরও নানা রঙের ছোট পাথর। যেন, নীলাম্বর বসনের অন্তরালে দেখা যায়,—

মণিমুক্তাখচিত মায়ের অঙ্গঅলঙ্কার।

হ্রদের ধারে গিয়ে জলস্পর্শ করি। টুপি খুলে মাথায় ছিটাই। আনন্দের আতিশয্যে পরস্পর আলিঙ্গন করি।

স্বামিজী তৃপ্ত প্রফুল্ল বদনে বলেন, সুধীরবাবু, এসে গেলেন তাহলে মানস সরোবরে। একটু রোদে বসুন। বিশ্রাম করে নিন। তার পর স্নানে নামা যাবে। বেশি দেরি করা চলবে না। বেলা বাড়লে জোর বাতাস উঠবে। জলে ঢেউ তুলবে। জল তখন আর এমন পরিষ্কার থাকবে না।

স্বর্ণকান্তি বালুতট। জলের অস্ফুট মধুর ধ্বনি তটের কোলে কোলে। তারই অদূরে বসি। সুমুখে নীল বারিরাশির প্রশান্ত বিস্তার। দিগ্‌দিগন্ত নিঃশব্দ নীরব। মনেও নিবিড় শান্তির ছায়া। জাগ্রত চোখে দেখি যেন স্বপ্নছবি।

হ্রদের তীরে তাঁবু ফেলা হয়। হঠাৎ-আসা মানুষের কর্মব্যস্ততায় ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির যেন মৌন ব্রত ভাঙে। জলের উপর আলোড়ন শব্দ ওঠে। হাঁসের ঝাঁক জলশয্যা ছেড়ে পাখা ঝাপটে শূন্যে নীল আকাশে ওড়ে। পুলকিত দৃষ্টি তুলে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি। ঐ কি সেই মানস সরোবরের চিরপ্রসিদ্ধ রাজহংস। কালিদাসের কাব্যে অমর হয়ে আছে যারা। এরাই কি সেই সুদূরযাত্রী হংসবলাকা শীতের প্রারম্ভে হিমালয় অতিক্রম করে নেমে যায় ভারতের সাগর উপান্তে? তারপর, আবার ফিরে আসার পালা,—জলধর সময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ।

সরোবরের হংস, সমুদ্র-সৈকতের প্রতি তার আকর্ষণ কেন, আজ বুঝতে পারি সরোবরতীরে বসে। মানস সরোবর পাহাড় ঘেরা হ্রদ বটে, কিন্তু সমুদ্র বিশেষ। প্রায় দুই শত বর্গমাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি! তবুও, হ্রদের সম্পূর্ণ আয়তন যুগপৎ দেখা যায়। দেখতে অনেকটা ডিম্বাকার। প্রায় চুয়ান্ন মাইল হ্রদের ব্যাস। পূর্বদিকে ষোলো মাইল। দক্ষিণে দশ মাইল। পশ্চিমে তেরো মাইল। উত্তরে পনেরো মাইল। কোণাকুনি দীর্ঘতা ১৪ থেকে ১৫॥ মাইল। সাগরবক্ষ থেকে ১৪, ৯৫০ ফুট উঁচুতে এই বিশাল হ্রদের অবস্থিতি। হ্রদের গভীরতা তিনশ' ফুট পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

তিব্বতীরা এর নাম বলে Tso Mapham বা Tso Mavang। ভারতীয় নাম মানস সরোবর। কোন্ প্রাচীন যুগ থেকে এই হ্রদের সঙ্গে ভারতবাসীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক,—তা কেউ বলতে পারে না। ভূতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকমতে

হিসাব করে দেখান, জগৎসৃষ্টির কোন্ আদিম পর্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কেমন করে এক মহাসাগরের অবলুপ্তি ঘটে, কি ভাবেই বা থেকে যায় তারই এক অংশাবশেষ এই বিখ্যাত হ্রদের রূপ ধরে। কিন্তু, আদি কবি মহামুনি বাল্মীকি মানসের সুমধুর আরেক জন্মকাহিনীর ইঙ্গিত করেন রামায়ণের আদিকাণ্ডে। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জানান, কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিত পরম্। ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।—কৈলাস পর্বতে ব্রহ্মার মানস-সৃষ্ট এই হ্রদ। সেই কারণে নাম তার মানস সরোবর।

রামায়ণে, মহাভারতে, বিভিন্ন পুরাণে, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যে, বৌদ্ধ ধর্ম-পুস্তকে, জৈনশাস্ত্রগ্রন্থে বার বার দেখা যায় কৈলাস মানস সরোবরের উল্লেখ। সর্বত্রই এই রমণীয় হ্রদের বহুল স্তুতি। প্রচলিত প্রবাদ, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মন থেকে হ্রদের সৃষ্টি করে নিজে রাজহংসরূপ ধরেন, হ্রদের জলে বিহার করেন। জগতে নাকি এই হ্রদের প্রথম সন্ধান দেন,—রাজা মান্ধাতা। এরই তটে তিনি ধ্যান-নিমগ্ন থাকেন। তাই তাঁরই উদ্দেশে ঐ দক্ষিণ তীরবর্তী বিশাল গিরিশ্রেণীর নামকরণ,—মান্ধাতা শৈলমালা-গুরলা মান্ধাতা। স্বর্গের দেবদেবী, গন্ধর্ব অপ্সরা এখানে নিত্য গোপনে অবগাহনে আসেন,— ভক্তহৃদয়ের এখনও এই বিশ্বাস। পুরাকালে ঋষিদের এই ছিল তপস্যাক্ষেত্র। আধুনিক কালের মুক্তিকামী সাধু-সন্ন্যাসীদের এখনও এই পরমকাম্য তপোভূমি। দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের বহু-ঈপ্সিত দুরভিগম্য সুরম্য এই স্থান। যুগযুগান্তরব্যাপী এই মানস সরোবরের মহান্ গরিমা কীর্তিত। বিশ্ববিশ্রুত এর খ্যাতি।

সেই মানস সরোবর সলিলে আজ এখনি অবগাহন করব? হ্রদের তীরে বসেও বিশ্বাস হয় না। আজও মনে হয়, আমি যেন স্বপ্নলোকবাসী আর একজন কে। চিনেও চিনি না যারে।

সুধীর ডাক দেয়, কী রে! মানস সরোবরের ধারে বসে ধ্যানস্থ হলি নাকি? জামাটামা খোল। স্বামিজী তাড়া দিচ্ছেন স্নান করার জন্যে।

জামা খুলতে সুরু করি। সুরু করাই বটে। এ-যেন কাশীর কাঠের খেলনার অগুন্তি সেই কৌটা খোলা। একটার পর আর এক,—খুলেই চলি। কোট, পুলওভার, সোয়েটার, গরম সার্ট, গরম গেঞ্জি, সুতির গেঞ্জি,—সুধীর হেসে বলে, এ যে শেষই হয় না রে। কোথায় লুকিয়ে আছি— আমি?

ভাবি, সত্যই তো। 'আমি'-র সন্ধানটা পাই কোথায়? যে-আমি "বন্দী নহে আমার সীমায়"।

স্বামিজীরা, ব্রহ্মচারীজি—সবাই প্রস্তুত জলের ধারে। অনুভবানন্দজি হাত নেড়ে ডাক দেন, কই। দেরি করছেন কেন? খালিগায়ে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। চলে আসুন,—চট্ করে একটা ডুব দিয়ে উঠে পড়বেন। উৎসাহিত হয়ে বলি, শুধু ডুব? মানস সরোবরে সাঁতার কাটব না?

মাথায় জল ছিটিয়ে জলের মধ্যে পা দিই। সুপবিত্র মানসের জলে পা ঠেকাতে সঙ্কোচ জাগে। মনে মনে বলি, এ তো মায়ের গায়ে পা ঠেকিয়ে তাঁরই কোলে ওঠা। দোষ নেই। কিন্তু, জল তো নয়, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। পায়ের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ বেগে শিহরণ উঠে ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছয়। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলি। ধীরে ধীরে ঢালুপাড় জলের ভিতর গড়িয়ে নামে। ছোট ছোট নুড়ি, পাথর, বালি। কাকচক্ষু জল। পা পা করে এগিয়ে চলি। যেন সদ্য হাঁটতে শিখে কচি শিশু টলমল করে চলে। পায়ের চেটো ছাড়িয়ে ক্রমে হাঁটু-জল হয়। কিন্তু কোথায় পা? সাড় বোধই নেই। যে-অংশ জলে ডুবছে দেহ থেকে তা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

স্বামিজী জলে নেমেই ডুব দিয়েছেন। মাথা তুলে তাকিয়ে বলেন, ও কী। অতো দেরি করছেন কেন? ঝট্ করে এগিয়ে এসে ডুব লাগান।

'জয় মা'—বলে চেঁচিয়ে ছুটে এগিয়ে যাই। জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মনে পড়ে, উঁচু রোয়াকের ওপর থেকে ছোট ছেলের চোখ বুজে মায়ের হাত-বাড়ানো কোলের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়া।

কী যেন হয়ে যায়, বোধ হারাই। শুধু মনে ভাসে, মায়ের হাসিমাখা মুখখানি। আসতে চেয়েছিলেন সঙ্গে। পথের দুর্গমতার ভয়ে আনি নি। তবুও জলভরা চোখে প্রসন্ন মুখে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে আশীর্বাদ করেন। আসতে অনুমতি দেন।

তাঁরই নাম নিয়ে মানস সরোবরে আমার প্রথম ডুব। তাঁকেই যেন সঙ্গে এনে স্নান করানো।

তারপর, দু হাত ছড়িয়ে আরও ডুব দিই—দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার।

দেহ এখন নিঃসাড়। শীতের অনুভূতিও নেই। কিন্তু মাথা অসম্ভব ভারী। কে যেন তাল তাল গুরুভার সীসা ভরে দেয় মাথার ভিতর। ভাবি, আর নয়। হয়ত এখনি সংজ্ঞা হারাব।

জল ছেড়ে উঠে আসি।

স্বামিজী তাগিদ দেন, এখুনি শুকনো কাপড়জামা পরুন। ভাল করে

ঢাকাঢুকি দিন। তারপর এইখানে জলের ধারে রোদে বসে তর্পণ পূজাদি হবে।

ক্রিয়াকর্মাদি যথাবিধি সাঙ্গ। দেহ এখন হাল্কা। এতদিনের দুর্গম তীর্থ-পথের কোন গ্লানিবোধ নেই। সর্ব পাপহরা কি পুঞ্জীভূত পাপ প্রকৃতই হরণ করেন? মনভরা এ কী গভীর প্রশান্তি। এ-যেন এক নবীন জীবনের প্রথম প্রভাত।

মানসের তটে বসে থাকি, আপন মনে বিভোর হয়ে। বিপুল বারিরাশির অপরূপ সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় খেলা দেখি। একদিকে মান্ধাতার তুষারশিখর। শুভ্রকেশ ধ্যানাসীন ঋষি। নীলজলে তারই ছায়া দোলে। হ্রদের চারিপাশ আবেষ্টন করে ছোট বড় পাহাড়ের বলয় আকার। ত্রিশ বর্গমাইল ব্যাপ্ত হ্রদ, চোখে দেখে তা যেন মনেই হয় না। ঐ তো দেখা যায়, ওপাড়ের পাহাড়ের গায়ে পাথরগুলির সুস্পষ্ট রূপরেখা, কতো বিভিন্ন বর্ণের ছটা। কে বলে, ১৪।১৫ মাইল দূরে।

তিব্বতের ধূলিশূন্য অতিশুষ্ক বাতাবরণ এই অভিনব স্বচ্ছ দৃষ্টিলাভের সহায়ক। ভাবি, অন্তর্মুখী দৃষ্টিও কি এইভাবে খোলে? ঋষিদের তাই কি এ তপোভূমি?

বেলা বাড়ে। রৌদ্রের তেজ প্রখর হয়। আকাশের রঙ্ বদলায়। হ্রদের জলেও তার প্রতিক্রিয়া ফলে। ঘন নীল জল কোথাও কোথাও সবুজবরণ হয়। কোথাও বা সূর্যকিরণে ঝল্‌মল করে। ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়ে। জলে তরঙ্গের শিহরণ জাগে। যেন, অসংখ্য তীক্ষ্ণশরের অলক্ষ্য সন্ধান হ্রদের শান্তবুকে নির্দয় আঘাত হানে। ভাঙা কাঁচের মত টুক্‌রা টুক্‌রা হয় স্বচ্ছ জলের অক্ষত অঙ্গ। ছোট ঢেউ বড় হয়। তটের অভঙ্গ নিখুঁত জলসীমারেখা কেঁপে ওঠে, সর্পিল ভঙ্গি ধরে। ঢেউ-এর উচ্ছ্বাস বাড়ে। কূলের বুকে ভেঙে পড়ে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে। ক্রমে সাগর-উপকূলের মত বিশাল তরঙ্গ দেখা দেয়। সজোরে সশব্দে আছড়ে পড়ে। সাগর-গহ্বর থেকে লক্ষ সর্প হঠাৎ যেন জেগে ওঠে। ফণা তুলে ধরার বুকে ছোবল মারে। গরল স্পর্শে জলের রঙ্ বদলায়। বিবর্ণ আবিল হয়। জলতল থেকে ঘাসের মত লতাগুল্মরাশি ভেসে ওঠে। পরিচ্ছন্ন তটভূমি আবর্জনায় আকীর্ণ করে। সুপ্তোত্থিতা সুন্দরী যেন উন্মাদিনী মূর্তি ধরেন।

কিন্তু, শুধু তটের নিকটেই তরঙ্গের এই বিক্ষোভ। হ্রদের মধ্যবর্তী জলরাশি তেমনি নিথর সুনীল।

বিকালে বাতাস থামে। সরোবরও আবার সম্পূর্ণ সৌম্য শান্ত মূর্তি ধরে।

মানস সরোবরের জলে অকস্মাৎ তৃণগুল্মের প্রকাশ হলেও কোন পদ্মের কখনও সন্ধান মেলে না। কালিদাসের "হেমাম্ভোজপ্রসবিসলিলং মানস" বা বাণভট্টের পদ্মদিঘি মানস সরোবর হয়ত কবি-কল্পনা; কিংবা, কি জানি সেকালের স্বর্ণকমল একালে আর ফোটে না।

কিছুদূরে গোসুল গোম্ফা। সরোবরের চারিদিকে আটটি তিব্বতী মঠ। তার মধ্যে আমাদের যাত্রাপথে হ্রদের এই পশ্চিমতীরে প্রথম পড়ে গোসুল। তারপর আসে জিউগোম্ফা। স্বামিজী জানান, সেটিও কাল পথের নিকট দেখা যাবে।

অপর ছয়টি,—চেরকিপ্, লাংবোনা পুনুরি, সেরালুং, ইয়াব্‌নগো ও থুগুলো—হ্রদ পরিক্রমা পথে পড়ে। আমাদের হ্রদের পরিক্রমা করার উদ্দেশ্য নেই। স্বামিজী বলেছেন, ঘুরতে গেলে সময় ত অনেক নেবেই, কতোদিন লাগবে তারও নিশ্চয়তা নেই। মানস সরোবর থেকে সরাসরি কোন নদীর উৎপত্তি না হলেও কয়েকটা নদী সরোবরে এসে পড়ে চারপাশের পাহাড়ের ওপর থেকে। সে-সব নদীতে কখন কতোখানি জল থাকবে, পাহাড়ের বরফ গলে হঠাৎ কখন জল বেড়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। পথে আটকে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। এ-যাত্রায় থাক্ বরং মানস-পরিক্রমা।

তিব্বতী এই গোম্ফাগুলি একাধারে মন্দির, মঠ ও শিক্ষাপীঠ। এদেশে মঠগুলির বাইরে কোথাও বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন নেই। অধ্যয়ন করতে চাও, সংসার ছেড়ে মঠবাসী হও। এক একটা বড় মঠ আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পায়।

সুধীর বলে, চল্ না গিয়ে দেখে আসি মঠের ভেতর।

স্বামিজী বলেন, আজ হ্রদের পাশে স্থির হয়ে বসে কাটান। দেখতে কাছে হলেও মঠে যেতে বেশ খানিক হাঁটতে হবে। পাড়ের ওপর চড়াইটাও মন্দ হবে না। কাল যাবার পথ ঠিক ওরই নিচে দিয়ে। সেই সময়ে উঠে দেখে আসবেন।

কিচ্ ফিরে আসে গোম্ফার দিক থেকে। স্বামিজী প্রশ্ন করেন, পেলে নাকি? কতোখানি?

ভেড়ার দুধের সন্ধানে গোম্ফায় গিয়েছিল। এনেছেও এক ঘটি।

কিচ্-এর সঙ্গে দুধই আসে নি, পিছু পিছু দুজন মঠবাসীও এসে হাজির। পরনে গাঢ় লাল গেরুয়া জোব্বা। এরা ডাবা,—মঠের ব্রহ্মচারী বা বিদ্যার্থীর মতন। লামারা আরও উচ্চ পর্যায়ের, গুরুশ্রেণীয়। এদের মধ্যে একজন ছেলে-মানুষ। মনে হয়, মাত্র বছর দশ-বারো বয়স। অপরজন যুবা। দুজনেরই মাথা কামানো। গোল মুখ। ফোলা ফোলা গাল। টকটকে রঙ। খুদে খুদে চোখ। মিট্‌মিট্ করে তাকায়। কুতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দেখে। পরস্পরে কি বলাবলি করে। মুচকে হাসে। ফোলা গালে টোল খায়। ছোট চোখ আরও কুঁচকে আসে। অল্পবয়সী ডাবা-কে দেখতে অনেকটা ঝল্‌মলে পোষাক-পরা বড় ডল্-পুতুলের মতন।

আমাদের ঘোড়ার সহিস সেই পাগলা আঙ্‌কেল ডাবা দুটিকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। বালক-ডাবার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। মাথা কাত করে তার মুখের পানে তাকায়। বালক অস্বস্তি বোধ করে। হয়ত ভয়ও পায়। সরে গিয়ে তার সঙ্গীর অপর পাশে আশ্রয় নেয়। আঙ্‌কেলও সেইদিকে এগিয়ে যায়। পাশে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলায়। বালক ডাবা এবার ভয়ে জড়সড় হয়। আঙ্‌কেলের মুখের সেই নিত্য-হাসির বাঁকা রেখার ফাঁকে কেমন-যেন কোমল করুণ আভা ফোটে।

ভাবি, চেনে নাকি ওকে?

পাগলের কাণ্ড দেখে রুকুমসিং হেসে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে আঙ্‌কেলের হাত ধরে টেনে আনে। কি যেন বলে তামাশা করে। নিজের সাহেবী সোলার টুপিটা তার মাথায় পরিয়ে দেয়। তার দু হাত ধরে ঘুরে ঘুরে তাকে নিয়ে নাচতে থাকে। বন্‌বন্ করে পাক খায়। আঙ্‌কেলও মাথা দুলিয়ে উদ্দামভাবে নাচে। নানান্ রকম মুখভঙ্গি করে,—সার্কাসের ক্লাউনের মত। চারদিকে হাসির রোল ওঠে।

কিচ্‌কে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটা কী? তখন জানতে পাই, আজ দু'তিন বছর আগে আঙ্‌কেল তার একমাত্র পুত্রকে মঠে পাঠিয়ে দেয়,—সাধু অর্থাৎ লামা হবে বলে। বৌদ্ধদের বিশ্বাস, এইভাবে পুত্রকে মঠে দেওয়া, মহাপুণ্যকর্ম। আঙ্‌কেলও সেই পুণ্যলাভের লোভে তাই-ই করে। কিন্তু তাতে কি আর পুত্রস্নেহের মায়া কাটে? তার ছেলে যখন মঠে যায়, আরও ছোট ছিল। এতদিনে নিশ্চয় এত বড় হয়েছে, দেখতেও হয়ত এমনি হয়েছে—বালক ডাবাকে

দেখে হয়ত আঙ্‌কেল সেই কথাই ভাবে।

আঙ্‌কেল বোঝে, তারই সম্বন্ধে কথা বলে কিচ্‌। হঠাৎ নাচ থামিয়ে ঝুকুমের হাত ছাড়িয়ে থমকে দাঁড়ায়। আমাদের দিকে তাকায়। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। হাত তুলে বোঝাতে চেষ্টা করে,—তার ছেলে তখন কত বড় ছিল। দাঁত বার করে হাসে। কিন্তু, স্পষ্ট দেখি, ক্লাউনের চোখের কোণে টল্‌মল্‌ করে অশ্রুবিন্দু।

এর অনেক বছর পরের আর এক ঘটনা কালাসংগতি হলেও এখানে লিখি।

পাগলা আঙ্‌কেলের উপরি-বর্ণিত আচরণ দেখা ভারতের সুদূর উত্তরে,—তিব্বতে। আর, অপর ঘটনাটি ঘটে ভারতের দক্ষিণে—সিংহল দেশে। সেদেশেও বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব। সে-যাত্রায় কলম্বো শহরে অতিথি হই সিংহলের মহাবোধি সঙ্ঘের তদানীন্তন সম্পাদকের বাসভবনে। ভদ্রলোক সিংহলী বৌদ্ধ। বিলাতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। সে-সময়ে সিংহল-সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার। ধীর, স্থির, শান্ত মানুষ। স্বল্পভাষী। দোহারা চেহারা। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পাশে দেখায় যেন কৃশকায়। ভদ্রমহিলাও শিক্ষিতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি। দীপ্ত চাহনি। কথাবার্তা মার্জিত, গাম্ভীর্যপূর্ণ। গোঁড়া বৌদ্ধ। আঁটসাঁট ভারী দেহ। রাশভারী চালচলন। গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী। মহারাজ্ঞীর মত আপন রাজ্য চালান।

প্রথম দিনে পৌঁছুতেই কর্তা-কর্ত্রী দুজনেই পরম আত্মীয়ের মতন সাদর অভ্যর্থনা করেন। কথাবার্তা আচরণে অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়।

পরদিন—সকাল বেলা। দেখি, বারান্দায় সাজানো হয় ডালিভরা ফলের রাশি, বড় বড় থালায় নানাবিধ মিষ্টান্ন। গৃহস্বামিনী সযত্নে তত্ত্বাবধান করেন। লোক মারফত সেই খাদ্যসম্ভার বাইরে কোথায় পাঠানো হয়। ভাবি, সামাজিক তত্ত্ব পাঠানোর প্রথা এদেশেও বোধ করি প্রচলিত। গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করি। কর্ত্রী নিজেই সাগ্রহে উত্তর দেন,—এ সব যাচ্ছে নিকটেই এক মঠে—মনাস্ট্রীতে। সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্যে। সিংহলের নাম-করা বড় মঠ। আপনি এ দেশ দেখতে এসেছেন। এ-মঠও একটা দ্রষ্টব্য স্থান। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি সেখানে যাই। আজ আপনাকেও নিয়ে যাব। দেখবেন, এই শহরের মধ্যেও কেমন সেখানে শান্ত পরিবেশ,—বলতে বলতে আপন অন্য কাজে গৃহকর্ত্রী চলে যান।

গৃহস্বামীর মুখে দেখি ম্লান মৃদু হাসি। ধীরে ধীরে বলেন, ব্যাপারটা কিন্তু সব উনি বললেন না। মঙ্‌কু-দের জন্যে মঠে পাঠানো হোল, ঠিকই, কিন্তু ভেতরের কারণটা আপনাকে খুলে বলি। আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে। যে-ছেলেটি ডাক্তারি পড়ছে সেই আমাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান বলে নিশ্চয় আপনার ধারণা হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃত তা নয়। ওটি আমাদের মধ্যম পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐ মঠে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেইখানে সে মঙ্‌কু-ভিক্ষু হয়ে আছে। জানেনই তো বৌদ্ধধর্মমতে এক সন্তানকে ধর্মজীবন যাপন করতে পাঠানো নিষ্ঠাবান বৌদ্ধদের কর্তব্য। আমার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারেই তাই রক্ষা হয়েছে। কিন্তু সেই থেকে প্রতিদিন মঙ্‌কদের জন্যে ঐ মঠে এইভাবে ডালি পাঠানোও চলেছে। সন্ধ্যাবেলা নিত্য সেখানে ওঁর যাওয়া চাই-ই। আজ গিয়ে দেখবেন।

সন্ধ্যাবেলা সঙ্গে গিয়ে দেখিও। কিন্তু, যে-দৃশ্য দেখি, তা কল্পনা করতে পারি নি এবং এখনও চোখের সামনে ভাসে।

প্রকাণ্ড মঠ। বিরাট এলাকা। প্রকৃতই তপোবনের প্রশান্ত পরিবেশ। ঘুরে ঘুরে কর্ত্রী সব কিছু দেখান। দেখা শেষও একসময়ে হয়। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, মায়ের দেখা এখনও শেষ হয় নি, চোখ দুটি কেবলি কার সন্ধানে ঘোরে।

মঠের মন্দির কক্ষে আবার ফিরিয়ে আনেন। মস্ত বড় হল্‌ঘর। একদিকে ধ্যানাসীন বুদ্ধদেবের বিশাল মূর্তি। তারই সামনে সকলে দাঁড়িয়ে থাকি। মহিলা মৃদুকণ্ঠে বলেন, আমাদের কোন তাড়াতাড়ি নেই, কী বলেন? একটু অপেক্ষা করা যাক, মঙ্‌কু এখানে আসবেন।

খানিক পরে আসেনও। সেই নিশ্চল ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির পিছন দিকের দ্বারদেশ থেকে অকস্মাৎ যেন আবির্ভূত হন, এক সচল জীবন্ত শাক্যমুনি। যেন কালো পাথরে কাটা সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ। চেটালো বুক। বিশাল দুই স্কন্ধদেশ আজানুলম্বিত বাহু। সুগোল মুখমণ্ডল। মুণ্ডিত কেশ। দীর্ঘ আয়ত নয়নযুগল। শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। পরিধানে গৈরিক বসন। ধীরপদে এগিয়ে আসেন। সুমুখে এসে স্থিরভাবে দাঁড়ান। প্রস্তরমূর্তির মতন। জননী তখনি ভূলুণ্ঠিত হয়ে ভক্তিভরে তাঁর চরণমূলে প্রণাম করেন। সন্ন্যাসী পুত্র দক্ষিণ কর তুলে অভয়-আশিস মুদ্রায় নীরব নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকেন। ঠোঁটের কোণে শুধু সুশান্ত প্রসন্নতার আভা ফুটে ওঠে।

মাতা-পুত্রের এই অভূতপূর্ব মিলন-দৃশ্য সেদিন সিংহলে হঠাৎ তিব্বতী আঙ্‌কেলের কথা স্মরণে এনে দেয়।

সারা বিকাল কাটে মানসের তীরে ঘুরেফিরে, ক্ষুদ্রমতি বালকের মত বিচিত্র বর্ণের পাথর সংগ্রহ করে। বোতলে শিশিতে মানস-তীর্থবারিও ভরা হয়। স্বামিজী দেখে হাসেন। বলেন, এ-সব পাথর বইবে কে? ব্রহ্মচারীজি জানান, কেন? নিজের কাছে রাখব। ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব।

স্বামিজী বলেন, ঘোড়াওয়ালাদের আপত্তি হবে। বলবে, ঘোড়ার ভার বাড়বে।

একদল অশ্বারোহী তিব্বতী হ্রদের জলের ধার দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। দুজনের পিঠে উঁচু হয়ে গাদা বন্দুক। রুকুমসিং পাড়ের উপর থেকে দেখে। গম্ভীর মুখে বলে, এরাই ডাকাতি করে। লুটতরাজ করে এসে মানস সরোবরে স্নান করে নেয়।—তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না তারা অদৃশ্য হয়।

পিছনের পাহাড়ের অন্তরালে অস্তমান সূর্য অন্তর্ধান করেন। গুর্‌লার শুভ্র তুষারশিখর নব-বিকশিত জবাফুলের মত সন্ধ্যার রক্তরাগ ধারণ করে। মানসের জলে তারই ছায়া দোলে। জলে যেন দীপশিখা জ্বলে।

স্বামিজী সাবধান করেন, বাইরে থাকতে চান তো আরও কিছু গায়ে জড়িয়ে আসুন,—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শীত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে দেখছেন তো।

দিনের আলো ম্লান হয়। গোম্ফা থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খ ও শিঙার ধ্বনি ভেসে আসে। সন্ধ্যাকাশেও তারাগুলি "নিভৃতে প্রাঙ্গণে বসে অনন্তের আরতির ডালি।"

চন্দ্রহীন আকাশে তারার আলোর প্রখর দীপ্তি। যেন পূর্ণিমা রজনী।

স্বামিজী বলেন, এও তিব্বতের আব্‌হাওয়া ও নির্মল পরিবেশের ফল। তারাগুলি তাই জলছেও যেমন উজ্জ্বল ভাবে, দেখায়ও তেমনি বড়। একটু পরেই চাঁদ উঠবে। কাল তো পূর্ণিমা গেছে।

মানস সরোবরে সেই পূর্ণপ্রায় চন্দ্রোদয় দেখি। চন্দ্রদেব শুধু আকাশে ওঠেন না। দ্বৈত দেহ ধারণ করেন। তারই এক মূর্তি মানসের জলে নামে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। শুরু হয় জলকেলি মানসে ও চাঁদে। তন্ময় হয়ে দেখি।

চারিদিকে আকাশে-পাহাড়ে, বিশাল সরোবরে শব্দহীন মহান্‌ প্রশান্তি।

॥ ৭ ॥

রাত্রে দারুণ শীত। কোনমতেই ঘুম জমে না। তবুও, আধজাগরণে অপূর্ব সুখস্বপ্ন সাগরে সারারাত মন মগ্ন থাকে।

তিব্বতে এসে অবধি ভোরে উঠে পথ চলার তাগিদ নেই। স্বামিজীর আদেশ, বেলা বাড়বে, রোদের তেজ ফুটবে, তবে পথে চলা। না হলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করার ভয়। তা ছাড়া, আগেই শুনেছি, এ দেশে দু বেলা পথ চলা নিয়ম নয়। ঘোড়াদের তৈরি করিয়ে সাজিয়ে পথে নামিয়ে চালানো দিনে একবারই। পথে দুপুরের রান্নার পাট বসালে অযথা সময় যাবে। তাই, সকালে একটু বেলা করে খাওয়াদাওয়া সেরে লম্বা পাড়ি দেওয়া,—সারাদিনে যতদুর এগোনো যায়।

অতএব, শীতের দেশে ভোরে আরামে থুলমার নিচে বিলাসের সুযোগ থাকে। তবুও, আজ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। গতকাল রাত্রে চন্দ্রোদয় দেখেছি। আজ মানসে সূর্যোদয় দেখতেই হবে। অসম্ভব শীত? তাতে কী। জীবনে এ-স্বর্ণ সুযোগ আর কি আসবে? মুড়িসুড়ি দিয়ে অতি ভোরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি।

বাইরে উষার অস্পষ্ট আলোক। আকাশে তারাগুলির চোখে রাত্রি জাগরণের ভারাক্রান্ত ক্লান্ত দৃষ্টি। চন্দ্রদেব পশ্চিম গগনে কোন এক পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য। হ্রদের জলে যেন মসৃণ গাঢ়নীল কাঁচের আবরণ। তারই উপর শুভ্র বাষ্পের মতন কুয়াশা ওঠে। দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। সেই পাতলা কুয়াশার মৌন যবনিকা ছিন্ন করে পূর্বদিকে স্বচ্ছ হরিৎ আভা ফোটে। দিকে দিকে আলোকের বন্যা ছড়ায়। তারাগুলি সভয়ে লুকায়। পূর্ব আকাশ রক্তাভ রঙ ধরে। অলক্ষ্যে কোথায় আলোর কমল ফোটে। মান্ধাতার শুভ্র শিখর সোনার মুকুট পরে। 'অচ্ছোদ সরসী নীরে' কে যেন আবির ছিটায়। সূর্যদেবের আবির্ভাব হয়। সরোবর-মুকুরে তারই প্রতিচ্ছবি পড়ে। রক্তিম তপন রজত দীপ্তি ধরেন। মানস সরোবরও রুপালী রোদে ঝল্‌মল্‌ করে।

বিমুগ্ধ নয়নে দেখতে থাকি, কতো বিভিন্ন বর্ণের অবর্ণনীয় রূপান্তরের লীলা। বিধাতার রূপসৃষ্টির অপূর্ব মহিমা।

সুধীর ক্যামেরা হাতে ফটোর পর ফটো তোলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে

দুঃখ করে, দূর ছাই। এ-সব কি আর ছবিতে ধরা দেবে, না, বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে ?

ওদিকে স্বামিজীর ডাক শুনি, ভানুসিং-এর রান্না তৈরি। হাত মুখ ধুয়ে চলে আসুন। আজ সারাদিন মানস সরোবরের তীর ধরে চলা। চমৎকার কাটবে।

সকলে প্রস্তুত হই। যাত্রাও শুরু হয়। অদূরে গোস্থল গোম্ফা। সেইখানে উঠে দেখতে হবে। ঘোড়া ছেড়ে হেঁটেই চলি। অনুভবানন্দজি বলেন, এটুকু হাঁটুন, ক্ষতি নেই। দেহ বেশি ক্লান্ত না হয়, নজর রাখবেন। এখনও কৈলাস পরিক্রমা বাকি। তখনই ত হবে এই যাত্রাপথের আসল পরীক্ষা। এখন চলেছেন পনেরো হাজার ফুট্-এ, তখন উঠতে হবে সাড়ে আঠার হাজার ফুট্ উঁচুতে।

এই সাবধান বাণীর বিশেষ কারণ থাকে। তিব্বতে এসে পর্যন্ত দেখছি, এখানে হাঁটতে গেলেই দম লাগে বেশি। দশ মিনিট চলার পর মনে হয় যেন সারাদিনই হাঁটছি। 'অল্‌টিটিউড্' ই এর জন্যে দায়ী। অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি আনে। এমনি বসে থাকতেও শ্বাসপ্রশ্বাসে অস্বাভাবিক অস্বস্তি বোধ দেখা দিতে পারে। তবে এও দেখি, যেমন দিন যায়, এখানকার আবহাওয়াও ক্রমে তেমনি ধাতসহ হয়ে আসে। প্রথম প্রথম একটুতেই যে ক্লান্তি বোধ হোত, এখন আর তা হয় না। তা ছাড়া, প্রতি মানুষের উপর প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়া সমভাবে দেখা দেয় না। আমাদের মধ্যে ব্রহ্মচারীজি বেশি কাবু হয়ে পড়েন। রাত্রে কোনদিনই একটুও তাঁর ঘুম হয় না, বলেন। মাঝে মাঝে দেখতেও পাই, বুকে বালিশ নিয়ে বসে নিঃশ্বাসের কষ্টে হাঁফান। দেখতেও আমাদের দুঃখ হয়। তাই তিনি ঘোড়া ছেড়ে চলতে চান না। কিন্তু আজ তাঁকেও এখানে হাঁটতে হয়।

গোস্থল গোম্ফা নিকটে আসে। হ্রদের জলের ধারে নয়। তীর থেকে এক বিশাল শিলা—rock – মাথা তুলে। তারই উপর প্রলম্বিত গোম্ফাগৃহ। সারি সারি কয়েকটা জানলা দেখা যায়।

সবাই ধীরে ধীরে পাহাড় বেয়ে উঠি। শ'দেড়েক ফুট মাত্র ওঠা। কিন্তু এখানে উঠতে মনে হয় শ'পাঁচেক ফুটের চড়াই। বুঝতে পারি, এদেশে দূরত্বের বা উচ্চতার পরিমাপ আমাদের অভ্যস্ত ধারণার মাপকাঠিতে ধরা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল, হাতে-গেঁথে-তৈরি করা

মঠের ঘরগুলি। ভেতরে ঢুকে দেখি, ঠিক তা নয়। পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক গুহা ও মানুষের হাতে সাজিয়ে গাঁথা পাথরের দেওয়াল,—দুই-এর সমন্বয়ে এই সব গোম্ফার সৃষ্টি। ঘরগুলির ভিতর যেন বন্দী-করে-রাখা অন্ধকার। এক-পাশে ছোট্ট জানলা। তাই দিয়ে যতটুকু আলো আসে। আলোর অভাব মেটাতে জানলা বড় করার উপায় নেই। দুর্দান্ত হিমবায়ুর কবলে পড়তে হবে।

গুহা-মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি। সুমুখে ধূপদীপ জ্বলে। মন্দিরে পূজা দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারও আছে। দেওয়ালের গায়ে থাকে-থাকে সাজানো পুঁথি। রঙিন কাপড়ে মোড়া। ঘরের একধারে নানারকম তিব্বতী বাদ্যযন্ত্র। উৎসবে ব্যবহার হয়।

তিনজন মাত্র ডাবা-সাধু এখানে আছেন। কাল যাঁদের দেখেছিলাম, দেখেই চিনতে পারি। তাঁরাও চোখ কুঁচকে হাসেন।

গোম্ফার ছাদের উপর থেকে মানস সরোবরের দৃশ্য জীবনে ভোলবার নয়। অন্তরে অভূতপূর্ব এক ভাব জাগায়। মনে পড়ে, বিখ্যাত পরিব্রাজক Sven Hedin মানস সরোবরকে "the pearl of all the Lakes of the world" বলে আখ্যা দেন এবং গোসুল গোম্ফার এই ছাদে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করেন :

"'All is indescribably quiet, so ethereal, transparent, and transitory, so subtile and sensitive, that I scarcely dare breathe. Never has a church service, a wedding march, a hymn of victory, or a funeral made a more powerful impression on me. Did fate compel me to pass my life in a monastery in Tibet, I would without hesitation choose Gossul-gompa."

আমার তন্ময়তা ভাঙে স্বামিজীর তাগাদায়,—এবার চলুন নামা যাক, সারাদিনের পথ এখন সামনে পড়ে।

অতএব, আবার হ্রদের তীরে নামা। জলের ধার দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সকলে হেঁটেই চলি। মানস সরোবর সৈকতে ভ্রমণ,—চরণ যেন আপনা থেকেই চলতে থাকে। বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট পাথর বিছানো উপকূল। আবার সংগ্রহ করার উৎসাহ জাগে। হাতে তুলে ধরি,—চকচকে মসৃণ, যেন ঘষে পালিশ করা মণিমুক্তা। মনে তখনি কি যেন ভাব জাগে. জলের

পাশে ফেলে দিই। ভাবি, যেখানকার যারা, তারা সেখানেই থাক। নীল জলে হাঁসের দল খেলা করে। মাঝে মাঝে পাড়েও ওঠে। সঙ্গে ছোট ছানাও ঘোরে। নিকটে যেতেই ডানা মেলে উড়ে যায়। ঘুরে গিয়ে জলে আবার ভাসে। কম্পিতকণ্ঠে কলধ্বনি তোলে। ছোট বড় নানা রঙের নানা জাতের হাঁস। শুধু শুভ্রকায় রাজহাঁসই নয়। পাংশুবর্ণ পাখিও দেখি। সমুদ্রের তীরে দেখা Sea gull শ্রেণীও। কতকগুলি তিত্তির পাখির মত দেখতে। মনে পড়ে, মানস সরোবরের এক জাতির হাঁসের নাম শুনেছি, ব্রাহ্মণী। এরা নাকি নিরামিষাশী। হ্রদের জলে মাছের রাজ্য। মাঝে মাঝে জল ছিটকিয়ে মাছ লাফিয়ে ওঠে দেখা যায়। সেই জলে এই হাঁসেদের বিচরণ। তবুও মাছ খায় না। সেই কারণেই কি এদের ব্রাহ্মণী নাম? কোন্ পুরাকালে এদের এই স্বভাব লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণী নাম কে দেন, আশ্চর্য বোধ হয়। তিব্বতীরা এই শ্রেণীর হাঁসের প্রাণনাশ করে না। অথচ এদের ডিম পেলে খাওয়ার নিষেধ নেই। রাজহাঁসের ডিম আবার আকারে সাধারণ ডিমের প্রায় তিনগুণ বড়। শীতকালে সব হাঁসই যে ভারতে চলে যায় তা নয়। এই ব্রাহ্মণী হাঁস যারা থেকে যায়, তারা রাক্ষসতালের দ্বীপে গিয়ে ডিম পাড়ে। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। মানুষের ধূর্ততা কম নয়। শীতকালে দুই হ্রদেরই জল জমে যায়। সেই বরফের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ডিম চুরি করে। তার শাস্তিভোগও করে একবার ক'জন তিব্বতী। হঠাৎ তুষার-গহ্বরে পড়ে তারা প্রাণ হারায়। একেই কি বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!*

মানস সরোবরের ধার দিয়ে চলেছি ঐ হাঁসগুলির মত মনও আনন্দ-সাগরে ভাসে। হটাৎ কোথা থেকে দেখা দেয় বড় বড় পোকা। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। চোখে মুখে গায়ে এসে পড়ে। স্বচ্ছন্দে পথ চলার বিঘ্ন ঘটায়। ভাবি, অখণ্ড শান্তি কি এখানেও থাকে না? না হলে, মানুষ যায় নিরীহ পাখির ডিম হরণে? রাক্ষসরাজ রাবণ আসে কৈলাসশিখর টলাতে?

---

* ১৯৪৫ সালে প্রখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিজ্ঞানী সলিম আলি মানস সরোবর ও কৈলাস ভ্রমণে যান। ঐ অঞ্চলের পাখিদের সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান এক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। Journal of the Bombay Natural History, Society, Vol. 46, No 2, pp 286-308) ১—দ্রঃ পরিশিষ্ট।

তীর্থযাত্রী উত্ত্যক্ত হয় অসংখ্য কীটপতঙ্গের উপদ্রবে এমন স্বর্গীয় পরিবেশেও ?

হ্রদের তটে পাথর-সাজানো মণিপ্রাচীর। সুধীর দেখিয়ে বলে, 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—লেখাটা বেশ পড়া যায়,—আমাদের সংস্কৃত ভাষার মত হরফ।

স্বামিজী বলেন, হবারই কথা। তিব্বতে সেকালে লিখিত ভাষা ছিল না। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের এখানে প্রচার হয় খৃষ্টীয় সপ্ত শতাব্দে। তারপর পালি ও সংস্কৃত, গ্রন্থগুলির তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ শুরু হয়,—অক্ষরগুলা হয়ে যায় সংস্কৃত ধাঁচে। জানেন নিশ্চয়, আমাদের কতো প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের দেশে লোপ পেয়েছে, এখন এই তিব্বতের বৌদ্ধ গোম্ফাগুলি থেকে তিব্বতী ভাষায় তাদের পুনরুদ্ধার হচ্ছে ? কিন্তু, দেখছেন, সামনে ঐ আবার কৈলাস দেখা দিলেন। চলেছি তাঁরই দর্শনে। দেবতার কেমন কৃপা দেখুন। জয় শিব শম্ভো!

সবাই তাকিয়ে দেখি। উত্তরে সুনীল আকাশে অমলধবল কৈলাস তুষার-শিখর। তারই প্রতিবিম্ব পড়ে মানসের জলে। পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় মান্ধাতার গিরিশ্রেণী। হ্রদে তারও ছায়া দোলে। হ্রদের দুই প্রান্তের দুই ঘাটে শুভ্র জটাজূট মহাত্মা যেন স্নানে নামেন।

বেলা বাড়ে। ঝড়ের মত বাতাসও ধেয়ে আসে। জলে তরঙ্গ তোলে। হ্রদের রঙ্ বদলায়। আগাছা ভেসে ওঠে। সেই স্বচ্ছ সুনীল শান্ত বারিধি আবার আবিল-চঞ্চল হয়।

বিকালে জলের কিনারা ছেড়ে উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে পথ। ঘোড়ায় চড়ে সবাই চলি। সেখানেও সুমুখে অদূরে জল দেখা যায়। কাছে পৌঁছুলে দেখি, জল কই ? আলো পড়ে চিক্‌মিক্ করে জলের মত—পুঞ্জীভূত Borax—সোহাগা।

স্বামিজী বলেন, দেখছেন সুধীরবাবু, একেই বলে মৃগতৃষ্ণা। এগুলা তিব্বতীরা তুলে নিয়ে যায়, ক্ষার হিসেবে ব্যবহার করে কাপড়চোপড় কাচতে, নোংরা হাত পা সাফ করতেও কাজ দেয়—সাবানের মত। তিব্বতীরা এই সোহাগা ভারতে চালান দিয়ে ব্যবসাও করে।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর আশপাশের জমিতে বড় বড় গর্ত নজরে আসে। স্বামিজী তাঁর ঘোড়ার উপর থেকে আবার চেঁচিয়ে বলেন, সুধীরবাবু! জানেন ওগুলো কিসের গর্ত ? শেয়ালের বাসা নয়। চান্ তো ঘোড়া থামিয়ে নেমে দেখুন,—ভাগ্যে থাকে, স্বর্ণলাভ হয়ে যাবে। ঠাট্টা নয়। এ-অঞ্চলে

মাটি খুঁড়লে সোনা পাওয়া যেত। অনেককাল আগে এইখানে কোথায় এক তিব্বতী প্রকাণ্ড সোনার তাল—nugget—পায়। তারপর সোনার খনির কাজ সুরু হয়ে গেল। ক'বছর পরে হঠাৎ বসন্ত রোগের মড়ক দেখা দিলে খনির কাজ সেই থেকে লামাদের আদেশে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা বলেন, এইসব খোঁড়াখুঁড়ির জন্যেই খনির দেবতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

ব্রহ্মচারীজি ফিরে তাকান। বলেন, নেমে দেখা যাবে নাকি একবার?

ভাবি, মানসের তটে সোনার ভাণ্ডার। এ-যেন স্বর্গভূমির দ্বারদেশে স্বর্ণমৃগের মিথ্যা মায়ার জাল পাতা। আবার তখনি মনে পড়ে, কালিদাস ঠিকই তো বর্ণনা করেন কৈলাসের পাদদেশে ধনরাজ কুবেরের অলকাপুরীর বিলাসবিভব,—এখানে স্বর্ণখনি, বিচিত্র কী!

মানস সরোবর ক্রমে দৃষ্টিপথের বাইরে যান। কিছুদূর গিয়ে খানিক নিচে একটা শুক্‌নো নদীর বুকে নামা। তবে সম্পূর্ণ জলহীন নয়। মাঝে মাঝে জলের ক্ষীণধারা। পাথরের আশপাশে ধোঁয়া ওঠে। সুধীর বলে, লোকজন নেই, আগুন নেই—অথচ ধোঁয়া?

স্বামিজী জানান, এখানে কয়েকটা hot spring—উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। নেমে দেখবেন চলুন,—আজ এরই কাছে অপর পারে তাঁবু পড়বে। ঐ ওদিকে ছোট পিরামিড-এর মত পাহাড়টা,—ওরই মাথায় ঐ তো মানসের ধারের সেই জিউগোম্ফা। আর এই যে নদীর বেড়্—এইটেই হোল গঙ্গা ছু,—মানস সরোবরের সঙ্গে রাক্ষসতালের সংযোগকারী,—সেদিন সেই যে সোনালী মাছ পালানোর গল্প শোনালাম। তবে সব সময়ে যে এখানে জলের ধারা বয়ে চলে এমন নয়। অনেকে বলে শতদ্রু নদী এইভাবে মানস সরোবর থেকে জন্ম নিয়ে রাক্ষসতালে পড়ে, আবার সেখান থেকে নদী হয়ে বেরিয়ে যায়। সে-নদী যে শতদ্রুর একটা উৎসমুখ, সন্দেহ নেই। আর কোন নদী মানস সরোবর বা রাক্ষসতাল থেকে সরাসরি বার হয় নি। কিন্তু এখানটায় গঙ্গা ছু—ছু মানে তিব্বতী ভাষায় জল বা জলের ধারা বা নদী—গঙ্গার নামের সঙ্গে যোগ হোল কেন বোঝা যায় না।

কয়েকটা গরম জলের ঝরণা। নদীর বুকে বড় একট শিলা, তারই মাঝখানে একটা ঝরণার জল টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে। গন্ধকের গন্ধও ভেসে আসে। পাথরটার উপর উঠে সবাই দেখি। পাথরের গা বেয়ে এধারে ওধারে জলের ধারা নামে।

শুনি, এই নদীপথে দুই হ্রদের মধ্যে ব্যবধান প্রায় মাইল ছয়েক।

অপর পারে তাঁবু ফেলা হয়।

জিউগোম্ফা থেকে তিনজন লামা ও ডাবা নেমে আসেন। স্বামিজী হাসিমুখে তিব্বতী ভাষায় তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। স্বামিজীকে তাঁরা "কাশী-লামা" বলে সম্বোধন করেন। আগেই শুনেছি, এঁদের নিকট ভারতের সাধু মাত্রেই "কাশী-লামা"। তাঁরা গোম্ফায় গিয়ে রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানান্। স্বামিজী বলেন, তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে, এখানে থাকা যাবে।

নিকটে পাহাড়ের গায়ে ছোটগুহা। তারই সুমুখে দাঁড়িয়ে লামাদের মত লাল জোব্বা পরা এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। সঙ্গে স্ত্রী। কোলে ছোট শিশু। সবারই মাথায় উস্কখুস্ক চুল—যেন জটাপাকানো। মুখচোখ অতি শীতে ফেটে চৌচির। কিচ্ তাদের কি জিজ্ঞাসা করে। এসে আমাদের জানায়, ওরা কৈলাস-পরিক্রমা করে ফিরছে।—শুনে ভাবি, ঐ কোলের শিশু নিয়ে।

কিচ্ জানায়, গৌরীকুণ্ডের নিকটে ডোলমাপাশ্-এ এখনও প্রচুর বরফ জমে রয়েছে।

স্বামিজী হেসে বলেন, সুধীরবাবু, তা হলে তুষার-অভিযানের জন্যে তৈরি থাকুন।

সুধীরও হেসে উত্তর দেয়, ঐ কোলের বাচ্চাটাকে দেখে মনে জোর পাচ্ছি।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকি। জিনিসপত্র গোছাই। বাইরে সুধীরের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনি। ডাক দেয়, শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়, দেখে যা কাণ্ড।

বাইরে এসে দেখি, তাঁদের সুমুখে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে এক তিব্বতী ভিখারিনী মূর্তিমতী জটেবুড়ি। শতচ্ছিন্ন কম্বলে দেহ-ঢাকা। বটগাছের ঝুরির মত চেঁড়া কালি গা থেকে ঝোলে। সারা মুখে বলিরেখা,—জরা, ব্যাধি ও দৈন্যের হাতে যেন লাঙল-টানা। পিচুটিভরা খুদে চোখ। কোনমতে পিটপিট্ করে তাকায়। ব্রহ্মচারীজির দিকে দুহাত মুঠো করে—দুই বুড়ো আঙুল তুলে—কলা দেখানোর মত কেবলি হাত নাচায়। শুধু তাই নয়। ফোকলা মুখে ভেঙ্‌চি কাটার মত জিব বার করে মাথাও দোলায়। স্বামিজী দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন। হেসে বলেন, ব্রহ্মচারীজি, এতে চটবার কিছু নেই। আপনাদের খাতির করে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। তিব্বতীদের এই হোল সাধারণ অভিবাদন প্রথা।

সুধীর তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢোকে, বলে যায়, মুভি ক্যামেরাটা আনি,—

এটার ছবি তুলতেই হবে। ভাবি, আশ্চর্য দেশ। অদ্ভুত দেশাচারও। আমাদের কাছে যে-আচরণ ও দেহ-ভঙ্গি অপমান-সূচক, এখানে তাই হয় শ্রদ্ধার নিদর্শন,—স্বাগত-সম্ভাষণ।

মানস-তটের সন্নিকটে আজ শেষ দিন। বেলা পড়ে। সন্ধ্যা নামে। শীতও বাড়ে। তাঁবুর ভিতর সবাই মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে। কেউ বা থুলমার আশ্রয়ে। কিচ্ ঢোকে। কেমন যেন আনমনা। মুখভার। সঙ্গে রুকুম। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করেন, কিচ্-এর হোল কি? অতো গম্ভীর।

সেই বিরাট জোয়ান সদাপ্রফুল্ল কিচ্ প্রায় কেঁদেই ফেলে। তার ঘোড়ার বাচ্চাটা বিকেল থেকে নিরুদ্দেশ। সবাই এই সন্ধ্যা পর্যন্ত চারপাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, তবুও পাওয়া যায় নি। রুকুম বলে, ঐ যে ভিখিরীটা এসেছিল,—নিশ্চয় ডাকাতদের গুপ্তচর। এইভাবে যাত্রীদের তাঁবুর কাছে এসে সব খোঁজখবর নিয়ে যায়। কাছাকাছি ডাকাতের দল কোথাও ঘুরছে কোন সন্দেহই নেই।

কিচ্-এর মহাদুঃখ, অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল, সবে বাচ্চাটা বড় হয়ে উঠছে, আসছে বছর থেকেই মাল বইতো, তার রোজগারও বাড়ত।

এ-যেন তার সবে রোজগারী জলজ্যান্ত ছেলেটাই উধাও হোল।

ভাবি, এমন স্বর্গীয় দেশ, এত বড় তীর্থক্ষেত্র,—এখানেও এইসব চুরি ডাকাতি!

রাত্রের গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ তাঁবুর ছাদের উপর পটাপট্ শব্দ। স্বামিজী অস্ফুটে বলেন, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা।—বলতে বলতেই ঝমাঝম্ জোর শিলাবৃষ্টি নামে। স্বামিজী ডাকেন, শুনতে পাচ্ছেন সুধীরবাবু। ঘুমোলেন নাকি? দেখুন, হয়ত এবার বরফ পড়াই সুরু হবে।—সুধীর আরও মুড়ি দিয়ে বলে, পড়ে পড়ুক, এখন তো খাসা শুয়ে আছি।

সেই একটানা বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ কাতর হ্রেষাধ্বনি ওঠে, শোনা যায়। বৎস-হারা ঘোটকী যেন কৈলাসপতির চরণে অভিযোগ জানায়।

আমাদের সবারই মনে আশঙ্কা জাগে, এই দুর্যোগের মাঝে বাচ্চা ঘোড়াটা হয়ত বেঘোরে প্রাণই হারাল।

॥ ৮ ॥

রোদ উঠলে তাঁবু থেকে বের হই। দিগন্ত আলোয় ঝল্‌মল্ করে। সুধীর বলে, ও কী! চেয়ে দেখ্, কিচ্-এর মুখভরা আনন্দের হাসি। কিচ্ এগিয়ে আসে। লম্বা বেণী দুলিয়ে, শুভ্রদন্তপঙ্‌ক্তি প্রকাশ করে। আঙুল তুলে দেখায় তাঁবুর পাশে তার ঘোড়া,—মাথা হেঁট করে বাচ্চার গা চাটে,—লম্বা জিব বার করে। মাথা তুলে মাঝে মাঝে ডাকও ছাড়ে। যেন, সগর্বে সবাইকে ডাকে,—দেখে যাও, এই তো আমার আদরের হারাধন।—রাত্রের সেই মর্মভেদী কাতরধ্বনি নয়। এখন হ্রেষারবে অবোল পশুরও মাতৃস্নেহ উথলে পড়ে।

শুনি, ভোরবেলা বাচ্চাটা আপনা থেকে চলে আসে—হয়ত মায়ের ডাক কানে যায়—কোথায় কতোদূরে চলে গিয়েছিল, রাত্রের ঐ প্রবল বর্ষণের মাঝে কোথায়ই বা ছিল,—কেমন করেই বা বেঁচে ফিরল,—আশ্চর্য কাণ্ড।

অনুভবানন্দজি বলেন, যিনি বাঁচাবার তিনিই বাঁচিয়েছেন। ঐ দেখুন না, প্রসন্ন মুখে কী হাসির ছটা! প্রকৃতই অদূরে মাথা তুলে কৈলাসশিখর যেন হাসেন। কালিদাস কি স্বচক্ষে দেখেই লেখেন: রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।—কৈলাসপর্বত কুমুদশুভ্র তুঙ্গশৃঙ্গ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করে বিরাজ করে—দিনে দিনে রাশীভূত ত্র্যম্বকের অট্টহাস্যের ন্যায়।

'জয় শিবশম্ভো' ধ্বনি তুলে কৈলাসপতিকে সকলে প্রণাম করি।

আহারান্তে তাঁবু গুটিয়ে মানস সরোবরের সান্নিধ্য ছেড়ে আবার যাত্রা শুরু। সারাদিন পথ চলা। হাঁটা নয়, ঘোড়ায় চেপে। সমতলভূমি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। তবুও, ঘোড়া থেকে নামতে ভরসা হয় না। একে ত তিব্বতের সূক্ষ্ম শুষ্ক বাতাবরণে সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্বস্তি জাগে, তার উপর কৈলাস পরিক্রমার জন্য এখন সকল শক্তি সঞ্চয় করে রাখা। তখন যে যেতে হবে,—সাড়ে আঠার হাজার ফুট্-এরও উপর দিয়ে। এখন ত চলেছি পনের হাজার ফুট্-এ।

সুধীর অনুভবানন্দজিকে বলে, স্বামিজী, পারব নিশ্চয়? কি বলেন? এতদূর এসে ফেলে রেখে চলে যাবেন না যেন।

স্বামিজী সবাইকে উৎসাহ দেন। গলা ছেড়ে ভজন ধরেন। সমবেত কণ্ঠে কৈলাসপতির জয়ধ্বনি দিগন্ত মুখরিত করে।

পথের আশপাশে সেই ছোট ছোট কাঁটাগাছের ঝোপ। অন্য কোন

গাছপালা কোথাও নেই। যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও জীবজগতের সাড়াশব্দ চঞ্চলতা নেই। প্রকৃতি যেন ধ্যানমগ্না নিস্পন্দা যোগিনী। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে, অদূরে পাহাড়তলিতে কি যেন সব ঘোরে ফেরে। এগিয়ে যেতে যেতে নজর করি। একপাল জঙ্‌লী ঘোড়া।

মনে পড়ে, ঠিকই তো। পড়েছি, তিব্বতের এই বন্য পশুর কথা। নাম এদের—Kiyang কিয়াং। দেখাত ঘোড়ার মতন, গাধার সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য আছে। ১৮১২ সালে মুরক্রফ্‌ট যখন এদেশে আসেন, তিনিও এদের লক্ষ্য করেন। Journal of the Asiatic Society of Bengal-এর Vol. XVII Part II A (১৮৪৮)-এ প্রথম পৃষ্ঠায় এই কিয়াং-এর সচিত্র বর্ণনা প্রকাশিত হয়। চমৎকার এক কাহিনীও তাতে ছিল। তিব্বতের সেই বন্য কিয়াংটি ১৮৪৮ সালে কোন এক যাত্রীদলের পোষা পাহাড়ী ঘোড়াকে দেখে কেন যেন আকৃষ্ট হয়। নিজের দল ছেড়ে তার সঙ্গ ধরে সারাক্ষণ চলতে থাকে। সেই ঘোড়াটির সঙ্গে কিয়াংটিকেও কলকাতায় নিয়ে আসা হোলো। তখন তাকে পাঠানো হচ্ছে বিলেতে,—নতুন-দেখা এক প্রাণীর নিদর্শন স্বরূপ। তার বয়স সে-সময়ে বছর দুই তিন। কাঁধের কাছে উঁচু, তিন ফুট দশ ইঞ্চি। গায়ের রঙ,—bay বা fawn—পাঁশুটে, কিন্তু সারাদেহে নীলাভ ইঙ্গিত। ঘাড়ের ও লেজের চুল brown-black কালচে-কটা ভাব। মাথাটা প্রকাণ্ড,—গাধার চেয়ে ঘোড়ার আকারের। তার বন্ধু ঘোড়ার সহিস ছাড়া আর কেউ তাকে সামলাতে পারে না। অচেনা কাউকে দেখলে লাথি ছোড়ে, কামড়াতে যায়। কিন্তু সাথী ঘোড়াটির সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব,—শুধু তারই সঙ্গে আহার বিহার, এমন কি জল খাওয়াটুকু পর্যন্ত। অগত্যা তাই সেই ঘোড়াটিকেও তার সঙ্গে বিলেতে পাঠাতে হয়। কিয়াংটিকে পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন, সাইবেরিয়াতে Dshikketaei বলে যে প্রাণীটিকে প্রখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও পর্যটক Pallas প্রথম দেখেন এবং Equus Hemionus নামে অভিহিত করেন,—কিয়াং-ও সেই সমজাতীয়। ভারতের সিন্ধু বা কচ্ছ প্রদেশের মরুপ্রান্তরে যে এক শ্রেণীর গর্দভ দেখা যায়, তাদের সঙ্গে কিয়াং-এর কোন মিল নেই। সেখানকার সে প্রাণীগুলির ডাক গাধার মতন। কিয়াং-এর হ্রেষাধ্বনি। কিয়াংদের বাস তিব্বতের সু-উচ্চ হিমশীতল মালভূমিতে,—যে-অঞ্চল থেকে ইন্‌ডাস্‌ নদীর উৎপত্তি; আর সে-প্রাণীগুলি বিচরণ করে ইন্‌ডাস্‌-এর শেষপ্রান্তে সাগর-সঙ্গমের নিকটে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। কচ্ছদেশের

সে-জন্তুগুলির দেহে জেব্রাদের মত কিছু কিছু stripes—লম্বা দাগ দেখা যায়, কিয়াংদের শরীরে সে-ধরণের রেখা নেই।—এই সবই পড়েছিলাম সেই বিবরণীতে।

আজ অবাক হয়ে তিব্বতে সেই কিয়াং-এরই দল দেখতে দেখতে চলি। তাদের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিহার, সাবলীল গতিবিধি, ঘাড় বেঁকিয়ে পুচ্ছ তুলে ছোটাছুটি,—থেকে-থেকে বিচিত্র হ্রেষারব, দৌড়ের মাঝে দল বেঁধে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে দূরে পলায়ন,—দেখে মনে পড়ে, ছোটবেলায়-দেখা কলকাতার ময়দানে সার্কাসের ঘোড়ার খেলা। সেকালের সেই সার্কাস দেখার রোমাঞ্চ আজ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপের এক সানন্দ বিস্ময়ের অনুভূতি আনে। কোথায় সেই গড়ের মাঠের পুকুর পাড়। তাঁবুর মধ্যে বসে শেখানো সাজানো ঘোড়ার খেলা। আর এখানে? ওধারে ঐ মানস সরোবর, এদিকে অদূরে ঐ কৈলাস,—তারই পরিবেষ্টনে বিশ্ববিধাতার ক্রীড়ামঞ্চে মুক্ত জীবের সজীব প্রাণোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস।

সুধীর বলে, স্বামিজী। এসেছি শিবের রাজ্যে,—এখানে তাঁর বৃষ দেখি না, ঘোড়া কেন? নারায়ণের বরং অশ্ব কল্পনা করা যেতে পারে—

বাধা দিয়ে বলি, কল্পনা কেন? বদরীনাথ ছাড়িয়ে মানাগ্রাম। সেখানে প্রবাদ আছে, নারায়ণ তিব্বতের মাংসাশীদের অনাচার দেখে ঘোড়ায় চড়ে চলে আসেন বদরীনাথে। মানাগ্রামের পাশে পাহাড়ের গায়ে বিরাট এক পাথরে এখনও কালো এক ছাপ দেখিয়ে বলা হয়,—ঐ হোল নারায়ণের সেই শ্যাম ঘোটকের চিত্র।

স্বামিজী হেসে বলেন, হয়ত এই কিয়াং চড়েই গিয়েছিলেন।—কিন্তু শিবের দেশের ষাঁড়? ব্যস্ত হবেন না, তারও দর্শন হবে।

স্বামিজী শিবের সেই বাহন দেখান বিকালে।

সারাদিন আজ কৈলাসশিখর সামনে লক্ষ্য রেখে সমতলভূমির উপর দিয়ে আসা! ধূ-ধূ করে যেন তেপান্তরের মাঠ। সেই ময়দানের উপর দিয়ে যেতে টের পাওয়া যায়,—শক্ত মাটি বা জমি নয়। নদীর চরে যেমন কোথাও দেখা যায় চোরাবালি,—এখানে তেমনি চোরা মাটি। ভস্‌ভস্ করে ঘোড়ার পা বসে যায়।

তার কারণও বুঝতে দেরি হয় না। আশপাশে জলার মত অনেক জায়গায় জল দাঁড়িয়ে।

বড় বড় সারস পাখি, বক, হাঁস—জলের পাশে ঘোরাঘুরি করে; কোথাও

বা জলের মধ্যে ভণ্ড তপস্বী সেজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় মাছ শিকারের লোভে। বড় দাঁড়কাকও ওড়ে। কালো কুচকুচে রঙ,—যেন পালিশ-করা গা। ঠোঁটগুলি হলদে।

সেই জলাভূমির ধারে শক্ত জমি দেখে তাঁবু পাতা হয়। তাঁবুর মুখ থাকে কৈলাসের দিকে। তাঁবুর ভিতরে বসেও যাতে দর্শন পাওয়া যায়।

স্বামিজী বলেন, এই জায়গার নাম বরখার ময়দান। এখান থেকে পশ্চিমের দিকে গেলে তীর্থপুরী যাওয়া যায়। আর আমাদের যেতে হবে উত্তরে ঐ কৈলাসপতির কাছে। কতো নিকটে চলে এসেছি দেখুন। সুধীরবাবু কই? খোঁজ করছিলেন শিবের বাহনদের। ঐ দেখুন, সব চরছে।

তাকিয়ে দেখা যায়, খানিক দূরে তিব্বতীদের কয়েকটা তাঁবু। ঝুল মাথা কালো রঙের। তাঁবুর বাইরে ঘুঁটের স্তূপ। আর বহু চমরী, ইয়ক্ প্রভৃতি চরে বেড়ায় মাঠে।

স্বামিজী পৌঁছেই রুকুমকে পাঠিয়ে দেন, দুধ ও মাখনের সন্ধানে। বলেন, শিবঠাকুরের দেশে কৈলাস ওদেরই ত মানায়। দেখতেও যেমন বিরাট, দেহও তেমনি দীর্ঘলোম-বহুল। দেবতাটিও তো কি রকম বিশাল আকাশ জোড়া,—দেখতেই পাচ্ছেন।

প্রকৃতই তাই। এখানে তো মানুষের-হাতে-গড়া মন্দির নয়, দেবতার ধাতুময় বিগ্রহও নয়। নীল নভস্তলের চন্দ্রাতপতলে প্রাকৃতিক সৃষ্টি উত্তুঙ্গ এক শৈলশিখর। অবিকল শিবলিঙ্গের আকৃতি। শিরে তার শোভা পায় শ্বেতকমলের ন্যায় তুষারকিরীট। চমরীদল যেন তাঁরই উদ্দেশে চামর ব্যঞ্জন করে।

নির্বাক হয়ে এই অপরূপ দৃশ্য দেখি। কৈলাস গিরিশ্রেণীর পাদদেশে পৌঁছে গিয়েছি। উত্তর দিগন্তে মাথা তুলে কৈলাসের চূড়া। শিখরের দক্ষিণাংশের এখান থেকে সর্বোত্তম দৃশ্য। দীর্ঘ শৈলপ্রাকার,—তারই অন্তরালে যেন হঠাৎ-ওঠা বিশাল গম্বুজ আকার।

স্বামিজী জানান, কাল এইখান থেকে কৈলাস-পরিক্রমা সুরু। দুদিন লাগবে ঘুরে আবার এইখানে ফিরে আসতে। মাঝে একটা রাত্রি কাটানো। কৈলাসের ঐ ওধারে উত্তর অঞ্চলে। এখান থেকে যেমন কৈলাসপতির দক্ষিণ মুখের দর্শন, সেখান থেকে তেমনি উত্তর মুখের।

সুধীর বলে, শিখরটিরই চারপাশে ঘুরতে হবে বুঝি?

স্বামিজী বলেন, সব জায়গায় শিখরের গা দিয়ে যাওয়া কি আর সম্ভব ? পথ কোথায় ? তাই শিখরকে কেন্দ্র করে আশপাশের পাহাড়ের ওপর দিয়েও মাঝে মাঝে যেতে হয়। নদী পড়বে পথে। কৈলাসের গা বেয়ে সব নামছে, —শিবের জটার মতন। চলুন তো কাল,—দেখবেন নিজের চোখেই। মালপত্র কিন্তু এইখানে রেখে যেতে হবে,—তাঁবুও এইভাবে খাটানো পড়ে থাকবে। সঙ্গে নিতে হবে শুধু এই দুদিনের জন্যে যেগুলা নেহাৎ না হলেই নয়,—একটা রাত কাটাবার মত বিছানা আর দুটো দিনের খাওয়ার জিনিস। কাল সকালে জয় শিবশম্ভো বলে যাত্রা করে পরশু বিকেলে এখানে ফিরে আসা। দেখবেন, সে কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

সুধীর জিজ্ঞাসা করে, তা' বুঝলাম। কিন্তু তাঁবু থাকবে এখানে, এক রাত হলেও রাতটা কাটবে কোথায় ?

স্বামিজী হেসে আশ্বাস দেন, ভাবনা নেই,—চলুন তো। শিবের কৃপায় আশ্রয়ের অভাব হবে না। হিন্দুদের এটা বড় তীর্থক্ষেত্র, তবুও কোন মন্দির, ধর্মশালা নেই, দেখছেন। কিন্তু, তিব্বতী বৌদ্ধ মঠ পরিক্রমার পথে চারদিকে মোট পাঁচটা আছে। প্রথম—পশ্চিম দিকে নিয়ানড়ি গোম্ফা। দ্বিতীয়—ডিরিফুক্,—সেটা হোল উত্তর দিকে—পরিক্রমার মাঝপথে—সেইখানে আমরা রাত কাটাব—এক রাত্রির ব্যাপার তো। তারপর, পূর্বে জুনথুলফুক গোম্ফা। দক্ষিণদিকে হোল গেংটাগোম্ফা ও সেলুঙ্ গোম্ফা। আজ রাত্রে শোবার আগে কাল সঙ্গে কি কি যাবে দেখে সাজিয়ে রাখতে হবে।

সুরেন্দ্র মহারাজ জানান, আমার ওপর যেটুকু ভার দেওয়া আছে, করে রেখেছি, আলাদা থলিতে খাবার জিনিসপত্র নেওয়া হয়েছে।

এ যেন এক নতুন করে যাত্রার আয়োজন। দুদিনের জীবন, সে-জীবনের নিষ্প্রয়োজন সব কিছু পরিত্যাগ করে নিজেকে নিয়ে দেবাদিদেবের সান্নিধ্য শরণ।

তাঁবুর বাইরে তখনও রোদের তেজ। সুধীর তাপমান যন্ত্র এনে দেখে। বলে, এ কী রে। এ যে ৮৫° ডিগ্রী ফারেনহাইট। এ কি বাঙলাদেশেই আছি নাকি ? আরামে বাইরেই ঘোরা যাক খানিক।

ঘণ্টা দুই পর। সূর্যাস্ত হয়। সন্ধ্যার ছায়া নামে। সবাই তাঁবুর আশ্রয়ে। সুধীর কৌতূহলী হয়ে বাইরে যায় আবার তাপমাত্রা নিতে। টেম্পারেচার নেমে গেছে ৩২° ডিগ্রীতে। অর্থাৎ, দু ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চাশ ডিগ্রীর উপর তফাৎ।

সুধীর বলে, শিবঠাকুরের আজব রাজত্বই বটে। ঢুকলাম আমি থুলমার মধ্যে। কী কনকনে শীত। পাঁচ-ছ'টা জামার তলায় হি হি করে কাঁপছে বুক —যেন খালিগায়েই রয়েছি।

স্বামিজী বলেন, রাত্রে বালতির জলও জমে বরফ হয়ে থাকবে। সকালে আগুন জেলে গলিয়ে তবে চা তৈরি হবে।

অমন শীত, তবুও চাঁদ উঠলে আবার রাত্রে বাইরে আসি।

তারকাখচিত ঘননীল আকাশ। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকমণ্ডিত কৈলাস-শিখর। তুষারশীর্ষের শুভ্র রূপ।

নিশীথিনীর স্বচ্ছ আচ্ছাদনের অন্তরালে ধ্যানমৌনী যোগীরূপে আসীন যেন দেবাদিদেব স্বয়ং মহাদেব।

ভাবি, কাল আশ্রয় লাভ হবে ওঁরই অঙ্কদেশে।

॥ ৯ ॥

আজ কৈলাস পরিক্রমা সুরু।

নবীন উৎসাহে মন পরিপূর্ণ। এই নিদারুণ শীতের মধ্যেও সবারই সাজ সাজ রব। কিন্তু, সঙ্গী ব্রহ্মচারীজি দেখি, নীরব নিশ্চেষ্ট। চুপচাপ বালিশ কোলে নিয়ে বসে থাকেন। চোখমুখ ভারাক্রান্ত। শুনি, শ্বাসের অসহ্য কষ্টে সারারাত নিদ্রাহীন কেটেছে। ক্ষীণকণ্ঠে জানান, আপনারা ঘুরে আসুন, এ-শরীর নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখানে পনেরো হাজার ফুটেই নিঃশ্বাসের এই কষ্ট, সাড়ে আঠার হাজার যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না। এখান থেকেই কৈলাসপতিকে প্রণাম করছি।

এ দুঃসংবাদে সকলেই বিমর্ষ হই। এই দুর্গম তীর্থযাত্রায় সহযাত্রী সবাই মিলে এক। একজন সঙ্গীরও যাত্রাভঙ্গ শুভযাত্রার অঙ্গহানি।

সুধীর দমে না। বলে, উঠুন ব্রহ্মচারীজি। ঠিক যেতে পারবেন। হিমালয়ের সব দুর্গম তীর্থ আপনার পায়ে হেঁটে ঘোরা,—কতো গল্প শুনিয়েছেন। এইটেই এখন শুধু বাকি। এতদূর এমন কষ্ট করে এসে,—কৈলাসের এই দোরগোড়ায় আপনাকে ছেড়ে যাওয়া,—অসম্ভব কথা। আপনাকে নিয়ে যাবই আমরা।

ব্রহ্মচারীজির লম্বাচাওড়া পালোয়ানের মত দেহ। মুখভরা দাড়িগোঁফ। মুখ তুলে তাকান এখন অসহায় শিশুর মত। দীর্ঘশ্বাস টেনে বলেন, যাওয়ার

জন্যেই ত এসেছিলাম—কতো আশা নিয়ে। কিন্তু এ যে দেখছি শুধু বসে থাকতেও নিঃশ্বাসের কষ্ট,—আর সেইখানে সেই আরও উঁচুতে? অসম্ভব যাওয়া।

স্বধীর ছাড়ে না। স্বামিজী এ-বিষয়ে পীড়াপীড়ি করেন না, শুধু বলেন, এইখানে এসে আর এইটুকু যাবেন না? ভেবে দেখুন। এ-স্থযোগ কি আর আসবে?

ব্রহ্মচারীজি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলেন, ভাববার আর কিছু নেই,—আপনারা যাত্রা করুন। আমি রইলাম এখানে। আরও এগিয়ে শেষে কি ঐ পথেই মারা যাব?

স্বধীর হেসে ওঠে। বলে, ব্রহ্মচারীজি! মরণের ভয়ই যদি না-যাওয়ার কারণ হয়, তাহলে সঙ্গে আপনাকে নিয়েই যাবই। এমন জায়গায় দেহ রাখার স্থযোগ যদি আসেই, আপনার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে বলুন? একটা কথা দিয়ে রাখি, ভগবান না করুন, ঐ পথে যেতে যদি সত্যি আপনার কিছু ঘটেই, তবে দেশে ফিরে চারদিকে প্রচার করব, দেখে এলাম সত্যকারের মহাপুরুষ। কৈলাসের পায়ের তলায় কিভাবে স্বেচ্ছায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন। ফটোও ছাপিয়ে দেব ভারতের সব পত্রিকাতে। উঠে পড়ুন। এখনও 'না' বললে আপনাকে বেঁধেই নিয়ে যাওয়া হবে। বলুন, কি কি জিনিস আপনার সঙ্গে যাবে, আমরাই গুছিয়ে নিচ্ছি।

ব্রহ্মচারীজি উষ্মাপ্রকাশ করেন, আমার এই অবস্থায় রসিকতা করছেন আপনারা?

আমরাও গম্ভীর ভাবে জানাই, নিয়ে তাঁকে যাবই।

এইভাবে অবশেষে ব্রহ্মচারীজিকে যেতে বাধ্যই করা হয়।

তাঁবুর বাইরে এসে দেখি, সব ঘোড়াগুলি সাজসজ্জা করে প্রস্তুত। চড়বার ঘোড়াগুলি ত সঙ্গে যাবেই, মালবাহক ঘোড়া দুটা গেলেই যথেষ্ট,—তাঁবু ও অধিকাংশ মালপত্র এখানে রইল। তবুও, সব ঘোড়াই সেজেগুজে দাঁড়িয়ে।

ব্যাপার কি?

কারণ আর কিছুই নয়, কিচ্ জানায়, ঘোড়াদেরও পুণ্যলাভের অধিকার আছে, তার স্থযোগও দিতে হবে। তাছাড়া ঘোড়ার পুণ্যে মালিকেরও পুণ্য। অতএব, খালি পিঠে ঘোড়ারাও চলে।

যাত্রা আরম্ভ হয় একটু বেলা করে। দুপুরের আহারের পাট সকালেই চুকিয়ে।

এইবার বোঝা যায়, এত জলাভূমি কেন। সমতলভূমির উপর নদীর কয়েকটি ধারা। অদ্ভুত সব নাম।

ডামা ছু, ঝঙ ছু, তারচান ছু। জল বেশী নয়। পাহাড় থেকে নেমে জমির উপর নদী যেন হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। পুল না থাকলেও ছপছপ করে ঘোড়াগুলি সহজেই পার হয়।

ক্রমে কৈলাস গিরিশ্রেণীর ঠিক পাদদেশে এসে পৌঁছুই। জায়গার নাম তারচান বা দারচেন। আশেপাশে দু-একটা পাথরের ঘর। কয়েকটা তিব্বতীদের তাঁবুও। শুনি, দর্মা ও জোহার পট্টির ভুটিয়াদের এখানে বড় মণ্ডী বসে। জ্ঞানিমামণ্ডী থেকেও এখানে সোজা পথ এসেছে।

স্বামিজী বলেন, এইবার পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলা, গা বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠা। আসল পরিক্রমা সুরু। ঐ দেখুন মাথা তুলে কৈলাসশিখর। প্রণাম করে চলুন এবার এগিয়ে।—জয় শিবশম্ভো!

অজানা কীসের যেন স্পর্শে প্রাণে শিহরণ জাগে। প্রকৃতই কৈলাসের চরণপ্রান্তে এলাম! তাঁরই বিশাল লিঙ্গমূর্তি দক্ষিণে রেখে তাঁকেই পরিক্রমা। কয়েক পা নয়। কয়েক মুহূর্তও নয়। মন্দিরের অপরিসর গণ্ডির মধ্যে, ক্ষুদ্র বিগ্রহকে ঘোরা নয়। দুদিন ব্যাপী চক্রাকারে গিরিচূড়ার প্রদক্ষিণ। প্রায় বত্রিশ মাইল এই পরিক্রমা পথের দীর্ঘতা।

একান্ত মনে দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করি। ভাবনাশূন্য আনন্দময় প্রশান্তচিত্তে এগিয়ে চলি। কখনো ঘোড়ায় চড়ে, কখনো পদব্রজে।

কৈলাস পর্বতের গা বেয়ে চলা। যেন কোন বিশাল দেবালয়ের প্রাচীরের পাশ দিয়ে পথ। মাঝে মাঝে ঝরণার ধারা।

পথ কখনো ওঠে, কখনো নামে। সবাই ধীর গতিতে এগিয়ে চলি। হঠাৎ সুধীর ঘোড়া থামায়। মুখ ফিরিয়ে হাত তুলে উৎসাহভরে ইসারা করে দেখায়। পাহাড়ের উপর কি যেন সব ঘোরে। সকলে দাঁড়িয়ে দেখি।

হরিণের দল। হালকা পাঁশুটে fawn বর্ণ। আকারে বড় নয়। পাহাড়ের খাঁড়া গায়ে অবলীলাক্রমে চলাফেরা করে। দেখি আর ভাবি, হরগৌরীর কৈলাস তপোবনের মৃগযূথ নাকি?

মাইল দুই যাবার পর পথের আশপাশে অনেক মণিপ্রাচীর। স্তূপাকারে

পাথর সাজানো। পাথরের গায়ে ছেনি দিয়ে কেটে কোথাও ওঁ মণিপদ্মে হুঁ লেখা, কোথাও বা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আঁকা, কোথাও তিব্বতী ভাষায় কি সব লেখা।—বৌদ্ধতীর্থপথের এ এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গসৌষ্ঠব। তিব্বতে প্রবেশ করার পর অতি পরিচিত দৃশ্য।

আরও মাইল দেড়েক যাবার পর খানিকটা সমতলভূমি। ডাইনে পাহাড়ের গায়ে দূরে এক গোম্ফা দেখা যায়। কিচ্ বলে, সেলুঙ্ গোম্ফা। ওটা কৈলাসের দক্ষিণদিক, আমাদের পথ এখন পশ্চিম গা দিয়ে ঘুরে উত্তর দিকে যাবে।

পথের ধারে পাথরের গাঁথনি—এক প্রকাণ্ড তোরণ। লাল রঙ্। ভিতরে থামে বুদ্ধমূর্তি। জায়গার নাম সেরস্থঙ্। শুনি, এরই নিকটে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন তিব্বতীদের মেলা বসে। বিশাল এক ধ্বজা তখন তোলা হয়।

এতক্ষণে পথের নিকটে পাহাড়ের গায়ে ও পাথরের খাঁজে জমা বরফ দেখা যায়। বাঁ পাশে এক নদীর প্রবাহ। সেখানেও জল মাঝে মাঝে জমে বরফ হয়ে আছে, কোথাও স্রোতের বেগে বরফের চাঙ্গর ভেসে চলে। নদীর অপর পারে পাহাড়ের উপর আর এক গোম্ফা। নিয়ানৃডি গোম্ফা। আমাদের পরিক্রমার পথের উপর প্রথম গোম্ফা। পাহাড়ের নামও নিয়ানৃডি।

নিয়ানৃডি নাম শুনে সুধীর বলে, নামটা হয়ত নন্দীগোম্ফা। কৈলাসের পায়ের কাছে নন্দীরই ত অবস্থান।*

গোম্ফায় আমরা যাই না। নদীও এখন পার হই না। নদীর বাম তীর ধরে এগিয়ে চলা। স্বামিজীর তাগাদা, পথে আর কোথাও দেরি করা নয়। সোজা কৈলাসের উত্তরদিকে বেলাবেলি ডিরিফুক্ গোম্ফায় পৌঁছানো চাই-ই, কখন আব্‌হাওয়া খারাপ হয়ে যায়, বরফ পড়তে সুরু করে, কিছুই বলা যায় না।

নদীর অপর পারের গিরিশ্রেণী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ের মাথার অতি অদ্ভুত আকৃতি। গাছপালা থাকবার কথাই নয়। নেই-ও। আশ-পাশের পাহাড়গুলির নিচের অংশ—conglomerated rock—ছোট ছোট

* কৈলাসের এই গোম্ফাগুলির নামকরণ ও কৈলাস আবিষ্কার সম্বন্ধে স্বামী প্রণবানন্দ ভারতীর "হিমারণ্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নুড়ি পাথর জমে পাহাড়ে রূপান্তরিত। সবুজ ও বেগুনী রং-এর প্রকাশ বেশি। কিন্তু ওপারের পাহাড়গুলির মাথায় সারি সারি, ধূসরবরণ শিলারাশি। কতো বিচিত্রই না তাদের আকার। এপার থেকে দেখায় যেন আকাশের বুকে পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড দুর্গ। কোথাও যেন সারি সারি মন্দিরের চূড়া। আবার কোথাও মনে হয় সারিবদ্ধ তীর্থযাত্রীর শোভাযাত্রা চলে গিরিশিরার উপর দিয়ে। কৈলাস-দর্শনে বিমুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। নীল আকাশের পটে তাদের দেহগুলি সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। অবাক হয়ে দেখি আর ভাবতে থাকি, আমিও যেন ঐ যুগ-যুগান্তের শিলীভূত চিরন্তন যাত্রীদলেরই নগণ্য এক অংশ।

পাহাড়গুলির মাথায় শুধু এই শিলারাশির বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন আকৃতিই নয়, ঐ সব পাহাড়ের মাথা থেকে নামে সারি সারি বিপুল ঝরণাধারা। একের পর এক জলপ্রপাত। কোন কোনটি ৬০০।৭০০ ফুট উপর থেকে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেন মহাদেবের দেহ আঁকড়ে দীর্ঘাকৃতি শ্বেতবর্ণ সর্পদল নেমে আসে।

আবার, এদিকে পথের ডানপাশে পাহাড়ের ফাঁকে মাঝে মাঝে হঠাৎ দর্শন দেন,—স্বয়ং কৈলাসশিখর। সবাই সোৎসাহে দেখান, ঐ—ঐ দেখা যাচ্ছে আবার কৈলাস।

সেখানেও আরেক অভিনব লীলা। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কতো বিভিন্ন আকার সেই একই শিখরের। কখনো মনে হয়, সূচ্যগ্র ত্রিকোণ আকৃতি,—পিরামিড। আবার কখনো দেখায়, গম্বুজ-আকার, সুডৌল, সুগোল। কোথাও যেন নিঃসঙ্গ একক শিখর,—সগৌরবে মাথা তুলে। এই পার্বত্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। কখনো মনে হয়, সমীপবর্তী পাহাড়গুলির সঙ্গে একাঙ্গ, চারিদিকে কৈলাসপতিরই বিভিন্ন অঙ্গের বিস্তার। এক স্থান থেকে দেখে বিস্ময় জাগে, শিবলিঙ্গের অঙ্গলিপ্ত দীর্ঘ প্রসারিত গৌরীপট্টটি পর্যন্ত প্রকট করতে বিশ্বস্রষ্টা ভোলেন নি। শিখরের পাদদেশে প্রকাণ্ড দুটা পাথর দেখে মনে হয়, মহাদেবের বিশালদেহী প্রধান অনুচর, নন্দীভৃঙ্গী,—পা গুটিয়ে বসে। কোনটা পাথর দেখতে যেন পশুপক্ষীর সারি,—একটা হাঁস যেন মাথা তুলে দেখে। ভক্ত হনুমানজীও যুক্তকরে বসে।

এই অপরূপ রাজ্যে মন আপনা থেকে হারিয়ে যায়। আপন-হারা নদীর স্রোতের মত সময় বয়ে চলে। আনন্দ তরঙ্গে আমরাও যেন ভেসে চলি।

পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতে দেখি, অপর দিক থেকে ক'জন তিব্বতী আসে।

স্বামিজী বলেন, ওরাও যাত্রী। পরিক্রমা করছে। ওদের সম্প্রদায়ের নিয়ম, উল্টা দিক থেকে পরিক্রম করা। তাই করে চলেছে। দেখুন, দেখুন,—সামনে ঐ চলেছে দুজন সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হয়ে। ওরা দণ্ডী কেটে পরিক্রমা করছে।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি। যেন লজ্জাবোধেই। সুমুখে পথে দুজন তিব্বতী চলেছে ঐভাবে। ভেড়ার লোমের শতচ্ছিন্ন মলিন জোব্বা গায়ে। কোমরে বেল্টের মত বাঁধা। পায়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঁচু তিব্বতী পশমী জুতা। দুই হাতের কনুই, পায়ের হাঁটু ও বুকের কাছে চামড়ার মতন কিসের পটি বাঁধা। দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে, কৈলাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে কপালে হাত তুলে প্রণাম করে। লম্বা হয়ে পথের উপর—পাথর, বরফ যাই থাকুক না কেন—তারই উপর স্বচ্ছন্দে সটাং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। হাত দুটা লম্বা করে যত দুর পৌঁছয় সেখানে আঙুল দিয়ে রেখা টানে। তারপর, উঠে দাঁড়ায়। সেই রেখা পর্যন্ত পা বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। আবার হাত তুলে প্রণাম, আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।—এইভাবেই ঘুরছে বত্রিশ মাইল। ঐ দুর্গম স্থানে, ঐ উচ্চতায়! দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। ভাবি, ভক্তির প্রভাবে মানুষ পারে না কী!

কিচ্ বলে, এদের এইভাবে একবার পরিক্রমা করতে প্রায় পনেরো দিন লাগে।

তারাও মুখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে ক্ষণিক তাকায়। হয়ত ভাবে, ঘোড়া নিয়ে পরিক্রমা,—এ আবার কি?

বিকালবেলা। স্বামিজী বলেন, এবার এই বাঁ পাশের বড় নদী পার হয়ে অপর পারে যেতে হবে।

সুধীর বলে, সাঁতার কেটে নাকি? পুল তো কোথাও দেখি না। স্রোতের টান ত আছেই, বরফের চাঁইও ভেসে চলেছে, জলও গভীর মনে হয়।

কিচ্ হাসে। বলে, ভয় নেই। ঘোড়ায় বসে থাকুন। ঠিক পার করিয়ে নিয়ে যাবে। মাঝখানে একটু বেশি জল হবে, জুতা ভিজতে পারে,—পা দুটো সেখানে গুটিয়ে নেবেন।

কিচ্, রুকুম, সহিসরাও ঘোড়ায় চেপেছে,—সেই মালবাহক ঘোড়া যেগুলি শূন্যপিঠে এসেছে, সেগুলি তাদেরই এখন বাহন হয়েছে।

আশ্চর্য ঘোড়ার বুদ্ধি। আপনা থেকেই পাড় থেকে জলে নামে। যেন জলের ভিতরও চেনা পথ। ঘুরে ঘুরে যেখানে ওরই মধ্যে গভীরতা কম, ঠিক সেই জায়গা দিয়ে এঁকেবেঁকে পার করাতে নিয়ে চলে। স্রোতের টান যেখানে বেশী, সেখানে কেমন তেরচা ভাবে দেহ বেঁকিয়ে এগিয়ে যায়। এক জায়গায় প্রায় তার পেট পর্যন্ত জল ওঠে। ঠেলে নৌকা নিয়ে যাবার মত দেহটা বেগে ধাক্কা দিয়ে মাথা দুলিয়ে সেখানটা পার করে। কোন রকমে জুতা না ভেজে বৃথা তার চেষ্টা করি।—দেখতে দেখতে নদীর অপর পারে পৌঁছে যাই। সেদিকেও নদীর তীর ধরে চলা।

কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ডিরিফুক্ গোম্ফা। ১৬,২০০ ফুট উঁচুতে। আলমোরা থেকে প্রায় আড়াইশ' মাইল দূর। পরিক্রমার পথে এইটি দ্বিতীয় গোম্ফা। আজ এইখানে বিশ্রাম ও রাত্রিবাস।

পাথর গেঁথে দোতলা মঠ। একজন লামা সাদরে অভ্যর্থনা জানান। "কৈলাস বিভূতি" দিয়ে আশীর্বাদ করেন। খড়িমাটির মত সাদা নরম পাথর। ভস্মের মত কপালে প্রলেপ লাগানো যায়। নাম শুনি, কু-শ। কৈলাসের গায়ের পাথর। কৈলাসের প্রসাদ রূপে সঙ্গে রাখি। লামা যে ভাবে স্বামিজীর সঙ্গে কথা বলেন, পূর্ব পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। মঠের মন্দির-কক্ষে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি, চিত্র ইত্যাদি। যেমন অন্যান্য মঠেও দেখা যায়। দোতলার ঘরে থাকবার আয়োজন হয়। আমাদের দল ছাড়া অপর আর একজন মাত্র যাত্রী রয়েছেন। তিব্বতীয়। তিনি শুনলাম একসঙ্গে তেরো বার পরিক্রমা করবেন।

সুধীর আশ্চর্য হয়ে বলে, তেরো বার।

অনুভবানন্দজি হাসেন। বলেন, তেরো বার কেন? ১০৮ বার পরিক্রমারও রীতি আছে। তাতে নির্বাণলাভ হয়।

গোম্ফার ঘরের ভিতর অন্ধকার। প্রদীপ জ্বলে। সুগন্ধি ধূপের সুবাসও পাই। স্বামিজী বলেন, কৈলাসের গায়ে পাথরের খাঁজে এক ধরণের লতাগাছ জন্মায়, তাই সংগ্রহ করে শুকিয়ে জ্বালানো হয়। 'কৈলাস ধূপ' বলে। ধূপেরই মতন স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধ।

ঘরের দেওয়ালের গায়ে ছোট জানলা। তারই মধ্যে দিয়ে দিনের অল্প

আলো আসে। কিন্তু সেই জানলার সামনে দাঁড়ালে কৈলাসের মহামহিম অপূর্ব রূপের দর্শন হয়। অবাক হয়ে দেখি। স্বামিজী বলেন, চলুন ওপরে মঠের ছাতে। সেখান থেকে অবাধ মুক্ত দর্শন পাবেন। কৈলাসের অমন দর্শন অন্য কোথাও পাবেন না।

ছাতে উঠে তাই দেখি।

পরিক্রমা-পথে ডিরিফুক্ গোম্ফা থেকেই কৈলাস শিখরের সর্বোত্তম দৃশ্য।

এখান থেকে মাত্র মাইল দুই-এর ব্যবধান। তিব্বতের ধূলিবিহীন আব্-হাওয়ায় এই বিশাল শিখর দেখায় যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায়। সুনীল নির্মল আকাশের পটে শৈলশ্রেণীর বেদির উপর অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গাকৃতি শিখর (২২,০২৮ ফুট্)। মাথায় চিরতুষারময় মুকুট। বরফের তলায় পাথরের দেহ। দেখে মনে হয় গ্রানাইট। সে পাথরের এখানে সাধারণ বর্ণ নয়। গাঢ় পিঙ্গল উজ্জ্বল রঙ। শিখরের অঙ্গ ঘিরে স্তরে স্তরে চক্রাকারে টানা রেখা। শিবভক্ত রাবণের সেই কৈলাসশিখর উৎপাটনের ব্যর্থ চেষ্টার স্মৃতি-চিহ্ন।

শিখর ঘিরে রাক্ষসরাজ শক্ত বাঁধন বাঁধেন, ভক্তের সেই বাঁধনের লাঞ্ছনা দেবতা অঙ্গে ধারণ করে রাখেন,—তাই শিখর ঘিরে ঐ দাগগুলি,—এই জনপ্রবাদ।

তিব্বতীদের মধ্যেও প্রচলিত এক উপকথা আছে,—এই কাহিনীর স্পষ্ট ছায়া অবলম্বনে। গোংবো ফেংগ নামে এক সিংহবিক্রম পুরুষ। তার চার মাথা, চার হাত। এক পা ভারতে ও অপর পা কৈলাসে ভর করে কৈলাস শিখর উৎখাত করে কাঁধে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিব্বতীয় এক সিদ্ধযোগী পুরুষের অভিশাপে তার দেহ পাথরে রূপান্তরিত হয়।

ডিরিফুক্ থেকে দেখা কৈলাসশিখরের দু পাশে প্রহরীর ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপর দুই ক্ষুদ্র পাদশৈল। তিব্বতীরা বলে, মাঝখানে ঐ কাঙ্ রিন্‌পোচে (Kang Rinpoche)—কৈলাস,—তাঁর একদিকে বজ্রপাণি, অপর পাশে অবলোকিতেশ্বর। সেই দুই পাহাড়ের মাঝখানে কৈলাসের পাদমূল-বিধৌত শুভ্রবরণা তুষারবসনা তন্বী গিরিনির্ঝরিণী। দেবতার অঙ্গধৌত চরণামৃত যেন ধরাধামে বয়ে আনেন। তিব্বতীয় ধর্মমতে কৈলাসের অধিষ্ঠাতা দেবতা,—ডেম্‌ছোক বা ধর্মপাল। তাঁর পরনে বাঘছাল, গলায় ঝোলে নর-মুণ্ডমালা, এক হাতে ডমরু, অপর হাতে ত্রিশূল। কোন কোন চিত্রে তাঁর

অনেকগুলি হাত ও মাথা দেখানো হয়। পরিপূর্ণ আনন্দের প্রতিমূর্তি তিনি। আমাদের শিবই তিব্বতীদের কাছে ডেম্ছোক্ নামপান, মনে হয়। ধর্মপূজা —শিবপূজারই এক ভিন্ন রূপ।

চাঁদ ওঠে রাত হলে। আবার উঠে যাই ছাতে। জ্যোৎস্নাস্নাত দেবাদিদেবের জ্যোতির্ময় রূপদর্শনে। দেখি, চন্দ্রমৌলি কৈলাসপতি। শুভ্র তুষারশিরের স্ফটিকদীপ্তি। মহাকবি মেঘদূতে এরই বর্ণনা দেন,

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ॥

"আরও ঊর্ধ্বে গিয়ে কৈলাসের অতিথি হয়ো—যার সানুদেশের সংহতি রাবণের হস্তাকর্ষণে বিশ্লেষিত হয়েছিল এবং যে শিখর স্বর্গাঙ্গনাদের দর্পণস্বরূপ।"

প্রকৃতই দেখি, চাঁদের কিরণ প্রতিফলিত হয় স্বচ্ছ তুষারমুকুরে।

ভাবি, চন্দ্রদেব যেন আরতি করেন ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত শিবসুন্দরের। আকাশের তারায় তারায়, পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়, ধরিত্রীর সারা অঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই চিরসুন্দরের অনন্তপ্রকাশ। মনে গুঞ্জরিত হয় Robert Browning-এর :

"I but open my eyes,— and perfection,
no more and no less.
In the kind I imagined, full-fronts me,
and God is seen God
In the star, in the stone, in the flesh,
in the soul and the clod.
And thus looking within and around me,
I ever renew
With that stoop of the soul, which in bending
upraises it too
The submission of Man's nothing-perfect
to God's All-Complete,
As by each new obeisance in spirit,
I climb to His feet !"

॥ ১০ ॥

রাত্রি প্রভাত হয়। কি যেন পরম প্রাপ্তির অপার্থিব আনন্দে মন পরিপূর্ণ। দিবালোকে রৌপ্যকান্তি কৈলাসের তুষারমূর্তি। আজ দেখেই, কেন জানি না, অন্তরে অনুভব করি,—যেন আরও কতো নিকটে, কতো একান্ত আপনার।

একটু বেলা হতেই আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুতি। স্বর্গভূমি ডিরিফুক্ থেকে বিদায়ের পালা। ছেড়ে যেতে মন যেন চায় না, তখনি ভাবি, বিচ্ছেদ? কোথায়? দূরে চলে যাওয়া,—সে তো আরো কাছে পাওয়া।

স্বামিজী বলেন, বোঝা যাবে আজ সকলের সামর্থ্য। কৈলাসের ঐ ডান দিক ঘুরে কাল এখানে এসেছি, আজ যাওয়া শিখরের বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে। তারই মাঝপথে সেই ডোল্‌মা পাশ,—১৮,৭০০ ফুট—আর তার নিচে গৌরীকুণ্ড। সুধীরবাবু! তৈরি তো?—জয় শিবশম্ভো!

সুধীর বলে, নিশ্চয়। ব্রহ্মচারীজিকেও আজ যেন বেশ হাসিখুশী দেখাচ্ছে।

ব্রহ্মচারীজি মৃদু হেসে বলেন, শরীরটার জন্যেই যা' ভাবনা। তবে কাল রাতে তিব্বতে আসার পর এই প্রথম একটু ঘুমুতে পেরেছি। ভাবতেই পারি নি,—ষোল হাজার ফুটেরও ওপর এমন প্রচণ্ড শীতেও শান্তিতে রাত কাটবে। শরীর বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে। আমি ধীরে এগোলাম,—আসুন আপনারা।

যাত্রা সুরু হয়। গোম্ফা ছেড়ে নিচে আবার নদীর ধারে নামা। জল পার হয়ে অপর পারে আসা। পাহাড়ের গা বেয়ে এইবার পথ উঠতে থাকে। মাঝে মাঝে ডানদিকের পাহাড়ের ফাঁকে দেখা যায়,—কৈলাস শিখর।

চকিতে দেখা দিয়ে যেন উৎসাহ জাগান।

প্রচণ্ড শীত বোধ হয় ঘোড়ার উপর বসে থাকতে। নেমে হেঁটে চলি। শরীর গরম বোধ হয়, কিন্তু অল্প যেতেই হাঁফ লাগে। স্বামিজী সাবধান করেন, সামনে আরও বড় চড়াই। উঠে বসুন ঘোড়ায়।

চারিপাশে পাহাড়ের কঠিন, কঠোর রূপ। কেবলি নির্মম, নীরস, রুক্ষ পাথর। কোথাও স্নিগ্ধতার বা কোমলতার ক্ষীণ আভাসটুকুও নেই।

শ্মশানবাসী শিবের এ যেন প্রকৃতই লীলাক্ষেত্র। চারিদিক যেন ভস্মাবৃত। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বরফ। সেও যেন, শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত শবদেহ; মৃত্যুর শীতলতার শিহরণ জাগায়। এক জায়গায় পথের পাশে ভাঙা দেওয়াল; মনে হয়, ভেঙে পড়া একটা পাথরের ঘর। কিচ্ বলে, এ পথে হঠাৎ দুর্যোগ ঘটলে বা বিপদে পড়লে যাত্রীদের এইখানে আশ্রয় নিতে হয়।

ভাবি, এখানে তো একমাত্র সহায় ও ভরসাস্থল,—কৈলাসপতির চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এখানে অঘটন ঘটলে তিনি ছাড়া রক্ষা করেন সাধ্য কার।

অনেকখানি খাড়া চড়াই। যেন এ চড়াই-এর আদি অন্ত নেই। সেই কোন সকালে যাত্রা সুরু। চলেই চলেছি,—কেবলি ওঠা। বেচারী ঘোড়া দেহ টেনে টেনে উঠে চলে। এক একটা ঝাঁকানি দিয়ে। তার নাক মুখ থেকে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মত বাষ্পের ঝলক বার হয়; দেখে ব্যথা জাগে মনে। ভাবি, জীবনে আর কখনো ঘোড়ায় চেপে তীর্থ করা নয়। জীবকে কষ্ট দিয়ে স্বার্থ সুখের তৃপ্তি থাকে না।

পথের দুর্গমতা বাড়ে। কেবলি চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলাকীর্ণ পথ। যেন ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়ের বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপ। এই কি শিবের প্রলয় নৃত্যের রঙ্গভূমি! বরফও দেখা দেয় পথের উপর। বাহন কিন্তু নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে উঠে চলে,—বরফের উপর দিয়ে, শিলাস্তূপের পাশ কাটিয়ে।

অনুভবানন্দজি উচ্চকণ্ঠে শিবস্তোত্র স্তব করেন। হঠাৎ থেমে বলে ওঠেন, জয় শিবশম্ভো! ঐ এসে গেলাম—ডোলমা পাশ্। ডিরিফুক্ থেকে মাত্র মাইল চারেক—কিন্তু মনে হয় কেমন? যেন, পঁচিশ মাইল! এবার নামুন সকলে ঘোড়া থেকে,—ওদিকে নিচে ঐ গৌরীকুণ্ড দেখতে যাবেন। আপনাদের ভাগ্য ভাল। এ বছর ডোলমা পাশ্-এ বরফ নেই তেমন বেশি। আকাশও পরিষ্কার—দুর্যোগেরও কোন আশঙ্কা নেই।

ব্রহ্মচারীজি ঘোড়া থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ান। উৎসাহ-ভরা মুখে চারিদিকে তাকান। বলেন, এ যে দেখি কৈলাসের কাঁধের ওপর এসে গেছি—১৮,৬০০ ফুট উঁচু? বলেন কি! কই! সে রকম নিঃশ্বাসের কষ্ট বোধও নেই!—মাথা তুলে শিখরের দিকে তাকিয়ে বলেন, এখান থেকে ঐ চূড়া আরও ৩,৭২৮ ফুট উঁচু? কৈলাস গিরিশৃঙ্গ তো ২২,০২৮ ফুট? সাদা মাথা তুলে কী নির্বিকার ভাবে বসে।

ডোলমা পাশ্।

তিব্বতের পথে গিরিবর্ত্মগুলির মাথায় যেমন সর্বত্র স্তরে স্তরে পাথর সাজিয়ে cairn বা লাপ্‌টৎচে তৈরি করা—নানা রঙের ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা দিয়ে পাতাকা ঝোলানো,—এখানেও সেই রকম। কিন্তু, বৈচিত্র্যের মধ্যে—বিশাল এক শিলাখণ্ড এবং সেই পাথরের সর্বাঙ্গে মানুষের মাথার চুলের গোছা, রাশি রাশি ভাঙা দাঁত,—মালার মত গেঁথে টাঙানো। কালো কুচকুচে পাথর—গায়ে তার থকথকে সাদা মাখনের প্রলেপ। সব মিলে শিলাখণ্ডটির এক বীভৎস রূপ। যেন, পাষাণময়ী মুণ্ডমালিনী ভয়ঙ্করী করালী। তিব্বতী-তীর্থযাত্রীদের প্রথা—মুণ্ডন করে এখানে চুল রেখে যাওয়া, পড়া-দাঁত ঝুলিয়ে রাখা। ইনি এই গিরিবর্ত্মের অধিষ্ঠাত্রী—ডোলমা দেবী। ভাবি, হিন্দুমতে হয়ত নাম হোত—শিবের দ্বারী ভৈরব। যেমন হিমালয়ে শৈব তীর্থক্ষেত্রের প্রবেশ পথে দেখা যায়।

পাশ থেকে প্রায় চারশ ফুট্ নিচে গৌরীকুণ্ড। ১৮,২০০ ফুট্-এ। চির-তুষারাচ্ছন্ন হ্রদ। ডিম্বাকৃতি। লম্বা পৌনে এক মাইল, চওড়া আধ মাইল। গভীরতা ৮৪ ফুট্ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তিব্বতীরা এ-হ্রদের নাম দেয়—থুজি জিমবো। কৈলাসের মূল শিখরের পূর্বাংশে অঙ্গলিপ্ত। যেন মহাদেবের ক্রোড়াসীনা দেবী গৌরী।

শিখরের কাঁধ থেকে ঝুলে থাকে তুষার স্তূপ—hanging glacier। শিবের গৌরবরণ বাহু যেন প্রসারিত হয়ে উজ্জ্বলবরণী শিব-সীমন্তিনীর অঙ্গ স্পর্শ করে।

নেমে চলি হ্রদের তীরে। প্রায় দু'তিন ফার্লঙ্ খাড়া নামা। পাথর থেকে পাথরে পা রেখে। রুকুমের কাছ থেকে আমার হাতের লাঠি চেয়ে নিই। সাবধানে পা ফেলে নামি।

তুষার আবরণে আচ্ছাদিত হ্রদের জল। তটের নিকটে স্বচ্ছ বরফের পাতলা প্রলেপ—যেন নীল কাঁচের মত। ভিতরে জল দেখা যায়। হাত কয়েক দূরে হ্রদের জল জমাট বরফ—সাদা ধবধবে।

তীরের কাছের বরফ একটু ভেঙে জলস্পর্শ করে সকলে মাথায় ছিটাই। হ্রদের ধারে বসি। প্রকৃতির রূপমাধুর্যে তন্ময় হই।

অনুভবানন্দজির ডাকে ফিরে তাকাই। ইসারা করে লাঠিটা চান। কিচ্ এসে নিয়ে যায়, তাঁর হাতে দেয়। দেখতে থাকি, লাঠির প্রয়োজন হোল কেন?

অবাক কাণ্ড! স্বামিজী গায়ের জামা ইত্যাদি খোলেন। খালি গায়ে সেই তুষাররাজ্যের দুর্জয় শীতে লাঠি হাতে নেমে যান জলের কিনারায়। লাঠির লোহা-বাঁধানো ফলকের খোঁচায় বরফের আবরণ ভাঙেন—ঝপ করে জলের মধ্যে নেমে পড়েন। ডুব দেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠেন। কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে জল থেকে উঠে আসেন। ওদিকে গৌরী দেবী যেন কোলের ছেলের খেলা দেখে মৃদু হাসেন। আলোড়িত নীল জলে ক্ষণিক তরঙ্গের রেখা পড়ে। আবার নিমেষে জল শান্ত হয়—চোখের পলকে তুষারের প্রলেপ জলের উপর দেখা দেয়—স্তূপের উপর যেন সর পড়া সুরু হয়।

স্বামিজীর প্রফুল্ল বদনে পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা। শীতভয় যেন লজ্জা পেয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে।

কৈলাস-পরিক্রমার কঠিনতম অংশ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করা গেল। অনুভবানন্দজি হাসিমুখে জানান, এইবার বলি, পথের এই অংশটুকুর জন্যে কী দুর্ভাবনাই না ছিল! ১৮,৬০০ ফুট বরফের ওপর দিয়ে পার হওয়া—এ সব স্থান কখন কী মূর্তি ধরেন, কেউ বলতে পারে না। এবার আর কি! দেখতে দেখতে বাকি পথ শেষ করা যাবে,—কি বলেন, সুধীরবাবু? বাহাদুরি আপনার। হিমালয়-যাত্রায় প্রথম বেরিয়েই একেবারে কৈলাস-মানস সরোবর। জয় শিবশম্ভো। স্মরণ করুন কৈলাসপতিকে তাঁর চরণতলে বসে, মনপ্রাণ ভরে।

সমবেত কণ্ঠে শিবধ্বনি ওঠে। নিস্তব্ধ পর্বতে প্রতিধ্বনি জাগে—ব্যোম ব্যোম ব্যোম। শিব শিব শিব!

জড় জগতের উত্থিত সেই ধ্বনি তীর্থযাত্রীর অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে আনন্দময় অনুরণন তোলে।

কৈলাস-শিখরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে যাত্রা সুরু করে, পশ্চিমাংশ ঘুরে কাল রাত কাটে উত্তরপ্রান্তে। আজ এখন চলি পূর্ব অঙ্গ বেয়ে। আজই পরিক্রমা সাঙ্গ হবে আবার সেই দক্ষিণে।

এখন আর চড়াই নয়, খাড়া উৎরাই। শুধু পাথরের রাজ্য। পথের উপর ও চারিপাশে রাশি রাশি ভাঙাচোরা শিলাখণ্ড। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যায় ধাপে ধাপে ভেঙে-পড়া পাথর-গাঁথা-সিঁড়ির মত। সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে দিয়ে কোনক্রমে নামা। ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে হয়। আধ মাইলটাক গিয়ে পথের নিকটে কয়েকটি গুহা। প্রকাণ্ড একটা পাথরের গায়ে আঁকা-

বাঁকা রেখা। কিচ্ ভক্তিভরে প্রণাম করে, জানায়, প্রাচীন এক লামার পবিত্র চরণচিহ্ন।

আরও কিছুদূর নেমে এক পার্বত্য নদীর নিকটে পৌঁছাই। সেই নদীর পাশ দিয়ে এবার পথ। নদী নিম্নগতিতে নেমে চলে, পথও নামে। নিঃসঙ্গ দুর্গম যাত্রাপথে যেন সহযাত্রী পায়। ছোট ছোট নদী ও ঝরণাধারা কৈলাস শিখরদেশ থেকে নেমে আসে—আমাদের সাথী নদীর জলে মেশে, কোথাও পুল নেই। আবার ঘোড়ায় চেপে বসতে হয়। ছপছপ করে পা ফেলে ঘোড়াগুলি একের পর এক ধারা পার করিয়ে আনে।

মাইল চারেক এইভাবে এগিয়ে জুন্‌থুল্‌ফুক্ গোম্ফা। পরিক্রমার পথের তৃতীয় মঠ। আশপাশে মণিপ্রাচীর। স্বামিজী বলেন, ঐ গোম্ফায় গেলে দেখতে পাবেন—চারকোণা এক লম্বা পাথর আছে। তিব্বতের মহাযোগী মিলারেপার -নামের সঙ্গে সেটি জড়িত।

কিন্তু গোম্ফা দেখার এখন আর আগ্রহ নেই। গোম্ফার নিচে পথের ধারে পাথরে বসে দুপুরের আহার-পর্ব সাঙ্গ করা হয়। বিশ্রামলাভও হয়। বরখার তাঁবুতে ফিরে যেতে মন এখন উদ্‌গ্রীব। কৈলাসশিখরও সমীপস্থ পাহাড়ের অন্তরালে আপাততঃ অদৃশ্য হন।

আবার নদী ধরে চলা। ক্রমাগতই নামতে থাকা। পথের উপর মাঝে মাঝে ঝরণাধারা। শিবের জটা বেয়ে যেন গঙ্গারই অজস্র ধারা নামে।

এক জায়গায় কিচ্ জানায়, ডাইনে এখান থেকে মাইল ছয়েক গেলে কৈলাসের দক্ষিণে চার নম্বর গুহা—গেংটা গোম্ফা পাওয়া যায়। সেদিক থেকে আরও দু' মাইল এগিয়ে সেই কালকে দূর থেকে দেখা পাঁচ নম্বর গোম্ফা—সিলুঙ্। আমরা এখন নেমে চলেছি সোজাসুজি বরখার ময়দানে—আমাদের তাঁবুতে।

কথা শুনে ক্লান্ত দেহ আশ্বস্ত বোধ করে, কিন্তু কোথায় সেই বরখার মাঠ?

আরও তিন মাইল গিয়েও পথ যেন শেষ হতেই চায় না। কৈলাসের গিরিজটাজাল ধরে বেঁধে রাখে। অবশেষে মুক্তির আলো হঠাৎ দেখা দেয়। পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি, পর্বত অবরোধ ভেদ করে পথের সাথী সেই নদী সম্মুখে প্রসারিত সমতলভূমির দিকে ছুটে চলে। যেন অঙ্গুলি সংকেতে দেখায়, ঐ তো ওখানে বরখার ময়দান!

তাকিয়ে দেখি, আরও দূরে রাক্ষসতালের জলরাশির সুস্নিগ্ধ নীলপ্রভা

বিকালের রোদ ঝিকমিক করে। দূরদিগন্তে গগনস্পর্শী মান্ধাতা পর্বতচূড়ার অমল ধবল তুষারের রৌপ্যদীপ্তি। কিন্তু এখন ঐ নৈসর্গিক শোভা মনে ধরে না, আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বরখার মাঠে রেখে-আসা তাঁবুগুলির ক্ষুদ্র-বিন্দু-আকার—দুরূহ যাত্রা-শেষের আশ্রয়স্থল। এখন দেখি, পাহাড়ের দুর্গম চড়াই-উৎরাই-পথের যেমন রোমাঞ্চময় বিচিত্র আকর্ষণ, ধরিত্রীর সুবিশাল সমতল ভূমিরও তেমনি যেন করুণাময়ী জননীর মত বাহু মেলে সস্নেহ আহ্বান।

ডানদিকে কিছুদূরে দারচেনও দেখা যায়। সেদিকে আর না গিয়ে সবেগে সোজা চলি—তাঁবু লক্ষ্য করে।

কৈলাস পরিক্রমান্তে পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয় অকস্মাৎ এক করুণ দৃশ্য দেখে আঘাত পায়।

বরখার সেই নদীর ধারাগুলির ও জলাভূমির নিকটে পৌঁছাই। অগভীর জল-প্রবাহগুলি ঘোড়ায় চেপে পার হতে গিয়ে দেখি, জলের ধারে অজস্র মরা মাছ। সন্দেহ হয়, কোন মড়কের প্রকোপে এতগুলি জীবের একই সঙ্গে প্রাণহানি ঘটে থাকবে। মৃত্যুর এই করাল ছায়া মনের প্রসন্নতা হরণ করে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে আসি। তাঁবুতেও এসে বিশ্রাম নিই। কিন্তু চোখে ভাসতে থাকে সেই মরা মাছগুলির নিস্পন্দ চিকণ দেহগুলি। কৈলাসপতিকে একমনে স্মরণ করি। ভাবি, আশ্চর্য তাঁর লীলা, জীবন-মৃত্যু একই হারে গেঁথে এ কী অপরূপ তাঁর খেলা!

হঠাৎ মনে পড়ে যায় কয় বছর আগেকার এক ঘটনা।

এক বন্ধুর সঙ্গে সেবার বেড়াতে যাই সুন্দরবনের জঙ্গলে। সেখানে তাদের জমিদারী। গাঙে গাঙে লঞ্চে করে ঘুরে বেড়াই। কখনো বা লঞ্চ ছেড়ে বজরায় চেপে নিঃশব্দে নদীবক্ষে ভেসে চলা। বন্ধুর হাতে বন্দুক। শিকারের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকায়। সুন্দরবনের বাঘ নয়, জলের কুমীরও নয়, জলচর নানারকম পাখি। হেসে বলে, ও সব ত খেলি না, যা চমৎকার খেতে। শিকারেও কী আনন্দ!

এক ঝাঁক Sea-gull কাঁ কাঁ শব্দ তুলে উপর দিয়ে উড়ে আসে। বন্ধু বলে, উড়ো পাখি মারতে পারিস্? চেষ্টা কর দিকি।

সাময়িক উৎসাহবশে হাতে বন্দুক ধরি। মাথা তুলে ঝাঁকের দিকে গুলি ছাড়ি। একটা পাখির গায়ে লাগে। আকাশ থেকে নিমেষে ছিটকে গাঙের জলে পড়ে। পদ্মের মত সাদা ডানাদুটি ছড়িয়ে স্রোতের টানে ভেসে

চলে। নদীর ঘোলাটে জলে রক্তের ঘোর লাল রঙ যেন আবীর গুলায়। আকাশপানে মাথা তুলে স্রোতের-বেগে-ভেসে-যাওয়া সেই আসন্ন-মৃত্যু-মুখী বিহঙ্গম মর্মভেদী কাতর রব তোলে। চকিতে সেই উড়ে যাওয়া ঝাঁক থেকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তার সাথী নেমে আসে জলের নিকটে ;—সেই ভেসে-যাওয়া দেহ ঘিরে স্রোতের অল্প উপরে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ;—সকরুণ তীক্ষ্ণ স্বরে দিগ্‌দিগন্ত বিদীর্ণ করে। চোখে আমার জল নামে। আর মুহূর্তের চিন্তা নয়। বন্দুকের অবশিষ্ট গুলির আঘাতে সাথী পাখিটির প্রাণনাশ করি। নিজেকে ধিক্কার দিই।

সেই আমার শেষ বন্দুক ছুঁড়ে প্রাণী হত্যা।

আজ সেই পাখি দুটির কথা স্মরণে আসে। কৈলাসপতির চরণে বহুদিন সঞ্চিত এক মর্মবেদনার আহুতি দিই।

তাঁবুর মধ্যে বাতাসে উড়ে আসে সিগারের উগ্র গন্ধ। ব্রহ্মচারীজির পৌঁছানোর অলক্ষ্য বার্তাবহ। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে তাঁর গলাও শুনি। পুলকিত, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ ;—"সুধীরবাবু কই? উমাপ্রসাদবাবু, বেরিয়ে আসুন একবার। এসে দেখুন,—সঙ্গে কি নিয়ে এলাম।"

বলি, আপনি ফিরলেন সুস্থ দেহ নিয়ে, সফল কৈলাস পরিক্রমা করে,—এর চেয়ে আর ভাল কী আনবার আছে?

বলতে বলতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি। ঘোড়া ছেড়ে ব্রহ্মচারীজি তখন নেমে দাঁড়িয়ে। উল্লসিত বদনে আঙুল দিয়ে দেখান—পিছনে ভানুসিং-এর দিকে। বলেন, ঐ দেখুন। ভানুসিং-এর হাতে ওগুলো কী? সুধীরবাবু, দেখছেন?

দেখে বিস্মিত হই ;—ভানুসিং-এর দুহাতে ঝোলে পাঁচ-ছটা মাছ।

ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়ে বলি, করেছেন কি আপনি? নদীর ধারে ঐ স্তূপাকার মরা মাছ। তার মধ্যে থেকে তুলে আনলেন?

ব্রহ্মচারীজি মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদ জানান, ক্ষেপেছেন আপনি? ঐ মরা মাছ ছোঁব আমি? সে-পাত্রই নই। নদীর জলেও দেখেন নি প্রচুর জ্যান্ত মাছ? ঘোড়া দাঁড় করিয়ে জলের মধ্যে থেকে ধরালাম,—এখনও দু'একটা নড়ছে ওর হাতে, দেখুন না।

তারপর ভানুসিংকে বলেন, যাও, জল্‌দি সব ব্যবস্থা কর,—আজ আমিই রাঁধব। সুধীরবাবু, আপনার জন্যেই, ভাই, আমার কৈলাস-পরিক্রমা, আজ

ভাল করে রেঁধে খাওয়াব,--আনন্দ ভোজ হবে।

নির্বাক হয়ে দেখতে থাকি। ভাবি, কৈলাস-পরিক্রমার এ কী বিচিত্র পরিণতি। আশ্চর্য মানুষের মন। শিবক্ষেত্রে মহামায়ার এও কি এক লীলা।

॥ ১১ ॥

কৈলাস-পরিক্রমা নির্বিঘ্নে সাঙ্গ ও মানস সরোবর দর্শন হয়েছে। যাত্রার সফলতায় হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। এইবার ফেরবার পালা।

প্রত্যাবর্তনও যাত্রার অঙ্গ। এ-জগতে যার সুরু আছে, তার শেষও আছে। যাঁর আদি নেই, তাঁর অন্তও নেই। তিনিই সৎ-চিদ্-আনন্দ। ঐ কৈলাস বুঝি তাঁরই প্রতীক। সেই আনন্দময়ের আভাস মাত্র আহরণ করে এবার ঘরে ফেরা।

অসীম আগ্রহ ও গভীর কৌতূহল আসবার পথে মনকে টেনে আনে। আর এখন? নিত্যনূতন পথের সেই রোমাঞ্চময় আকর্ষণ নেই। বাতাসে-ওড়ানো ঘুড়ি এখন কেটে গিয়ে নীলগগনে দূরে থেকে সুদূরে কোথায় ভেসে অদৃশ্য হতে থাকে, লাটাই-এ শুধু কাটা-ঘুড়ির সুতো গুটাই।

বরখার মাঠ ছেড়ে এখন সোজাসুজি তাকলাকোটের পথ ধরা। বার বার পিছন ফিরে শ্রীকৈলাসকে তাকিয়ে দেখা, মনে মনে প্রণাম করা। জীবনে আর কি কখনো এই শান্ত সুন্দর জ্যোতির্ময় মূর্তির এমনভাবে দর্শন পাব?

মানস সরোবরের তীর থেকে বরখায় যে-পথ ধরে এসেছিলাম, এখন আর সে পথ দিয়ে যাওয়া নয়। মানস সরোবরও আর দর্শন হবে না। গঙ্গা ছু-র সেই ধারাও পার হই ভিন্ন স্থানে। রাক্ষসতালের পাড়ের পাহাড়ের গা বেয়ে সারাদিন এগিয়ে যাওয়া। সেই পাহাড়েরই একস্থানে রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেলা। এখানেও ডাকাতের ভয়।

পরের দিন ৪ঠা জুলাই—আরও এগিয়ে বলডাকে পৌঁছানো। এইখানে পাই আবার সেই পুরানো পথ। যাবার সময় এখানে রাত কাটাই নি, দুপুরে খানিক বিশ্রাম করা হয়েছিল। আজ এখানে রাত্রিবাস হয়।

পরদিন ৫ই জুলাই সকালে রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি চলেছে, জন-পাঁচেক তিব্বতী এসে হাজির। সাধারণ তিব্বতী বেশভূষা। সঙ্গে বোঁচকা-বুচকি। কুকুমসিং দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। সুধীর বলে, দেখ, এসে বলে কিনা

এরাও ডাকাতের দল।

না, তা বলে না। বরং সোৎসাহে এসে জানায়, এরা নাচের দল। বলব, নাচ দেখাতে?

তখনি সবাই জমায়েত হই। তিব্বতী নাচ। এমন সুযোগ কি ছাড়া চলে? ঝোলা খুলে দুজন পুরুষ তখনি মুখোশ বার করে। রাক্ষুসে মুখ। একটার আবার ঝোলা দাড়ি। দুজনে মুখে পড়ে। গায়ের জোব্বা এঁটে-সেঁটে শক্ত করে বেঁধে নেয়। অপর তিনজন—তার মধ্যে একটা বুড়ী—বাজনা বার করে মাটিতে বসে,—একজনের হাতে লম্বা শিঙার মত,—মুখে লাগিয়ে বাজায়। আর একজনের হাতে বড় খঞ্জনী। তৃতীয়জন সামনে মাটিতে গুঁজে বসায় ডমরু-মত একটা বাদ্য; তাতে ঘুঙুর বাঁধা। চামড়ার ছোট লাঠি মত দিয়ে তাই ঢঙঢঙ টিংটিং করে বাজতে থাকে। বাদক দুজন একসঙ্গে একঘেয়ে সুরে গান ধরে। নাচিয়ে দুজন নাচ সুরু করে। প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাতের চেটো ঘুরিয়ে মুদ্রার মতন বিভিন্ন ধরন দেখায়। তারপর ঘুরে ঘুরে নাচ। বাজনার তাল ও বোল ক্রমশঃ দ্রুত হতে থাকে। নাচেরও উদ্দামতা বাড়ে। শেষে শরীর পাক খাইয়ে একবার পায়ের উপর ভর দিয়ে, পলকে দেহ শূন্যে ঘুরিয়ে মাটির ওপর দু হাতে ভর রেখে বন্‌বন্ করে ঘুরে চলে,—গাড়ির চাকার মত।

নাচের মধ্যে কোন সৌন্দর্যবোধ বা ছন্দের প্রকাশ পেলাম না। শুধু অঙ্গভঙ্গি ও দেহের কসরৎ। গানের সুরও একঘেয়ে একটানা—যেন ভীমরুলের গুন্‌গুন্ গুঞ্জরণ।

তবুও মুভি ক্যামেরা'তে নাচের খানিক ছবি ধরে রাখা হয়।

আজ বিকেলে তাকলাকোট পৌঁছানো। সেই একই পথ দিয়ে চলা। মনে হয় যেন কতো কালের পরিচিত পথ। তবুও ঘটনার কিছু বৈচিত্র্য থাকে।

হঠাৎ দেখি, সুমুখে মালবাহী ঘোড়াগুলির নিকটে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। পথের উপর প্রেমুয়া ও আঙ্‌কেলের জাপটাজাপটি ধস্তাধস্তি চলে। ব্যাপার কী? প্রেমুয়ার মুখেচোখে প্রচণ্ড রাগের অভিব্যক্তি; আঙ্‌কেলের কিন্তু মুখটেপা ব্যঙ্গ-হাসি। আর সকলে দাঁড়িয়ে মজা দেখে; আনন্দ পায়। আঙ্‌কেল পারবে কেন জোয়ান ছোকরা প্রেমুয়ার সঙ্গে? প্রেমুয়া ঠেলে ফেলে দেয় তাকে ধুলার উপর। চিৎ হয়ে পা তুলে মাটিতে পড়ে বেচারী

আঙ্‌কেল। তবু সে হাসে। ও কী! প্রেমুয়া কোমরবন্ধে গুঁজে-রাখা ছুরি বার করে। আঙ্‌কেলের বুকে বসাতে উদ্যত হয়। এতক্ষণে কিচ্‌, রুকুম, রঞ্জন ছুটে যায়। প্রেমুয়াকে জাপটে ধরে। প্রেমুয়া ঝটকান দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার নিষ্ফল চেষ্টা করে। সেই অবসরে আঙ্‌কেলও উঠে দাঁড়ায়। গায়ের ধুলা ঝাড়ে। দাঁত বার করে তখনও হাসতে থাকে। ভয় নয়। রাগ নয়। বাঁচা-মরা যেন একটা খেলা। শুনি, সামান্য এক ব্যাপার নিয়ে এই বিবাদের সূত্রপাত। আঙ্‌কেল বিদ্রূপ করে প্রেমুয়াকে তার বাঁশি বাজানো নিয়ে কি বুঝি টিটকারি দেয়। তাতেই প্রেমুয়ার এই ক্ষেপে ওঠা। রুকুমকে স্বামিজী বলেন, প্রেমুয়ার রাগ না পড়া পর্যন্ত যেন তাকে চোখে চোখে রাখে। তারপর আমাদের বলেন, দেখলেন তো এদের ব্যাপার? এরা এমনিতে খুবই সরল। নিরীহ। কিন্তু কোন কারণে—তা সে যত তুচ্ছই হোক্ না কেন—একবার মাথায় খুন চাপলে তখন তার আর রক্ষে নেই। প্রাণ নেওয়া বা দেওয়া কোনই পরোয়া রাখে না। সুধীরবাবু, কৈলাস দর্শন করে ফিরে চলেছেন, শিবের নন্দীভৃঙ্গীদের কাণ্ডও দেখে যান্। জয় শিবশম্ভো।

সুরেন্দ্র মহারাজ বলেন, যাক একটা নাটক দেখলেন সবাই, এখন চলুন, এগুনো যাক। বেলাবেলি তাকলাকোটে পৌঁছুতে হবে।

বিকালেই পৌঁছে যাই। তাকলাকোটে প্রবেশের মুখে কৈলাস যাত্রী দুজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা। তাঁদের যাত্রার বিবরণ শুনে যেমন আশ্চর্য হলাম তেমনি আনন্দও পেলাম। কাশী থেকে সারাপথ পায়ে হেঁটে আসছেন; এইভাবেই কৈলাস মানস সরোবর ঘুরে আসবেন। তাঁদের অটল মনোবল ও দুর্জয় সাহসিকতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করি। ভাবি, এঁরাই প্রকৃত হিমালয় অভিযাত্রী।

তাঁরা জানান, গার্বিয়াঙ থেকে এক বাঙালী সাধুও তাঁদের সঙ্গ নিয়েছেন, ঐ যে পিছনে আসছেন।

সাধুটি কাছে এলে দেখি, ধারচুলার সেই গেরুয়াবেশধারী লোকটি। এঁদের কাছেও 'সাধু' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন; কি উদ্দেশ্যে সঙ্গও ধরেছেন কে জানে?

অনুভবানন্দজিকে দেখেই বেচারীর মুখ শুকায়। কোন কথা না বলে পাশ কাটাতে যান। কিন্তু অনুভবানন্দজি ছাড়বার পাত্র নন। জিজ্ঞাসা করেন, কী

সাধুজি। শরীর ভাল তো ?

শুধু 'হাঁ' বলেই তিনি এগিয়ে চলেন।

তরুণ যাত্রী দুটিকে তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় জানা ছিল জানিয়ে রাখা হয়।

তাকলাকোটে পৌঁছে আরও দুই দল বাঙালী যাত্রীদের তাঁবু পড়েছে দেখি। এক দল ভাটপাড়া থেকে আসছেন। অপর দল বেশ ভারী। তাঁদের সঙ্গে আছেন, ব্রহ্মচারী শ্রীসত্যেন্দ্র মহারাজজি,*—বাঙলাদেশের বাইরে তাঁর শুনি, বহু শিষ্য ও ভক্ত।

এই সুদূর প্রবাসে এতগুলি বঙ্গসন্তান একত্র হওয়ায় সন্ধ্যায় তাঁবুর মধ্যে গল্পগুজবের আনন্দমুখর মজলিস জমে।

এঁদের মধ্যে কয়েকজন আজ খোচরনাথ গিয়েছিলেন, আমরাও আগামীকাল যাব তাঁদের জানাই।

॥ ১২ ॥

সকাল আটটায় খোচরনাথ উদ্দেশ্যে যাত্রা। সন্ধ্যার মধ্যে আবার এখানে ফিরতে হবে। তাকলাকোট থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে খোচরনাথ। তিব্বতের এই অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির। পরিচিত পথ ছেড়ে আজ আবার নূতন পথে চলা ও নতুন কিছু দেখার কৌতূহলী আগ্রহ মনে সাড়া জাগায়। নবীন উৎসাহ নিয়ে পথে নামি।

তাকলাকোট থেকে নেমে কর্ণালী নদীর অপর পারে আসি। বাঁ দিকে পড়ে থাকে মানস সরোবরে যাবার পথ। এখন দেখে মনে হয় যেন কতো কালের অন্তরঙ্গ বন্ধু, হঠাৎ পথে দেখা হওয়া। আশ্চর্য হয়ে যেন প্রশ্ন করে, ও কী, ওদিকে চললে ?

আমরা পুল পার হয়ে ধরি ডানদিকের পথ। সেই দিকে খোচরনাথ। কর্ণালী নদী ধরে এগিয়ে যাওয়া।

কৈলাসের পথের তুলনায় এদিকে লোকালয় বেশী। এখানেও দু-একটা গ্রামের নিকটে পপ্‌লার গাছ দেখা যায়। কদিন ধরে অনবরত মরুপ্রায় ঊষর প্রান্তর দেখে চক্ষু যেন তৃষ্ণার্ত ছিল, এই সামান্য কয়টি গাছের স্নিগ্ধ শ্যামল

* এঁরই সঙ্গে কল্পেশ্বরে বহু বছর পরে সাক্ষাৎ হয়। 'পঞ্চকেদার'-গ্রন্থে তার বর্ণনা আছে।

কান্তি চক্ষের কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা মিটায়।

গ্রামের নিকট যব ও কড়াইসুটির ক্ষেত। বাড়ির বাইরে পাথরের প্রকাণ্ড উদূখলে মেয়েরা কি পিষছে। কোথাও বা মেয়েরা ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। পুরুষেরা মাঠে ভেড়া ছাগল নিয়ে চরাচ্ছে। মেষচালকদের হাতে গুল্‌তি-- sling। ছোট পাথর কুড়িয়ে গুলতি চালিয়ে আকাশে নিক্ষেপ করে, তীরের মত সোঁ সোঁ শব্দ তুলে বহুদূর পর্যন্ত পাথর উড়ে যায়। অব্যর্থ তাদের হাতের নিশানা, এইভাবে পাথর ছুঁড়ে দলছাড়া ভেড়া ছাগলকে কেমন অনায়াসে দলে ফিরিয়ে আনে। যেখানে যার গায়ে লাগবার ঠিক তারই গায়ে গিয়ে লাগে। চিলের ডাকের তীক্ষ্ণস্বরে মেষচালকরা এক ধরণের শিস্ দেয়,—ভেড়াগুলি সে স্বরের অর্থ বোঝে,—হুট্‌পাট্ করে ছুটে আসে, একত্র হয়, চরতে থাকে।

পথ প্রায় সমতলভূমির উপর দিয়ে যায়,—চড়াই উৎরাই নেই। চারিদিকে ধু ধু করে মাঠ। ক্বচিৎ কখন দু-একটা ছোট পাহাড় মাটির ঢিপির মত পথের কাছাকাছি মাথা তুলে দেখা দেয়।

তিব্বতে দিবাভাগের নিত্য সাথী সেই প্রখর সূর্যকিরণ ও ঝড়ের মতন প্রচণ্ড তুহিন-শীতল বাতাস এখানেও চলার পথে বাধা জাগায়। কিন্তু এতদিন তিব্বত বাসের পর এ-সব সহ্য করার অভ্যাস হয়েছে। তাই সোজা পথে ঘোড়া ছুটিয়ে সকলে সানন্দে এগিয়ে চলি।

ভক্তের কপালে বা দেহে যেমন চন্দনের তিলক ও প্রলেপ থাকে, এই প্রাচীন তীর্থপথও তেমনি পবিত্র ধর্মচিহ্ন ধারণ করে। পথের মাঝখানে—কখনো বা দুপাশে কেবলি মণি-প্রাচীর ও ছোটবড় নানা আকারের শিলা-স্তূপ বা চোর্‌টেন। প্রায় প্রত্যেক শিলাখণ্ডে কোথাও 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ', কোথাও বা কোন বোধিসত্ত্ব বা দেবীমূর্তি খোদিত করা। পাথরগুলির গায়ে নানাবর্ণের প্রলেপ দেওয়া, তারই মধ্যে গৈরিক রঙের প্রাধান্য।

পথে কয়েকটি নদী পার হতে হয়। জল তেমন গভীর নয়। ঘোড়ায় চড়ে সবাই পার হই। কর্ণালী নদীর বামতটে দূর থেকে খোচরনাথ দেখা দেয়। দেখে মনে হয় এ যেন কোন ভারতীয় প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। যাত্রীদল আসতে দেখে, ভারতের কোন কোন মন্দিরদ্বারে যেমন বাজনদাররা বাজনা বাজায়,—এখানেও তেমনি দামামা ও শিঙার বাদ্যধ্বনি ওঠে। গঙ্গাতীরের বারাণসী ও হরিদ্বারের কথা মনে পড়ে,—তাদেরই যেন অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

এখানেও নদীর ধারে বাঁধানো ঘাট। কিন্তু পাহাড়ী নদী, হেঁটেই পার হওয়া যায়। এই কর্ণালী আরও এগিয়ে গিয়ে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করে। পরে ভারতের সমতলে নামে, কালীনদীর সঙ্গে মিলিত হয়, নাম হয় ঘর্ঘরা বা গোগরা বা সরযূ। গঙ্গার সঙ্গে এই নদীর মিলন ঘটে বেহারে ছাপরার নিকটে। আমাদের দেশে তীর্থের ঘাটে যেমন ছোট ছোট মন্দির থাকে, এখানেও ঘাটের উপর তেমনি বৌদ্ধস্তূপের মত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার চোর্‌টেন। গ্রামে প্রবেশ করে নদীর নিকটে মূল মন্দির ও মঠ। অন্যান্য তিব্বতী বৌদ্ধ গোম্ফার মত এখানেও মন্দিরের কোন শিখর বা চূড়া নেই। এই তীর্থক্ষেত্রের নাম কেউ বলেন খোচরনাথ, কারও মুখে শুনি কোজরনাথ বা খেচরনাথ, কেউ বা শুদ্ধ ভাষায় বলেন কোদণ্ড-নাথ। হিন্দু সাধুরা একে খেচরীতীর্থ বলেও উল্লেখ করেন।

মন্দিরের সুমুখে প্রশস্ত অঙ্গন। মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রবেশ দ্বার, তারই মাথার উপর দুপাশে দুটি হরিণের প্রতিকৃতি, তাদের মাঝখানে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মচক্রের প্রতীক চিহ্ন! সারনাথের বুদ্ধমূর্তির বেদীমূলে খোদিত মৃগ ও চক্রের আকারের অনুরূপ। মন্দিরে প্রবেশ করে বৃহৎ হলঘর। কিন্তু পর্যাপ্ত আলোর অভাব। ঐ একমাত্র দ্বারপথে যেটুকু আসে। ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ দাঁড়ালে তবে চোখের দৃষ্টি খোলে। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করি। ঘরের ভিতর দরজার দুই পাশে দুটি বিরাট মূর্তি। প্রায় আট ফুট উঁচু। ভীষণ আকৃতি। হিন্দু মন্দিরে যেমন দ্বারপালের মূর্তি থাকে। এরাও হয়ত তাই। দুদিকের দেওয়ালের গায়ে গোম্ফল গোম্ফার মত সারি সারি খোপ। ভাল রঙিন কাপড় দিয়ে জড়ানো পুঁথি রাখা।

হলের সুমুখ দিকে মন্দিরের মূল বেদি। প্রায় মানুষ সমান উঁচু। বেদির মাঝখানে পূর্ণ বিকশিত পদ্মের উপর পাশাপাশি দাঁড়ানো এই মন্দিরের প্রধান তিনটি বিগ্রহ। মাঝেরটি প্রায় আট ফুট লম্বা। পাশের দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট,—বোধ হয় ফুট্-সাতেক। স্বামিজী বলেন, অষ্টধাতুর তৈরী বলে প্রচার।

অলঙ্কার ও বেশভূষার আতিশয্যে মূর্তিগুলির সর্বাঙ্গ এমনি আচ্ছাদিত যে মুখমণ্ডল ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশ দেখাই যায় না। কোন্‌টি দেবী ও কোন্‌টি দেবমূর্তি প্রভেদ করাও অসম্ভব মনে হয়। মঠের লামা উপস্থিত ছিলেন। দোভাষীর সাহায্যে তাঁকে প্রশ্ন করায় উত্তর পাই,—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি!

তাঁদের এখানে এভাবে প্রতিষ্ঠা হয় কিভাবে বুঝি না। স্বামিজী বলেন, কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন, কোদণ্ডনাথ—অর্থাৎ ধনুর্ধারী রাম থেকেই কোজর-নাথ নামকরণ। আবার কারও কারও ধারণা, এই ত্রিমূর্তি বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর।

বলি, বৌদ্ধ মঠ যখন বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘের মূর্তিও তো হতে পারে?*

রত্নবেদির সুমুখে ঘরের মেঝেতে লামাদের বসে উপাসনা করবার জন্যে গদি-মোড়া আসন পাতা। বেদির উপর মূর্তিগুলির পাদদেশে,—'গ্যালারী'র মত ধাপ। তাতে স্তরে স্তরে সারি সারি দীপমালা। নানান আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের জলপূর্ণ পাত্র। সোনা, রুপা, তামার পাত্রগুলি ও প্রদীপ্ত দীপাবলী অতি সুন্দররূপে সাজিয়ে রাখা।

প্রধান মূর্তিগুলির নিচে মহাকাল, তারা প্রভৃতির বিগ্রহ রয়েছে। বেদির দুই পাশে প্রকাণ্ড আলমারির ভিতর এক এক দিকে আরও ছয়টি করে—মোট বারোটি মূর্তি আছে। সেগুলিও আকারে ক্ষুদ্র নয়,—প্রায় ফুট-পাঁচেক করে হবে।

অনুভবানন্দজির পূর্ব পরামর্শমত তাকলাকোট থেকে বড় টর্চ সঙ্গে আনা হয়েছে। তখন বলেছিলেন, বড় মন্দির হলে কি হবে? ঘরগুলি অন্ধকার, ভাল করে সব দেখতে চান ত ওটা সঙ্গে নিয়ে চলুন।—সেই টর্চের আলোর সাহায্যেই এখন সব দেখা। হঠাৎ মনে হয়, বিগ্রহগুলির একটা ফটো নেবার চেষ্টা করলে হয়। লামার অনুমতি প্রার্থনা করি না। কেননা নিষেধ করলে তখন আর তোলা সম্ভব হবে না। তাছাড়া জানি, প্রখ্যাত শিল্পী শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে বসে যখন মূর্তিগুলির রেখা-চিত্র আঁকতে থাকেন, লামারা তাঁর স্কেচ্ বুই কেড়ে নেন। তাই আমার কাছে

---

* এই ভ্রমণের কয়েক বছর পরে স্বামী প্রণবানন্দজির কাছে শুনি ও তাঁর বই-এ পড়ি, মূর্তি তিনটির পরিচয়: মধ্যখানে 'জামবিয়াংগ',—যাঁকে মৈত্রেয়ী বা মঞ্জুঘোষ বা মঞ্জুশ্রী বলা হয়। এঁর মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ। চতুর্ভুজ। দুই হাত স্বর্ণাভ, অপর দুটি রূপালী। 'দক্ষিণে,—'চেন্‌রেসিগ্'—বা অবলোকিতেশ্বর। শুভ্রবর্ণ। বামে,—'ছাগ্‌নাদোরজে'—অর্থাৎ বজ্রপাণি। নীলবর্ণ। তিব্বতীদের বিশ্বাস, মূর্তিগুলি ও রত্নবেদি মানুষের হাতে তৈরি নয়। খোচরনাথের তিন মাইল দূরে এক হ্রদের মধ্যে বিগ্রহগুলির আবিষ্কার হয়। এই মন্দির ও মূর্তি সম্বন্ধে নানান্ অলৌকিক ঘটনার কিংবদন্তী তিব্বতে প্রচলিত আছে।

যে ক্ষুদ্রকায় ক্যামেরাটি ছিল তাইতে 'টাইম-একসপোজার' দিয়ে সামনে কাষ্ঠাসনে বসিয়ে রেখে দিই, টর্চও জ্বালিয়ে রাখি, লামাকে নিয়ে অন্য মূর্তিগুলি দেখতে থাকি! এই স্বল্পালোকে এমন আন্দাজে তোলা ছবি উঠবে আশা করি নি, কিন্তু পরে দেখি দুটি বিগ্রহ ফটোতে ধরা দিয়েছেন। দেখে ভাবি, লক্ষ্মী-সরস্বতীকে একই সঙ্গে পাওয়ার কথাও ত নয়!

মঠের অন্যান্য ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখি। সেখানেও নানান দেবদেবীর বিগ্রহ। একটি ঘরে বুদ্ধদেবের বহুবিধ মুদ্রাসনে বসা বা দাঁড়ানো মূর্তি। কোথাও বা বিবিধ বর্ণের প্রাচীরচিত্র, লাল, সবুজ ও গৈরিক রঙের ব্যবহার বেশি। তারা ও অন্যান্য শক্তি ও মাতৃকার চিত্র ত আছেই,—তিব্বত তান্ত্রিক সাধনার মহাপীঠ। এই বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বের বহু মূর্তি থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু, মহাদেবের চিত্রও রয়েছে দেখি; এমন কি পাশাপাশি চীনদেশের ড্রাগন—Chinese dragon নির্বিবাদে বিরাজ করে। এ কি সর্ব ধর্ম সমন্বয়? অথবা ভিন্নধর্মের দেবদেবীকে স্বগোষ্ঠীভুক্ত করে রাখার প্রচেষ্টা? একস্থানে সারিবদ্ধ সপ্তমূর্তি। লামা বলেন, বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন অবতার। হিন্দুযাত্রীরা সস্মিত বদনে দাবী করেন, তা কেন? এঁরা হলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল।

একটা ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। কী বিশালকায় এক মূর্তি! কুড়ি ফুটের উপর উঁচু! দাঁড়ানো নয়, আসনে বসা। তাতেও এই বৃহৎ আকার। হিন্দু যাত্রীরা দেখেই স্বভাবতঃ বলে, ভীমসেন! লামা জানান, মৈত্রেয়-মূর্তি।

মহাভারতে পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় যাত্রা বর্ণনায় অর্জুনের মানস সরোবর অঞ্চলে আসার কথা পাওয়া যায়। অথচ এখানে রাম-লক্ষ্মণের উল্লেখ পাই, ভীমসেনেরও নাম শুনি, অর্জুনের কথা কেউ বলে না।

ঘন অন্ধকার পথে অপরিসর সোপান বেয়ে উপরে উঠে এক ঘরে দেখি, অনেকগুলি তিব্বতীয় banner painting—টাঙ্‌কা টাঙানো। বৌদ্ধ দেব-দেবীর, প্রসিদ্ধ যোগীর ও তান্ত্রিক যন্ত্রাদির বহুবর্ণের চিত্রাবলী,—তিব্বতী চারু-শিল্পকলার উৎকৃষ্ট ও অমূল্য সংগ্রহ।

মঠের ভিতর ঘুরে ঘুরে আরও অনেক কিছু দেখি। একটা ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা—মৃত বন্য এক ইয়ক্‌-এর ও ভারতীয় একটা বাঘের চর্মাবৃত বিরাট stuffed দেহ।

এ-যেন এক যাদুঘরে ঘুরি। কিন্তু লামার কাছে প্রশ্ন করে শুনে আনন্দ

পাই, এ শুধু সংগ্রহশালাই নয়, এ মঠে এখনও চিত্রকর ও শিল্পী লামারা বাস করেন, নিয়মিত ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, ডাবা—অর্থাৎ শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের শেখানও। পশ্চিম তিব্বতের এটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র। এ মঠে শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত লামারা এখনও যেমন নূতন গ্রন্থ রচনা করেন, প্রাচীন পুঁথির কোথাও সন্ধান পেলে তার সংগ্রহ কার্যও তেমনি চালান। কাঙ্গের প্রসার হওয়ায় উপরে একটি নূতন ঘর তৈরি হয়েছে। সে ঘরে ঢুকে দেখা যায়, সেখানে আলো বাতাসের অভাব নেই। ভাবি, প্রাচীনকালের অন্ধকার ঘুচাতে লামারা বুঝি এতদিনে নূতন আলোর সন্ধান পেলেন।

খোচরনাথ মন্দিরের শিখর-সৌন্দর্য না থাকলেও মন্দির-অভ্যন্তরে কক্ষগুলির সংস্থাপন ও রচনাপদ্ধতি দেখে আমাদের মন্দিরের নাটমন্দির, গর্ভগৃহ ইত্যাদির কথা মনে পড়ে। স্থাপত্য শিল্পে নেপালের ও দক্ষিণভারতের প্রভাব দেখা যায়। নেপাল রাজ্য এখান থেকে দূরে নয়, এখানে সেদেশের শিল্পধারার প্রভাব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারত? এই মন্দির-শিল্পীদের সঙ্গে সুদূর ভারতেরও যোগাযোগ থাকার এও বোধ করি এক নিদর্শন।

জন পঞ্চাশ লামা এখন এখানে আছেন। কয়েকজনের দর্শনও পাই। সবারই হাতে মণি-চক্র—Prayer wheel। তার ভিতরে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্র লেখা। সারাক্ষণই হাতে সেই যন্ত্র ঘোরান, মুখেও অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণ করে যান। আরও এক সহজ মন্ত্রোপাসনার পদ্ধতি বৌদ্ধমঠে প্রচলিত থাকে, এখানেও আছে। মন্দিরের ভিতর প্রকাণ্ড এক মণি-চক্র—Mani-cylinder। বিরাট ড্রাম বা ঢোলকের আকার। দশফুট উঁচু পাঁচফুট পরিধি। তার সর্বাঙ্গে ও ভিতরে অসংখ্য ওঁ মণিপদ্মে হুঁ মন্ত্র লেখা। একবার এই চক্র ঘোরালে চক্রের আধার অনুযায়ী ততবার মন্ত্রোচ্চারণের ফল হয়। হাতের পাকে যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে উপাসনা চলে। প্রাচীনকালের প্রবর্তিত এই ঘূর্ণায়মান উপাসনাচক্র এখনও অপ্রতিহত গতিতে চলেছে দেখি। জানি না, নির্জীব যন্ত্রের মাঝে অবরুদ্ধ হয়ে ধর্ম প্রাণ হারান কিনা।

এই মঠে কেবল ধর্মোপাসনা ও আর্টের চর্চাই যে হয় তা নয়। চিত্রাঙ্কন ত এঁরা ধর্মের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেন। তাছাড়া সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, জ্যোতিষ, সামুদ্র শাস্ত্র ইত্যাদির পঠনপাঠনও হয়। এক কথায় তিব্বতে বিদ্যাশিক্ষার এই ধরনের মঠই একমাত্র কেন্দ্র। মঠের বাইরে কোথাও

বিদ্যাশিক্ষাদানের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই কারণে মঠবাসী লামা ছাড়া শিক্ষিত পুরুষের দেখা পাওয়া দুর্লভ। মরুপ্রায় নিষ্প্রাণ নীরস তিব্বত দেশে ধর্ম সাধনার এবং বিদ্যাশিক্ষার ও আর্টচর্চার 'ওয়েশিস্' রূপে এই মঠগুলি প্রাণবন্ত হয়ে বিরাজ করে।

মঠের বাইরে গ্রামের যাত্রীদের জন্য ধর্মশালা আছে। তীর্থবাসীও থাকে। ভিখারীরও অভাব নেই।

তিন-চারজন বৃদ্ধাকে দেখে তিব্বতী বলে মনে হয় না। অনুসন্ধানে জানতে পারি, তাঁরা হিমালয়ের বাসিন্দা। গার্বিয়াঙ্, মিলাম প্রভৃতি ভোটিয়া অঞ্চল থেকে দুঃস্থ বিধবারা কেউ কেউ এই পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থবাস করতে আসেন। আমাদের দেশে কাশী বা বৃন্দাবনে যেমন বৃদ্ধারা তীর্থবাসিনী হয়ে থাকেন।

অনুভবানন্দজি জানান, এ তীর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে ১০৩৪ সালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও এখানে কয়েক মাস তীর্থবাস করে যান।

এইসব শুনে ও দেখে মনে দৃঢ় ধারণা হয়, কৈলাস-যাত্রায় খোচরনাথ না দেখে গেলে যাত্রা অসম্পূর্ণ হোত, তিব্বতদেশেও যে তাদের স্বকীয় ধ্যানধারণা অনুযায়ী শুধু ধর্ম-উপাসনাই নয়, জ্ঞানলাভের, বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের, বিদ্যাদানের ও ললিতকলার চর্চার জীবন্ত কেন্দ্র এখনও বর্তমান, এদেশের মানুষও যে সভ্য ভদ্র শিক্ষিত হয়,—সে পরিচয় পাবার সুযোগ হারাতাম!

হৃষ্ট ও তৃপ্ত মনে আবার দশ মাইল পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যার পূর্বে তাকলাকোটে ফিরে আসি। তখন মনে পড়ে, কাল আবার ফেরবার পথে যাত্রা, পরশু পার হওয়া লিপুলেখের সেই তুষারময় দুর্গম গিরিবর্ত্ম। এখনও কতো বরফ সেখানে কে জানে?

॥ ১৩ ॥

৭ই জুলাই। খাওয়াদাওয়া সেরে আজ তাকলাকোট ছেড়ে লিপু পাশ-এর দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

এখানকার বার্ষিক হাট এখনও জমে নি। দু-চারজন ব্যাপারীরা আসতে সুরু করেছে। তবুও তিব্বত-যাত্রার স্মারকচিহ্নস্বরূপ স্থানীয় দু'একটা জিনিস কিনে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সন্ধান নেওয়া হয়। শুধু চামর ও মৃগচর্ম পাওয়া গেল। মৃগনাভি কারও কাছে এখন নেই। মৃগচর্ম কিনতে দেখে অনুভবানন্দজি বলেন, নিচ্ছেন নিয়ে যান, কিন্তু আমাদের দেশে গরমে এ

জিনিস এ-রকম থাকবে না—সব লোম ঝরে যাবে। থুলমা নিয়ে গিয়েও দেখেছি, রাখা যায় না, পোকায় নষ্ট করে দেয়।

গুনগুন স্বরে স্তব করতে করতে সুরেন্দ্র মহারাজ আসেন, তাঁবুতে ঢোকেন। মাথার উপর ভিজা গেরুয়া গামছা। হাতে জলভরা ঘটি। তৈলসিক্ত মুখে রৌদ্র পড়ে চক্‌মক্ করে। জিজ্ঞাসা করি, স্নান করে এলেন নাকি? কোথায়? নদীতে?

বলেন, হাঁ,—কিন্তু নদীর জলে নয়, অনেকখানি নামতে হয়। এই তো তাঁবুর অল্প নীচেই ঝরনা রয়েছে, সেই জলে। ওঃ! স্নান করে খুব তৃপ্তি হোল। প্রথমটা বেশ শীত লেগেছিল,—তারপর একবার গায়ে জল লাগার পর আর কষ্ট নেই। যা চন্‌চনে রোদ। ভারী আরাম পাবেন,—চলে যান, ভানুসিং-এর কাছ থেকে সরষের তেল চেয়ে নিয়ে রোদে বসে খুব করে মেখে নিন আগে। ব্রহ্মচারীজিও স্নানে গেছেন।

সুধীর ও আমি সেইমত করি। গার্বিয়াঙ ছেড়েছি—দু-সপ্তাহ আগে। মাঝে একদিন সেই মানস সরোবরে ছাড়া কোথাও স্নান হয় নি,—জলের অভাবে নয়, সাহসে কুলায় নি, প্রয়োজন বোধও হয় নি। অথচ কলকাতায় সারা বছর—এমন কি শীতকালেও—দুবেলা স্নান করার অভ্যাস। তিব্বতে এসে 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ'—নিয়মের বশীভূত হয়েছি। এই প্রচণ্ড শীতের রাজ্যে তিব্বতীরা কেন যে আজীবন স্নান করে না, তার কারণ হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। আজ দেশে ফেরার পথে রৌদ্রে বসে তেল মেখে স্নান করার প্রলোভন সংবরণ করা গেল না,—শীতভয়ে কাতরও হলাম না। আমাদের স্নান দেখার কৌতূহলে তিব্বতী মেয়েপুরুষের ভিড় জমে গেল! তারা অবাক হয়ে দেখে, হয়ত ভাবে,—জল নিয়ে এ-লোকগুলির এ কী কাণ্ড! এরা বদ্ধ পাগল নাকি!

বেলা ১২টা ২০ মিনিটে তাকলাকোট ছেড়ে ৩টা ১৫তে লিপুলেখ পাশ্-এর নীচে পালাতে পৌঁছে রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেলা হয়। কাল ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে আবার সেই তুষারাবৃত গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে।

তিব্বতে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় না। জলভরা মেঘপুঞ্জ দক্ষিণ থেকে ভেসে এসে হিমালয়ের গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণীতে অবরুদ্ধ হয়, ভারতের দিকে পাহাড়গুলিতে জলভার ঢেলে দিয়ে নিঃশেষিত হয়। তিব্বতে মেঘের উদয় সম্ভব হতে পারে উত্তরে মধ্য-এশিয়া অঞ্চল থেকে। কিন্তু সে মেঘ কখনো নেমে এলেও বৃষ্টি

হয় ক্বচিৎ, তুষারপাত বা শিলাকর্ষণই ঘটে। তিব্বত-বাসকালে আমাদের সে দুর্যোগের সম্মুখীন বেশী হতে হয় নি,—আব্‌হাওয়া মোটের উপর ভালই পেয়েছি। আজ কিন্তু এখানে তাঁবু ফেলার পরই বৃষ্টি নামে, সারা সন্ধ্যা টিপটিপ করে পড়তেই থাকে। একে লিপু পাশ্‌-এর নীচেই,—১৪,০০০ ফুট উঁচুতে রাতকাটানো, তায় আবার বৃষ্টি বাদল, দেহের ভিতর অস্থি পর্যন্ত শীতে কন্‌ কন্‌ করে। আজ আর কোট, ওভারকোট কিছুই গা থেকে খুলি না,—সেই বেশ পরেই থুলমা চাপিয়ে শুয়ে পড়ি। অতো শীতেও নিদ্রা আসতে বিলম্ব হয় না।

পরের দিন—৮ই জুলাই—রাত সাড়ে তিনটার সময় সকলে উঠে প্রস্তুত হই। কিন্তু নিশ্ছিদ্র কুয়াশায় দিগন্ত আচ্ছন্ন থাকায় এক হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না। ঘণ্টা দুই পরে কুয়াশা কাটে, আলো ফোটে, যাত্রাও সুরু হয়। সকলেই ঘোড়ায় চেপে চলি। অনেকখানি চড়াই ওঠার পর তুষার-রাজ্যে পৌঁছুই। তখনি আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসও ওঠে। দুঃসহ শীতে সারা অঙ্গ কাঁপতে থাকে। মনে হয়, শীতের এমন নির্মম প্রবলতা এর পূর্বে একদিনও অনুভব করি নি। ভাগ্যক্রমে পথের উপরকার বরফ শক্ত থাকায় ঘোড়ার উপর বসে পাশ্‌-এর মাথার দিকে উঠতে থাকি। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট এবার তেমন বোধ হয় না। পাশ্‌-এর শীর্ষদেশে পৌঁছানোর কিছু আগে নরম বরফ দেখা দেয়। ঘোড়ার পাও মাঝে মাঝে তাতে বসে যায়। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় ঘোড়া থেকে নেমে সকলে হেঁটে চলি। কেবল ব্রহ্মচারীজি নামেন না, বলেন, খাসা চলেছি—, আসার সময় যা ভীষণ কষ্টভোগ গেছে, এবার আর ঘোড়া থেকে নামা নয়,—বলে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে যান।

আমাদের কিন্তু ঘোড়া ছেড়ে হেঁটে চলতে 'শাপে বর' হয়। কয়েক পা চলবার পরই সেই প্রচণ্ড শীতবোধ অনেকখানি কমে।

পাশ্‌-এর মাথার উপর পৌঁছে ভারতের দিকে তাকাই। সেদিকে লিপুলেখের পাহাড়ের গায়ে—তিব্বতে আসবার সময়—যে দুস্তর সীমাহীন তুষারপ্রান্তর অতিক্রম করতে প্রাণান্তকর পরিশ্রম হয়েছিল, আজ এখন আর তার সেই ভীষণ রূপ নেই। বরফ অনেক গলে গেছে। স্থানে স্থানে কালো কালো শিলাস্তূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। পথের কোথাও বা তুষার আবরণের সম্পূর্ণ অপসরণে শক্ত মাটি ও পাথর বার হয়েছে। এখন আর পাহাড়ের নিষ্কলঙ্ক শুচিশুভ্র রূপ নয়। কোথাও শাদা, কোথাও কালো,—যেন, জেব্রার

গাত্রচর্মের বিচিত্র বর্ণশোভা,—Zebroid। দিকে দিকে এখন বরফ-গলা ঝরনা-ধারা। কলস্বনে নেমে চলে। আমরাও অনায়াসে সোৎসাহে এই তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করি। যে পথে উঠতে গতবার দু' ঘণ্টা লেগেছিল, এবার সেই পথই আধ ঘণ্টা মাত্র সময়ে নেমে আসি।

ঘোড়ায় চড়ে নেমে আসার দরুণ ব্রহ্মচারীজিরও এবার কোন পরিশ্রম হয় না, শ্বাসকষ্টও থাকে না। কিন্তু 'হিতে বিপরীত'ও ঘটে। আর এক দুর্ভোগে তিনি ক্লান্ত হন। সকাল থেকে ঘোড়ার পিঠে একভাবে লাগাম ধরে বসে থাকায় নিরতিশয় শীত-কাতরতা ত হয়ই, যাত্রাশেষে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে প্রকাশ পায়, হাতপায়ে খিল ধরেছে, হাতের আঙুলগুলি অবশ হয়েছে, সোজা পর্যন্ত করতে পারছেন না। ভাগ্যক্রমে পথের পাশে একদল ভোটিয়া যাত্রী আগুন জেলে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেইখানে অনেকক্ষণ সেক তাপ দেবার পর আবার আঙুলগুলিতে সাড় ফিরে আসে।

রুকুমসিং বলে, নামবার পথে ঘোড়া ছেড়ে ওঁকে হাঁটতে বলেছিলাম, কষ্ট হবে ভেবে উনি নামেন নি, কিন্তু আর বেশীক্ষণ ঐভাবে থাকলে আঙুলের রক্ত সব জমে যেতে পারত।

দুপুরে কালীনদীর ধারে কালাপানিতে পৌঁছে সেরাত্রি সেইখানে কাটাই। আমাদের পৌঁছুবার পর থেকেই বৃষ্টি নামে, রাত্রেও থামে না।

পরদিন—৯ই জুলাই—সকালেও দেখা যায়, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে বর্ষাকালের মতন। অনুভবানন্দজি বলেন, জুলাই মাস, বর্ষাকাল এসে গেছে। তিব্বতে বোঝবার জো ছিল না,—সেদেশে ত বর্ষাঋতু নেই, বৃষ্টিও নেই। ওখানে যাবার একমাত্র সময়ও এই জুন-জুলাই-আগস্টে না হলে লিপু পাশ্-এর বরফ গলে না, পার হবার উপায় থাকে না। অথচ কৈলাস যাত্রা করে ফেরবার পথে এই সময়টাই হয় মহা অসুবিধের। বর্ষা এসে যায়, হিমালয়ের পাহাড় ধসে পড়ে, পথঘাট ভাঙে, নদীর পুল ভেসে যায়। ভালয় ভালয় নিরপানির পথটা আপনাদের পার করিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই হোল। তা' চলে যাওয়া যাবে, কি বলেন সুধীরবাবু? জয় শিবশম্ভো।

বেলা দশটায় বৃষ্টি থামে। আমরাও যাত্রা করি। বৈকাল চারটার সময় গার্বিয়াঙের নিকটবর্তী হই।

গ্রামে পৌঁছুবার কিছু আগে কালীনদীর ধারে পাহাড়ের খানিক অংশ বর্ষার প্রকোপে ধস্ নেমে ভেঙে গেছে দেখি। পথ বলতে সেখানে কিছুই

নেই। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ধসের উপর কোনমতে পা রেখে অতি সাবধানে সেই অংশ পার হয়ে আসি। অপর দিকে নিরাপদে পৌঁছে পিছন ফিরে চিন্তাকুল দৃষ্টি ফেলে দেখতে থাকি. মালবাহক ঘোড়াগুলি পার হবে কি ভাবে? তারা এক এক করে আসে.—একজন সহিস সামনে মুখের লাগাম টেনে ধরে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে, অপর এক সহিস পিছনদিকে ঘোড়ার লেজ টেনে রাখে, —যাতে ঘোড়া ভয় পেয়ে বা পা হড়কে নীচে না পড়ে। পড়লে আর রক্ষা নেই, খড়কুটার মত নদীর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

স্বামিজী বলেন, এখন বর্ষাকালে এ ধরণের ধস্ মাঝে মাঝে আসবেই,— নিরপানির পুলগুলা ভেঙে না গেলেই হোল।

গ্রামে ঢোকার আগে দূর থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসে,—কোথায় যেন মাদল বাজে।

রুকুমসিং জানায়, গার্বিয়াঙে ডুডুঙ স্থরু হয়ে গেছে, তারই বাজনা।

ডুডুঙ!—বাজনার শব্দের অনুকরণেই কি নামকরণ?

স্বামিজী জানান, ভালই হোল। ডুডুঙ এখানকার ভোটিয়াদের একটা বড় উৎসব,—আপনাদের দেখা হয়ে যাবে।

শুনে মনে উৎসাহ ও কৌতূহল জাগে।

গার্বিয়াঙের ডাকবাংলোতে ডিস্ট্রীক্ট এঞ্জিনিয়ার সাহেব এসেছেন। তাই স্কুলবাড়িতে ওঠা হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁবু ফেলে গাইড্‌রা মালপত্র রাখার ব্যবস্থা করে।

গ্রামে পৌঁছেই রুকুমসিংকে মুন্সীজি অর্থাৎ পোস্টমাস্টারের কাছে পাঠানো হয়েছে—চিঠিপত্র এ কয়দিনে কিছু এল কিনা, তারই সন্ধানে। খবর পেয়ে চিঠির তাড়া নিয়ে মুন্সীজি নিজেই এসে যান। পিথোরাগড় থেকে কলকাতায় একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার ভার তিনি নেন। এখান থেকে সে টেলিগ্রামের খবর কলকাতায় পৌঁছুতে তিন দিন সময় নিলেও, অন্য কোন ভাবে জানানোর উপায় নেই যে মানস সরোবর কৈলাস নির্বিঘ্নে দর্শন হয়েছে, সকলেই সুস্থ দেহে আনন্দিত চিত্তে ফিরেছি। এতদিন বাড়ির কথা মনেই হয় নি। আজ চিঠি পেয়ে বার বার পড়েও মনের তৃপ্তি মেটে না। দু সপ্তাহেরও বেশী পুরানো চিঠি, তবুও মনে হয় চিঠির মধ্যে এইখানে বসেই যেন সবার সঙ্গে কথা বলছি। যাবার সময় পথে-তোলা 'ম্যুভি ক্যামেরা'র ছবি কলকাতায় যেটুকু ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি তৈরি হয়েছে, বাড়িতে সকলে

দেখেছেন। ছবিতে আমাকে দেখে মায়ের চোখে জল এসেছিল। আরও কতো কী খবর! খেলার মাঠে, কলকাতায়, ভারতবর্ষে, জগতের কোথায় কি ঘটল—সেই সবের সুদীর্ঘ তালিকা। বুভুক্ষু মন যেন গোগ্রাসে খবরগুলি গিলতে চায়।

বহুদিন-বিস্মৃত-সুখ-স্বপ্নের মত চোখের উপর হঠাৎ সব ভেসে আসে। সুদূর প্রবাসে পথিক-জীবনের শান্ত বেলাভূমি ওপারের গৃহ-জগতের স্মৃতি-তরঙ্গ আঘাতে আনন্দোচ্ছল হয়ে ওঠে।

রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। স্কুলবাড়ির ঘরের ছাদ দিয়ে ভিতরে জল পড়ে। বিড়ালছানা টানার মত সারারাত বিছানা টেনে ঘরের এধার থেকে ওধার করে, সর্বত্র ব্যর্থ হয়ে, অবশেষে ওয়াটারপ্রুফ গায়ে শুয়ে পড়ি,—টপটপ করে তারই উপর জল পড়তে থাকে। তবুও, কখন জানি না, চোখে ঘুম নেমে আসে।

॥ ১৪ ॥

বেলা ১১টায় এঞ্জিনিয়ার সাহেব গার্বিয়াঙ ছেড়ে চলে গেলেন। খবর পেতেই মালপত্র নিয়ে সকলে ডাকবাংলোতে গিয়ে আস্তানা পাতি। গার্বিয়াঙে দুদিন হয়ত থাকতে হবে। খেলা থেকে নতুন পোর্টার আসবার কথা। তারা এলে তবে মালপত্র নিয়ে রওনা হওয়া যাবে। অতএব ভাল করে ডুডুঙ উৎসব দেখার সুযোগও পাওয়া গেল।

ডুডুঙ এ-অঞ্চলের ভোটিয়াদের এক প্রধান বাৎসরিক উৎসব। মানব-জীবনের কোন আনন্দময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়, জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু, তারই স্মৃতি ঘিরে এই অনুষ্ঠান। মৃত গ্রামবাসীদের আত্মা সদ্‌গতি লাভ করুক, এই এর উদ্দেশ্য। অনেকটা আদ্যশ্রাদ্ধের মতন। প্রতি বছর কার্তিক মাস থেকে আষাঢ়ের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়, তাদের প্রেত-তর্পণ হয় শ্রাবণে। সেই শ্রাদ্ধোৎসব অনুষ্ঠিত হয় গার্বিয়াঙে। আবার শ্রাবণ থেকে কার্তিকের মধ্যে যে গ্রামবাসীদের মৃত্যু ঘটে তাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় অগ্রহায়ণে,—কিন্তু গার্বিয়াঙে নয়, সেই ধারচুলায়। কারণ শীতের প্রারম্ভে গ্রামবাসীরা তখন নেমে গেছে সেখানে।

রুকুমসিং বলে, আপনারা এখানকার ডুডুঙের ঠিক সময়েই এসে গেছেন, আজ সারাদিন অনেক কিছু দেখতে পাবেন। আজই প্রধান পরব; কাল

শেষ। ডুডুঙ স্বরু হয়েছে চারদিন আগে।

তার কাছে শুনি, প্রথম দিন ঘরে ঘরে মদ তৈরি হয়। দ্বিতীয় দিন, যে-যে বাড়ির লোক মারা গেছেন, তাদের বাড়িতে গ্রামের লোকেরা কাঠ কেটে বয়ে দিয়ে আসে। তৃতীয় দিনে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে তিল দিয়ে পুরি তৈরি হয়। চতুর্থ দিনে গ্রামবাসীদের সেই পুরি, ভাত, মদ খাওয়ানোর প্রথা। গতকাল সেই ভোজপর্ব গেছে। আজ পঞ্চম দিন,—প্রধান উৎসব। এমনি সময়ে বাইরে বাদ্যধ্বনি নিকটতর হয়। জনতার কলকোলাহল শোনা যায়। মনে হয়, কোন শোভাযাত্রা চলেছে।

রুকুম উৎসাহিত হয়ে বলে, চলুন সবাই এখনি,—ঝব্বুকে নিয়ে চলেছে, দেখতে পাবেন।

বাংলো ছেড়ে রাস্তায় আসি। বেশ ভিড়। মিছিলই চলেছে। একটা ইয়ককে নানাবর্ণের বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি পরিয়ে সাজিয়েছে। এদের বিশ্বাস, মৃতের আত্মা এখন এসে এই জীবদেহে অধিষ্ঠান করছে। মৃতব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রাণীটিও চমরী গাভী বা বলদ ইয়ক বা ঝব্বু হওয়া চাই। মৃতের পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, অঙ্গভূষণাদি এই পশুর দেহে সাজিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। একেবারে শিঙ থেকে স্বরু করে লেজ পর্যন্ত। মৃতব্যক্তিদের গৃহে গৃহে এখন একে মহা সমারোহে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ যেন দীর্ঘ প্রবাস-বাসের পর কারো আপন গ্রামের ঘরে ফেরা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট সাদর অভ্যর্থনা পাওয়া। আমরাও মিছিলের সঙ্গে চলি।

মৃতের স্মরণে শোভাযাত্রা, তবুও শোকতাপের লেশমাত্র প্রকাশ নেই। উদ্দাম স্ফূর্তি ও হর্ষোল্লাসের ঘন ঘন জয়ধ্বনি। তার কারণও থাকে। প্রায় সকলেই সুরামত্ত। ঢাক, ঢোল, শিঙা, করতাল প্রভৃতি বাজনা বাজিয়ে সকলরবে গ্রামের পথ দিয়ে মিছিল চলে। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ ঘর থেকে বেরিয়ে ইয়কটিকে নানাবিধ খাদ্য খেতে দেয়। তাদের আপ্যায়নের আতিশয্যে ও বেশভূষার গুরুভারে বেচারী পশুর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, মনে হয়।

পরলোকগত ব্যক্তির বাসভবনে শোভাযাত্রা পৌঁছয়। গৃহস্বামী সকলকে অভ্যর্থনা করেন। সদর দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করি। সুমুখেই উঠান। তারই এক অংশে শ্রাদ্ধবাসর। পূজার আয়োজন। প্রকাণ্ড বেদি। তার উপর

নৈবেদ্যের মত সারি সারি থালা, বহু খাদ্যসামগ্রী স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা,—শুকনা মেওয়া, মিছরি, চাল, ডাল, আটা, ঘি প্রভৃতি। পিতলের পাত্রে মদও। এক পাশে কতকগুলি পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতা। শুনি, মৃতব্যক্তির ব্যবহৃত ও প্রিয় বেশভূষা। হুঁকা, গুড়গুড়িও বাদ যায় না। পিতলের বাসন, কার্পেট, শয্যাদিও আছে।

দেখে মনে পড়ে যায় এবং এখন বুঝতে পারি, কৈলাস যাত্রার পথে, এই গার্বিয়াঙে, মহীশূর সরকারকে পাটোয়ারীজি তাঁর মৃত আত্মীয়ের নিত্য-ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র এখানে ফেরত পাঠাবার জন্য সানুনয় অনুরোধ জানিয়ে যে পত্র পাঠান, তার প্রকৃত প্রয়োজন কী ছিল।

বেদির সামনে পুরোহিতের মত একজন বসে একটানা স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। কোন পুঁথি বা গ্রন্থ দেখে পাঠ নয়, যেন মুখস্থ করা স্তব আবৃত্তি করা। শুনি, মৃতের আত্মার প্রতি এটি উপদেশ-বাণী,—হরিদ্বার থেকে সুরু করে কৈলাস পর্যন্ত যাত্রাপথে সে কী কী দেখতে পাবে এবং কোথায় তার কী করণীয়, তারই নির্দেশ।

আমার মনে পড়ে W. Y. Evans-wentz-এর সম্পাদিত Tibetan Book of the Dead গ্রন্থখানির কথা। তিব্বতীদের বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির আত্মা মরদেহ ত্যাগ করার পর পুনর্জন্ম গ্রহণের আগে Bardo Thodal স্তরে অবস্থান করে। সেখানে আত্মার সাহায্য ও সদ্‌গতির জন্য অনেকটা এইভাবে মন্ত্র পড়ে নির্দেশ দেবার বিধি-নিয়মাদি সে গ্রন্থে আছে। এখানে এই ভোটিয়া সম্প্রদায়েও কি সেই ধরণের প্রথার প্রচলন?

শ্রাদ্ধমণ্ডপে বহু পুরুষ ও নারীর সমাবেশ। ইয়কটিকেও ভিতরে আনা হয়। বাড়ির মেয়েরা মালা পরিয়ে তাকে বরণ করে, তার মুখে খাদ্যবস্তু পুরে দেয়, মদও ঢালে, সমবেত কণ্ঠে কাঁদে। ডুডুঙ উৎসবে পরলোকগত প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে এইখানেই শুধু শোকাশ্রু বর্ষণ দেখি।

গৃহকর্তা শুকনা ফল, মিছরি দিয়ে আমাদেরও আপ্যায়ন করেন।

এইভাবে আবার অপর আর এক বাড়িতেও ঢুকি। সেখানে ঘরের ভিতর নিয়ে চলে। দিনের বেলাও একেবারে চোখে কিছুই দেখা যায় না,—এমনি দুর্ভেদ্য অন্ধকার।

সুধীর অনুভবানন্দজিকে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় অন্ধকূপে নামাচ্ছেন?

অন্ধকারে স্বামিজীর হাসি ও কণ্ঠ শোনা যায়,—নামাব কেন? দেখছেন

না,—সুমুখেই স্বর্গের সিঁড়ি। আলো আছে, ভাবনা নেই,—বলে ঝোলা থেকে টর্চ বার করে জ্বালান।

ঘরের কোণে আঁকাবাঁকা সিঁড়ি। উপরে উঠে গেছে। তাই বেয়ে উঠে উপরেও প্রায়ান্ধকার কক্ষ। অতি ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ। মাথা হেঁট করে পার হতে হয়। স্বামিজী আগে থেকে সাবধান না করালে নিঃসন্দেহে কপালে চৌকাঠের সুখস্পর্শ অনুভব করতাম। এখন যে-ঘরে ঢুকি তার চারপাশ দেখবার খানিক সহায়তা করে ঘরের ভিতর এক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু তাতে শুধু আলোরই সৃষ্টি হয় না,—কার্যকারণের চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ধূমেরও আবির্ভাব হয় প্রচুর। বদ্ধ ঘরে দমবন্ধ হয়ে আসে। শুধু তাই নয়। এক পাশে স্তূপীকৃত শুকনা চামড়ার উৎস থেকে যে তীব্র উৎকট গন্ধ বার হয়, গৃহবন্দী হয়ে সে-গন্ধ যেন জমাট বাঁধে। এখন যা দেখতে আসা, তারই কথা বলি। ঘরের দেওয়ালের নিকটে হাত-তিন-চার লম্বা এক দারুমূর্তি। অতি সাধারণ ভাবে কাঠ কেটে তৈরি। শুনি, মৃতব্যক্তির আত্মা এতেও আশ্রয় নিয়েছে। মূর্তির যোদ্ধবেশ। এরও অঙ্গে শোভা পায় মৃতের বসনভূষণ অলঙ্কার। মৃতব্যক্তি মহিলা হলে, নারীমূর্তি গঠিত হোত। মূর্তির সুমুখেই সেই হোমকুণ্ডের মত অগ্নিকুণ্ড। এখানেও একজন পুরোহিতের মত বসে, মন্ত্র পড়ে অগ্নিকুণ্ডে যব উৎসর্গ করছেন। বলা বাহুল্য, পাশে কলসী-ভরতি সুরা। আমাদের বৃষ-কাষ্ঠের সঙ্গে এই দারুমূর্তির কিছু সাদৃশ্য রয়েছে মনে হয়।

সুরেন্দ্র মহারাজ গম্ভীরমুখে একমনে সব দেখছিলেন। বলেন, অবাক হচ্ছি দেখে, এই শ্রাদ্ধোৎসবের অনেকগুলি অঙ্গ আমাদের হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উপকরণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এখানেও তিল, যবের ব্যবহার, যজ্ঞ-বেদি, হোমকুণ্ড, নৈবেদ্যদান, বৃষোৎসর্গ। আর ঐ সাজানো ইয়কটাকে দেখে মনে পড়ছে, গরুড় পুরাণের উত্তরখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে বৃষোৎসর্গ কথন। সেখানে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে;—শ্রাদ্ধকালে বৃষোৎসর্গ অবশ্য করণীয়, না করলে মৃতের আত্মার পরলোকে সদ্‌গতি হয় না। বৃষকে সেখানে "নীলবৃষ" বলে বর্ণনা করা হয়েছে; উৎসর্গপদ্ধতিও দেওয়া আছে। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে বৃষোৎসর্গ বিধান আছে; সেখানেও দেখা যায় বৃষকে "সর্বালঙ্কার ভূষিত" করে উৎসর্গ করতে হবে। এখানেও যেমন ইয়কটার সাজসজ্জা করানো হয়েছে, সেখানেও আমাদের শাস্ত্রের বিধান, "এবম্

বিধি সমাযুক্তো প্রেত মোক্ষং করোতি হি।"—অর্থাৎ এই অনুষ্ঠান-বিধি পালন করলে প্রেত মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। হিমালয়ের এই পাহাড়ীদেরও দেখছি সেইমত একই দৃঢ় বিশ্বাস। এ দেশের এই প্রথা ও ধর্মবিশ্বাসের মূল কোথায়, কী জানি! আশ্চর্য লাগছে—এই ডুডুঙ উৎসব দেখে।

অনুভবানন্দজি বলেন, চলুন, বেলা অনেক হয়ে গেল, বাংলোতে ফেরা যাক।

কুকুমসিং জানায়, এখন সারাদিনই এই রকম চলবে। বিকেলে আবার দেখতে আসবেন, তখন নাচ হবে।

আমাদেরও উৎসাহ থাকে। বিকাল হতেই সুধীর ও আমি বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

গ্রামবাসীরা উৎসবসাজে সেজে দলে দলে চলেছে। যেন আমাদের দেশে পথঘাটে বিজয়াদশমীর ভিড়। শোভাযাত্রাও আসছে। এখন আর সেই ইয়ক সঙ্গে নেই। প্রথমে আসে ব্যাণ্ড-পার্টি,—বাজনদাররা। কেউ বাজায় দামামা বা ঢাক, কারো হাতে খঞ্জনী বা করতাল। এমনি দ্রুতলয়ে ঝংকার ওঠে, যেন তালে তালে মার্চ করে সৈন্যদল আসে।

সুধীর বলে, রণসজ্জা করেই ত সব আসছে দেখছি।

বাদ্যকরদের পিছনেই একদল পুরুষ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে। সকলেরই পরনে সাদা ধবধবে পোষাক,—নেপালী ধরণের পায়জামা, চাপকানের মত লম্বা জামা; মাথায় পাগড়ি; হাতে ঢাল ও তরবারি।— তাদের পিছনে পিছনে গ্রামবাসীরা ভিড় করে আসে। সবাই সুরাপান করে চুর হয়ে আছে।

আমরা তাদের সঙ্গ এড়িয়ে পিছু নিই। একটা প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে তারা জমায়েত হয়। আর একটা শোভাযাত্রা করে মেয়েরা আসে। তাদের পরনে রঙিন ঘাগরা, পুরা-হাত রঙিন জামা, মাথায় ওড়না, কানে, হাতে, কণ্ঠে, বুকে প্রচুর অলঙ্কার, প্রায় সবই রূপার। হাতে রুমাল ও পাইনগাছের ডাল।

প্রাঙ্গণের মাঝখানে স্তূপাকার শুক্‌না কাঠ জড় করা। তাতে অগ্নিসংযোগ হোল। দাউ দাউ করে আগুনের শিখা যেন সহস্র ফণা তুলে জেগে উঠল। এদিকে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়া নামতে সুরু হয়েছে। এইভাবে বহু উৎসব করে, সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে, অর্ধচন্দ্রাকারে একদিকে যোদ্ধবেশী নর্তকের দল ঢাল তলোয়ার হাতে এবং অপর অর্ধাংশে নর্তকীরা পাইন ডালের মশাল জেলে

রুমাল নেড়ে নাচতে লাগল।

সে এক অপরূপ দৃশ্য!

জ্বলন্ত অগ্নিশিখার উজ্জ্বল দীপ্তি। বাজনার তালে তালে নর্তকীদের সাবলীল নৃত্য। তাদের হাতের জ্বলন্ত মশালের সঞ্চালনে অগ্নিতরঙ্গরেখার সৃষ্টি। অঙ্গের ঝকমকে রজত অলঙ্কারে তারই কলসিত বিচ্ছুরণ। নৃত্যক্লান্ত সুন্দরীদের ঘর্মসিক্ত আননে মুক্তাবিন্দুর আরক্ত আভা। অপর দিকে শুভ্রবেশ-ধারী নর্তকদের ক্ষিপ্রহস্তে আন্দোলিত শাণিত তরবারিতে আলোকদ্যুতির প্রতিফলন। নৃত্যের ছন্দে চারিদিকে বিদ্যুৎচমকের মত আলোকরশ্মি ঝলকিত হতে থাকে।

রাত্রি আসে। অন্ধকারে বহ্ন্যুৎসবের ও মশালের শিখাগুলি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। নৃত্যের তালও দ্রুততর হয়। দর্শক মেয়েপুরুষ নাচে যোগ দেয়। স্ফূর্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়। সকলেই সুরামত্ত। এখানেও জলসত্রের মত সুরা বিতরণ ও পান চলে। শুনি, গভীর রাত্রি পর্যন্ত এইভাবে উৎসব চলবে। সবশেষে মশালগুলি আগুনে ফেলে সবারই ঘরে ফেরার কথা। কিন্তু কয়জনের ফেরবার মত তখনও সামর্থ্য বা সংজ্ঞা থাকে, জানি না।

॥ ১৫ ॥

সকালে ডুডুঙ-এর শেষাঙ্ক দেখতে চলি। গ্রামবাসীরা বাজনা বাজিয়ে ইয়কটিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এখন আর তার আদর অভ্যর্থনা নেই। নিরাভরণ, নিরলঙ্কার দেহ। সারা গায়ে লাল রঙ মাখানো। খেদিয়ে নিয়ে চলে দূরে নদীর নির্জন কিনারায়, সেখানে জঙ্গলে নির্বাসন দিতে।

পরে অনুভবানন্দজির কাছে শুনে স্তম্ভিত হই, পশুটিকে এইভাবে গ্রামবাসীরা ছেড়ে দিয়ে আসে বটে, কিন্তু মানুষের হাতে তার প্রাণরক্ষা হয় না, লোকেরা সন্ধান করে মেরে তার মাংস ভক্ষণ করে।

ভাবি, আত্মার আশ্রয়দাতার অবশেষে এ কী নিদারুণ পরিণতি!

ডুডুঙ দেখার উৎসাহে অলক্ষ্যে দুদিন সময় কেটে গেছে। এইবার বাড়ি ফেরবার টানে আবার মন ছোটে। খবর এসেছে, খেলা থেকে পোর্টাররা আজ রাত্রে এখানে পৌঁছে যাবে। অতএব, কালই পুনরায় যাত্রা সুরু।

কিন্তু, আলোর পিছনে যেমন ছায়া ঘোরে, তেমনি এই সুসংবাদের সঙ্গে দুঃসংবাদও আসে। নিরপানির পথের পুল ভেঙেছে।

স্বামিজীর চিন্তাভার বাড়ে। বলেন, যা বর্ষা নেমেছে, এই আশঙ্কাই করছিলাম। এপার দিয়ে নতুন রাস্তা কতদূর হোল খবর পাই নি। যদি সে-পথ ধরে কোনমতে পার না হওয়া যায়, অগত্যা ওপরের সেই কঠিন পথই ধরতে হবে। উপায় নেই।

সুধীর বলে, কতো দুর্গম পথ ঘুরে আসা হোল, এখন নিরপানির সেই পথটা পার হওয়া যাবে না? ঠিক চলে যাব।

গার্বিয়াঙ-এ এসে পর্যন্ত কিচ্ ও রঞ্জন সারাক্ষণ আমাদের কাছাকাছি ঘুরছে। কখন কি কাজ করার সুযোগ আসে তারই সন্ধানে উদ্‌গ্রীব। কাঠের প্রয়োজন? তখনি কাঠ এনে দেয়। দুধ চাই? তখনি কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনে। গরুর দুধ কোথাও পাওয়া গেল না, তাতে কী? বকরির দুধ এনেছে। গত কদিনের বৃষ্টিতে আমাদের সঙ্গে আনা তাঁবু ভিজে ভারী হয়ে গেছে, নিজেরাই সেটা রোদে দেবার ব্যবস্থা করে। সব সময়েই হাজির রয়েছে, কোন কিছুতেই সাহায্য করার ইঙ্গিতেরও অপেক্ষা করে না। হাসিমুখে স্বেচ্ছায় সেবা করে চলেছে। অথচ তাদের সঙ্গে আমাদের এখন সম্পর্কই বা কীসের? গার্বিয়াঙ থেকে তিব্বত যাত্রার জন্য তাদের ঘোড়াগুলি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, নিজেদের ঘোড়ার দেখাশুনার উদ্দেশ্যে নিজেরাই সঙ্গে গিয়েছিল। গার্বিয়াঙে ফিরে এসে সেইদিনই তাদের কাজের শেষ হয়েছে, প্রাপ্য টাকা, বখশিশ পেয়েছে। তবুও অলক্ষ্য কীসের বাঁধনে আমাদের যেন বেঁধে রাখে, নিজেরাও ধরা দেয়।

ব্রহ্মচারীজি দুদিন তাঁর ডিস্‌পেনসারি সাজিয়ে বসে আছেন। নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। দলে দলে রোগী আসছে—দূরের গ্রাম থেকেও। তাদের রোগের বিবরণ শুনছেন, ঔষধ বিতরণ করছেন।

অধিকাংশ লোকের গলগণ্ড। পর্যাপ্ত আইওডিন-এর অভাব এর কারণ।

তাছাড়া, অনেকেরই কুৎসিত রোগ। ব্রহ্মচারীজি বলেন, ও-সব রোগের ওষুধ তো সঙ্গে আনি নি, আনবার কথাও মনে হয় নি।

সন্ধ্যার পর মালবাহকের দল গার্বিয়াঙে পৌঁছে যায়। তাদের সঙ্গে কথা বলে স্বামিজী হাসিভরা মুখে ঘরে ঢোকেন, বলেন, সুধীরবাবু! মস্ত সুখবর। কী নিশ্চিন্তই না হওয়া গেল। ওরা নিরপানির নতুন রাস্তা দিয়েই এসেছে। সম্পূর্ণ না হলেও কোনমতে পার হয়ে যাওয়া যাবে। কৈলাসপতির কৃপা দেখছেন?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রত্যাবর্তন

(১২ই জুলাই—২৪শে জুলাই, ১৯৩৪)

॥ ১ ॥

১২ই জুলাই গার্বিয়াঙ্ ছাড়ি। রুকুমসিং এখানেই থেকে যাবে, খেলায় এখন ফিরবে না।

কিচ্ ও রুকুমসিং গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। অবশেষে বিদায়ক্ষণ আসে। গড় হয়ে তারা প্রণাম করে। হাত বাড়িয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরি, বলি, আবার যদি আসি দেখা হবে।

দুজনে ফিরে যায়। যাবার পথে ফিরে ফিরে তাকায়, হাত নাড়ে। আমরাও নাড়ি।

সেদিন বিকালে মালপা পৌঁছে সেই ডাকহরকরাদের চালাঘরের পাশে তাঁবু ফেলা হয়। সেইখানেই রাত কাটে।

আজ আসবার পথে সেই ভীতিপ্রদ ঝরনাধারার আবার সম্মুখীন হতে হয়। বর্ষার জলভারে দ্বিগুণ স্ফীত হয়ে পথের উপর সবেগে লাফিয়ে পড়ছে,—তারই মধ্য দিয়ে অতি সাবধানে কোনক্রমে পেরিয়ে আসা। সবাই নিরাপদে পার হলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা।

পরের দিন—১৩ জুলাই—নিরপানির পাহাড় নির্বিঘ্নে অতিক্রম করি। নতুন পথ তৈরির কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। বহু শ্রমিক অক্লান্ত পরিশ্রমরত। কেউ পিঠের উপর পাথর বয়ে, কেউ চেরা তক্তার মত কাঠ নিয়ে দলে দলে পাহাড়ে উঠছে। পাহাড়ের গা কেটে, কোথাও বা নীচে কালীনদীর ধার থেকে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে মাটি ফেলে গেঁথে প্রাচীরের মত তুলেছে, তারই মাথা ও গা বেয়ে পথ। মাঝে মাঝে সিঁড়ির মত ধাপকাটা। কাজ শেষ হতে এখনও সময় লাগবে। তবুও নীচে নদী পারাপারের পুল দুটি জল-স্রোতে ভেঙে ভেসে যাওয়ায় অসম্পূর্ণ পথের উপর দিয়েই লোকচলাচল সুরু হয়েছে। নির্মীয়মাণ পথের বিপজ্জনক অংশগুলি শ্রমিকরা যাত্রীদের হাত ধরে অতি সন্তর্পণে পার করিয়ে দিচ্ছে। অতএব এবার আমাদের আর নেপালের মধ্যে দিয়ে আসা নয়।

এই নতুন পথও কতদিন থাকবে জানি না। নিরপানির রুদ্র গিরিদেবতার সামান্য অঙ্গ-সঞ্চালনে হয়ত এক মুহূর্তেই মানুষের এত পরিশ্রমের ফল ধূলিসাৎ হবে।

নিরপানির কঠিন পথ ছাড়িয়ে এসে জিপ্‌তির চড়াই ওঠার সময় আজ দিনদুপুরে রাস্তার উপর এক প্রকাণ্ড সাপ দেখি। এর আগে যে কোনদিন পথ চলতে সাপ চোখে পড়ে নি এমন নয়। তবে সেসব ছোটখাটো সাধারণ সাপ, দেখে মনে বিস্ময় বা আতঙ্ক জাগায় নি। আজকের সাপটিকে বলা চলে, নাগরাজ। হিমালয়ে মহাদেবের অঙ্গভূষণ হওয়ার উপযুক্তই বটে। মনে হয়, অজগর। অন্ততঃ ছয়-সাত হাত লম্বা। কালো ডোরাকাটা রঙ। চিক্কণ দেহ। অতি ধীরে ধীরে রাস্তার এক পাশ থেকে অপর দিকে পার হচ্ছে। সারা পথ জুড়ে। থমকে দাঁড়িয়ে অল্প দূর থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকে দেখতে থাকি। পথের ওদিকে একটা গাছের গুঁড়ি, পাক দিয়ে তাইতে জড়াতে থাকে। পথ ছাড়লে তবে আবার চলা সুরু করি।

ঘটনাটি ঘটে বেলা ১১টায়। কিন্তু সারাদিনই সে-দৃশ্য চোখের উপর ভাসতে থাকে। মনের উপরও কতোখানি প্রভাব বিস্তার করে তার প্রমাণ পাই সন্ধ্যাবেলা, যখন সাঙ্খোলায় রাত কাটাই।

এর পূর্বে রাত্রিবাসের স্থানে ঘরের বা তাঁবুর বাইরে অনেকদিনই অন্ধকারে বার হয়েছি। কখনো টর্চ হাতে ছিল, কখনো বা ছিল না। হাতে থাকলেও সারাক্ষণ অন্ধকারে জ্বালিয়ে রাখি নি। রাখার প্রয়োজনও বোধ হয় নি। আজ কিন্তু, এতদিন পরে, অন্ধকারে বাইরে বেরুনোর সময় মনে করে টর্চ শুধু সঙ্গেই রাখি না, যতক্ষণ বাইরে থাকি হাতের টর্চ জ্বালিয়ে রাখি! অথচ হিমালয়ে সাপ থাকবে, বিচিত্র নয়, এতকাল অজানাও ছিল না! স্বচক্ষে দেখা ভয়ঙ্কর দৃশ্য মনের উপর এমনি গভীর ছাপ রাখে।

॥ ২ ॥

নিরপানির ভয়স্থানগুলি অতিক্রম করে এসে মনের দুর্ভাবনার লাঘব হয় বটে, কিন্তু পার্বত্য-পথের দুর্গমতার পরিসমাপ্তি হয় না।

গিরিরাজের অন্দরমহল থেকে নেমে আসার ফিরতি পথেও 'অবতরণ' শব্দটি সব সময়ে প্রযোজ্য নয়। হিমালয়ে ঘুরতে ফিরতে চড়াই-উৎরাই থাকেই।

যাবার পথেও, ফেরবার কালেও। আসবার সময়ের উৎরাইগুলি এখন চড়াই, এবং চড়াইগুলি উৎরাই-এ রূপান্তরিত হয়।

তা হোক্। পথচলায় চরণযুগল এখন অভ্যস্ত। গৃহমুখী মনও দ্রুতগতিতে চলতে উদ্‌গ্রীব। আলমোরা এখনও প্রায় একশ' কুড়ি মাইল দূর। গার্বিয়াঙ্ থেকে পদব্রজেই আসছি। অবশিষ্ট পথও এইভাবে যেতে হবে। সেদিক থেকেও দেহ ও মন প্রস্তুত। ভাবি, পথও তো এখন পূর্ব পরিচিত। কিন্তু প্রতিদিন চারিদিকে তাকিয়ে মনের সেই ভ্রান্ত ধারণা কাটে। হিমালয়ের যে রূপ ও আকৃতি এই তো কিছুকাল পূর্বে দেখে গিয়েছি, সে হিমালয়কে এখন চেনাই যায় না। সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। যেন অতি পরিচিত ধীর, স্থির, শান্ত ব্যক্তি এখন যুদ্ধরত দুর্ধর্ষ সৈনিকের ভূমিকায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রঙ্গমঞ্চে আস্ফালনে মত্ত,—দেখে চেনা দুঃসাধ্য। হিমালয়ের এখন ধ্যানমৌন সমাহিত মূর্তি নয়, প্রলয়-নাচন-উন্মত্ত নটরাজ। ঘোর বর্ষার প্রবল প্লাবনে পাহাড়, নদী, ঝরনার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দিকে দিকে পাহাড় ভেঙে ধস্ নামে। স্থানে স্থানে যে-কোন মুহূর্তে পথের উপর চকিতে পাথর গড়িয়ে এসে পড়ার সদাই আশঙ্কা। কোথাও কোথাও পাহাড়ের ধস্ পদচিহ্ন সম্পূর্ণ গ্রাস করে। পাহাড়ের গা বেয়ে,—পাকদণ্ডী দিয়ে উঠে বা নেমে,—সেই ভগ্নস্তূপের সঙ্কীর্ণ অংশে কোনমতে পা রেখে অতি সাবধানে পার হওয়া। নদী ও ঝরনাগুলির বারিরাশি চতুর্গুণ বর্ধিত হয়েছে। স্ফটিকস্বচ্ছ সুনীল ধারা এখন প্রগাঢ় গৈরিকবর্ণ। আবিল উত্তাল তরঙ্গ-স্রোত। ভয়াল হিংস্র মূর্তি। প্রমত্ত বেগ। প্রচণ্ড গর্জন। দুই কূলের পাড় ভেঙে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে চলে। দুদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে শিলাখণ্ড সশব্দে ছিটকে পড়ে।

আর বর্ষার প্রকোপ? সে এখন পথের নিত্য সহচর। যখন-তখন মুষল-ধারায় বৃষ্টি নামে। হয়ত সারাদিনই সেই বৃষ্টিজাল ভেদ করে হাঁটা। গায়ে বর্ষাতি, মাথায় ছাতা,—কিন্তু এ ধারা রোধ করার তাদেরও ক্ষমতা থাকে না। পরনের জামা কাপড় ভিতর পর্যন্ত ভিজে জব্‌ জব্‌ করে। হাঁটা তবুও বন্ধ থাকে না। বৃষ্টিস্নাত হয়েই যাত্রা শেষ করার দুর্বার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সন্ধ্যায় দিনশেষের আশ্রয়ে পৌঁছে সেই সিক্ত বসন পরিবর্তন। কিন্তু সে সময়ে যখন পোষাক ছাড়ি, দেখি, ভিজা জামা সার্ট গায়েই শুকিয়েছে। দিনের পর দিন এমনি চলে। আশ্চর্য বোধ হয়, এতো অনিয়ম, দেহের প্রতি এই ঘোর অত্যাচার,—শরীর তবুও সুস্থই থাকে। হাঁচি, কাশি, সর্দি, জ্বর,—রোগের

কোন উপসর্গই দেখা দেয় না।

সুধীর বলে, অবাক কাণ্ড! কলকাতায় বা দেশে এমন হলে কেঁপে জ্বর আসত। ডাক্তার এসে বলতেন, নিউমোনিয়া!

এইভাবে নিত্য পথ চলে শরীর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক। মনে বিরক্তি জাগারও কথা। কখনো-সখনো সেই বিরূপ ভাব দেহ ও মনকে আচ্ছন্নও করে। তখন দীর্ঘ পথ দীর্ঘতর বলে বোধ হয়। সারাদিন চলে চলেও যেন শেষ হতে চায় না। পথের বাধাবিঘ্নও অসহনীয় অনুমিত হয়।

এমনি এক সময়ে একদিন সুধীর বলে, স্বামিজী! কৈলাস মানস সরোবরে আপনার আসা এই এবার নিয়ে চারবার হোল। একবার আসার পর এ-পথে নতুন কিছু দেখার কৌতূহল বা আগ্রহ আপনার থাকার কথা নয়। বরং পথের দুর্গমতা, দারুণ কষ্টভোগ, কতো রকম অসুবিধা,—সব কিছুই আপনার দেখা, জানা হয়ে যায়। তবুও বার বার এইভাবে আসেন, আমাদের সঙ্গেও চলে এলেন—কতোই না উৎসাহ করে! ব্যাপার কী, বুঝি না। এ-পথে আবার আসার কথা, আমি তো ভাবতেই পারি না।

স্বামিজী হাসেন। বলেন, সুধীরবাবু, এখন ভাবতে পারেন না,—ঘরে ফিরে যান, তখন বুঝবেন হিমালয় পথের আকর্ষণটা কী! এর ডাকে একবার সাড়া দিলে, বার বার তাকে ফিরে আসতেই হবে। না এসে উপায় থাকে না। পথের কষ্ট, বিপদ-আপদ, কতো অসুবিধা,—সে সব ত আছেই, থাকবেও। কিন্তু দেখবেন, এ-সবের স্মৃতি মনে শিকড় গাঁথে না,—যে অপার আনন্দ মনে সঞ্চয় করে নিয়ে ফিরছেন, তাইতেই চিরজীবন মন ভরে থাকে, বার বার এই হিমালয়ের পথে টেনে আনে। বুঝবেন পরে।

পথে একদিন আর এক বাঙালী দলের সঙ্গে দেখা। এক সাধুজি তাঁর শিষ্যদল নিয়ে চলেছেন। সবাই হেঁটে। চারজন বিধবা বর্ষীয়সী মহিলা ও একজন পুরুষ। মুর্শিদাবাদে স্বামিজীর আশ্রম। আর কোন যাত্রীদলের সঙ্গে আমাদের এ-পথে সাক্ষাৎ হয় নি।

২৩শে জুলাই, সোমবার, সকাল আটটায় অবশেষে আমরা আলমোরায় পৌঁছাই। আলমোরা ছাড়ার সাতচল্লিশ দিন পরে। অথচ শহরে প্রবেশ করেই মনে হয়, এই তো সেদিন এখান থেকে যাত্রা করেছিলাম!

পথের দু পাশ থেকে স্বামিজীর পরিচিত সকলে শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন জানান। আবার কৌতূহলী প্রশ্ন করেন, আরে স্বামিজী! কৈলাস

দর্শন করে ফিরে এলেন ?

অনুভবানন্দজি কৈলাসপতির উদ্দেশে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে, তৃপ্তিভরা হাসিমুখে উত্তর দেন, তাঁরই অশেষ কৃপা।

আশ্রমের স্বামিজীরাও সকলেই পরম আনন্দিত। আমরা দুজনেও যেন তাঁদের কতো আপনজন। এবার আর হোটেলে থাকা নয়, আশ্রমের মধ্যে স্বামিজীদের সঙ্গে থাকা।

রাত্রে শ্রীযুক্ত বোশী সেনের বাড়িতে কৈলাসযাত্রীদের নিমন্ত্রণ হয়। সভ্য-জগতের বহুবিধ উপাদেয় খাদ্য। পাহাড়ী ক্ষুধা সভ্যতার মর্যাদা না রেখেই সব নিঃশেষ করে।

আশ্রমের সকলেরই এবং বোশীদার বিশেষ ইচ্ছা ও অনুরোধ, কয়েকদিন এখানে আরামে বিশ্রাম নিই। কিন্তু ঘর-ছাড়া মন এখন বাড়ির পানে ছুটে চলে। পথ-চলা সাঙ্গ করে আরামের লোভে কালক্ষেপ করার আগ্রহ থাকে না। আগামী কালই আলমোরা ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করব, স্থির করি।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুধীরকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দুজনের খরচ মোটা-মুটি কতো হলো ? সুধীর বলে, যা অনুমান করা হয়েছিল তার মধ্যেই হয়েছে। কলকাতা থেকে ট্রেনে—(দ্বিতীয় শ্রেণীতে)—যাতায়াতের টিকিট খরচা নিয়ে,—এমন কি, গার্বিয়াঙে যে দু-একটা জিনিস কেনা হোল তারও দাম ধরে—আমাদের এক-একজনের পাঁচশ' টাকার কিছু কমই খরচা পড়েছে।

পরদিন। ২৪শে জুলাই। সকাল নয়টা। আশ্রমের স্বামিজীদের নিকট বিদায় নিই। মোটর-স্ট্যাণ্ডে আসি। সঙ্গে অনুভবানন্দজি, সুরেন্দ্র মহারাজ, ব্রহ্মচারীজি আসেন। ভানুসিংও আছে। কিন্তু এতদিনের দুর্গমপথের সাথীরা কেউই আজ আর সঙ্গে আসবেন না। সকলে মিলে এই কয়দিনের জন্য যে অভিনব সংসার গড়ি, আজ তা ভেঙে গেছে। সকলেই আছি, সেই পথ-চলা নেই। হিমালয়ের পথে পথে পথিকজীবনের সেই বিচিত্র আনন্দ আজ অবলুপ্ত।

মোটরে স্টার্ট দেয়। তবুও কারও মুখে কথা ফোটে না।

স্বামিজীদের ও ব্রহ্মচারীজিকে তাঁদের অনাবিল স্নেহ, নিঃস্বার্থ যত্ন ও সাহচর্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয় না, আমার শত-সহস্র অপরাধের ত্রুটি স্বীকার করা হয় না, ভানুসিংকে তার কর্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত সেবার জন্য শেষ

প্রশংসাও করা হয় না। মনে হয়, এসবই নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন। অব্যক্ত অক্ষম মুখের ভাষা মনের গভীরে পথ হারায়।

মোটরে ওঠার আগে সকলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করি, স্বামিজীদের প্রণাম করি. মনের ভারে চোখের দৃষ্টি সকলেরই ঝাপসা হয়ে ওঠে।

ভানুসিং নিকটে আসে। মৃদুকণ্ঠে সসঙ্কোচে বলে, বাবুজি, একটা সার্টিফিকেট।

ঘাড় নেড়ে বলি, নিশ্চয়। স্বামিজীর কাছে পাঠিয়ে দেব।

মুখে হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সকলকে বলি, বেঁচে থাকি তো আবার দেখা হবেই। চললাম।

মোটর ছুটে শহর ছেড়ে পাহাড়-পথে সশব্দে চলতে থাকে।

পথে নৈনীতালে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বিকালে কাঠগোদামে নেমে আসি, ট্রেনে চাপি। ২৬শে জুলাই সকালে কলকাতায় পৌঁছাব।

সমতলভূমির উপর দিয়ে ট্রেন চলে। মাঠের পর মাঠ, সবুজ ক্ষেত, তারই মাঝে মাঝে ছায়াশীতল শান্ত গ্রাম। ট্রেনের সঙ্গে সব যেন ছুটতে থাকে। বহুদিন পরে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখে বাঙলাদেশের জন্য প্রাণ আনচান করে।

সন্ধ্যা নামে।

সুধীর ও আমি নির্বাক হয়ে ট্রেনের জানালার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। দেখি, হিমালয়ের সেই সুবিশাল গিরিশ্রেণী দূর থেকে আরও দূরে দিগন্তে বিলীন হয়। তারই বুকে কাটানো বিগতদিনের সুখস্মৃতি মানসপটে একে একে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—সেই পাহাড়ের পর পাহাড়ের মালাগাঁথা, বিটপীবহুল অরণ্যভূমি, নৃত্যপরা নির্ঝরিণীর কলগীতি, তুষারক্ষেত্রে প্রভাত-সূর্যের রঙের খেলা, মানসের সুনীল বারিরাশি, জ্যোতির্ময় কৈলাসশিখর,—আমাদের সুখের সংসারের আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি,—সবই কি ঐ সুদূর মেঘের অন্তরালে হিমগিরির গোপনপুরে হারিয়ে এলাম?

সন্ধ্যার ছায়া ঘনতর করে রাত্রের অন্ধকার আসে, হিমালয়ের শেষ অস্পষ্ট রেখাও চোখের উপর থেকে কেড়ে নেয়।

মনের মাঝে স্মৃতিটিকে সযত্নে আঁকড়ে ধরে রাখি।

ভাবতে থাকি, আবার কবে আসব ফিরে।

—শেষ—

পরিশিষ্ট

কৈলাস ও মানস সরোবর সম্পর্কে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের ও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা।

১। অখণ্ডানন্দ, স্বামী—তিব্বতের পথে হিমালয়ে। দ্বিতীয় সংস্করণ,—পরিশিষ্ট। (১৩৭১) [উদ্বোধন কার্যালয়]

২। অতুলচন্দ্র লাহিড়ী—কৈলাস-মানসের পথে। (১৯৫৮)

৩। অপূর্বানন্দ, স্বামী—কৈলাস ও মানস তীর্থ।

৪। অবধূত—নীলকণ্ঠ হিমালয়। (১৯৬৩)

৫। গুরুপ্রিয়া দেবী—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী। পঞ্চম ভাগ,—প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়।

৬। দিব্যাত্মানন্দ, স্বামী—পুণ্যতীর্থ ভারত। (১৯৬৩)

৭। ধ্রুব মজুমদার—সো মাভাং। (১৯৭৬)

৮। প্রণবানন্দ, স্বামী—কৈলাস মানস সরোবর। (হিন্দী) (১৯৫৩)

৯। প্রবোধকুমার সান্যাল—দেবতাত্মা হিমালয়। দ্বিতীয় খণ্ড।

১০। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর। (১৯৩৪)

১১। বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়—স্বদেশে বিদেশে—চুরাশি বৎসর জীবনযাপন। (১৩৮২)

১২। বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত—চতুর্থ ভাগ—পৃঃ ৪৯৪-৯৫—"কৈলাস"; চতুর্দশ ভাগ—পৃঃ ৫৯৬—"মানস সরোবর"।

১৩। যতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী—দুইবার শ্রীকৈলাস দর্শন। (১৯৭১)

১৪। যোগানন্দ সরস্বতী, স্বামী—হিমাদ্রি শিখরে। (১৩৫৬)

১৫। রমেন্দ্রনাথ রায়—শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবর।

১৬। রামানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বামী—কৈলাস দর্শন। (হিন্দী)

১৭। রামানন্দ ভারতী, স্বামী—হিমারণ্য। "সাহিত্য" পত্রিকা। দ্বাদশ বর্ষ, ১৩০৮ সাল। পৃঃ ১, ৬৫, ১২৯, ১৯৩, ২৫৭, ৩২১, ৩৮৭, ৪৫১, ৫৩৬, ৫৯১। (১৩৮৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ)।

১৮। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, শাস্ত্রী—কৈলাস যাত্রা। (১৯২৪)

১৯। সরোজ চক্রবর্তী—তুষারতীর্থ কৈলাস। (১৯৬০)

২০। সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য—মানস-সরোবর ও কৈলাস। (১৩৩৮)

২১। সূর্যকুমার নায়ক—কৈলাসের ডায়েরী।

—"সাধারণী" মাসিক পত্রিকা। (একাদশ বর্ষ—ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৩৬৬-১৩৬৮ সাল)।

1. Ali, Salim—(i) An Ornithological Pilgrimage to Lake Manasarowar and Mount Kailas—Journal of the Bombay Natural History Society, Vol. 46, No. 2, August 1946, pp. 286-308.

(ii) A Birding trip to Kailas and Manasarovar—Himalaya (Journal of the Badrinath Temple Committee) Vol. I No. 3, P. 5.

2. Atkinson, E. T.—Gazetteer of the North Western Provinces, Vol. X. Ch. VIII, pp. 403-670 [List of Plants collected in Kumaon and the Adjoining parts of Tibet by R. Strachey and J. E. Winterbottem], 1882.

3. Banerjee, Nityanarayan—The Himalayas In and Across.

4. Bhanja, K. C.—Mystic Tibet & the Himalaya. (1948).

5. Bose, Buddha—Holy Kailas. (1954).

6. Bysack, Gaur Das—Notes on a Buddhist monastery at Bhot Bagan (Howrah)...and on Puran Gir Gossain, the celebrated Indian Acharya and Govt. Emissary at the court of the Tashi Lama, Tibet, in the last century. 1891—Journal of the Asiatic Society of Bengal—Vol. 59 (1) p. 50.

7. Chatterjee, Biswa Bandhu & S. S. Singh, R. B. Singh—Bhotias of Indo Tibetan Border of Uttarakhand. [Varanasi Gandhian Institute of Studies, 1975] (mimeo-graphed).

8. Das, Sarat Chandra—(i) Indian Pundits in the Land of the Snow, 1893.

(ii) Dispute between a Buddhist and a Bonpo priest for the possession of Mount Kailasa and the Lake Manas—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 50 (1), p. 206.

9. Desideri, Ippolito of Pistoia.—An Account of Tibet: The Travels of Ippolito Desideri—1712-1727

[George Routledge & Sons Ltd., London, 1931, Revised ed. 1937].

10. Duncun, Jonathan—An Account of Two Fakeers with their Portraits.—Asiatic Researches Vol. 5 (1799) P. 37.

11. Gansser, August & A. Heim—i) Thron der Gotter.
ii) The Throne of the Gods. (1939)

12. Ghersi, E.—See under title Tucci.

13. Govinda, Lama Anagarika—The Way of the White Clouds—A Buddhist Pilgrim in Tibet. (1966)

14. Govinda, Li Gotami—The Tsaparang Expedition.—Illustrated Weekly of India, dated 1951—April 8th, 15th, 22nd, 29th; May 6th, 13th, 20th, 27th. (Illustrated with her photographs & sketches, done on the spot).

15. Hamsa, Bhagwan, Shri—The Holy Mountain. (1934)

16. Havell, E. B.—The Himalayas in Indian Art. (1924)

17. Hedin, Sven—i) Trans-Himalaya (3 vols.)
ii) Southern Tibet.
iii) Journeys in Tibet 1906-08.—Geographical Journal. vol. 30, p. 353.

18. Helm, Arnold & A. Gansser—See under title Gansser.

19. Historical Records of the Survey of India—5 vols.

20. Joshi, G. D.—A trip to the Kailash and the Manasarover—Himalaya (Journal of the Badrinath Temple Committee), vol. 1 No. 3, P. 32.

21. Kashyap, Shiv Ram—i) A Journey through Western Tibet—Modern Review, May & June, 1923.
ii) Some Geographical observations in Western Tibet—Journal & Proceedings of Asiatic Society of Bengal,—New series, XXV (1929) pp. 223-226.

22. Kawaguchi, Ekai—Three Years in Tibet, (1909).

23. Landor, A. Henry Savage—i) In the Forbidden Land—2 vols. (1898).
ii) Nepal & Tibet. (1905)

24. Longstaff, T. G.—i) This My Voyage. (1950)
ii) Twenty Years after. (1928)
iii) Notes on a Journey through the Western Himalaya—Geographical Journal, vol. 29, p. 201

iv) Twentyfive photographs of Kumaon and Manasarowar region of Tibet—Geographical Journal, vol. 33, p. 351.

v) Attempt to climb Gurla Mandhata in Western Tibet. (1906) (with Sherring).

25. Ludlow, F. & F. Williamson—See under title Williamson.

26. Moorcroft, William—A Journey to Lake Manasarovara in Un-des—Asiatic Researches, vol. 12 (1816), pp. 251-285 & 375-534.

27. Negi, T. Jodh Singh Bagli—Himalayan Travels. (1920).

28. Pearse. Hugh—Moorcroft and Hearsey's visit to Lake Manasarowar in 1812 Geographical Journal, vol. 26, p. 180.

29. Pranavananda, Swami—i) Pilgrim's Companion to the Holy Kailas & Manasarovar.
ii) Exploration in Tibet. (1939)
iii) Kailas-Monasarovar. (1949)

30. Rahul, Ram—i) The Himalayan Borderland, [Vikas Publications, Delhi] (1970).
ii) The Himalaya as a Frontier [Vikas Publications, Delhi] (1977).

31. Rangachar, N Diary of a Pilgrimage to Lake Manasarowar & Mount Kailas with the Maharaja of Mysore in 1931. (1931)

32. Ruttledge, Hugh—Notes on a visit to Western Tibet in 1926, with a note on the Channel connecting the Lakes Manasarowar and Rakas by R. C. Wilson.—Geographical Journal, vol. 71, p. 431.

33. Sarcar, S. C.—A note on Puran Gir Gosain.—Bengal Past & Present, vol. 43, (1932) pp. 83-87.

34. Schary, Edwin G.—In search of the Mahatmas of Tibet.

35. Sherring, C. A.—Western Tibet & the British Border land. (1906).

36. Singer, H.—Rakas-tal and Manasarowar. (1900)—Petermanns Mitt. Jahr. Taf. vol. 46, p. 166.

37. Singh, Gurdial.—Three months in Upper Garhwal & Adjacent Tibet.—Himalayan Journal, vol. 19, pp. 3-17.

38. Singh, R. B. & S. S—See under title Chatterjee.

39. 'Sivananda, Swami.—Pilgrimage to Badri & Kailas (Yoga-vedanta Forest University, Rishikesh.) (1953)

40. Smith H. U.—A Trip to Thibet, Kylas, source of the Sutlej, and the Mansurwur and Rakhas Lakes, 1867. —Proceedings of the Royal Geographical Society (1866-67), vol. 11, p. 119.

41. Strachey, Henry.—i) Narrative of a Journey to Cho Logan (Rakas Tal), Cho Mapan (Manasarowar) and the valley of Pruang in Gnari, Hundes, in September & October, 1846.—Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 17, Part II A (1848), pp. 98-120 ; 127-182 ; 327-351.

ii) Paper on Physical Geography of Western Tibet with a Map (read on 22. 11. 1853)—Journal of the Royal Geographical Society, vol. 23, p. 1.

42. Strachey, Richard.—i) Narrative of a Journey to the Lakes Rakas Tal & Manasarovar in 1848.—Geographical Journal vol. 15, pp. 150-170 ; 243-264 ; 394-415.

ii) Paper on the physical Geography of the Provinces of Kumaon and Garhwal in the Himalaya mountains, and of the adjoining parts of Tibet, (read on 12. 5. 1851)—Journal of the Royal Geographical Society, vol. 21, p. 57.

iii) List of Plants collected in Kumaon and the adjoining parts of Tibet.—Atkinson's Gazetteer of the North Western Provinces, vol. X, ch. VIII, pp. 403-670.

iv) Connection between Manasarowar and Rakas-tal—(A letter)—Nature, vol. 59, p. 76.

43. Tapovan Maharaj, Swami.—Wanderings in the Himalayas (Hima Giri Vihar), (1960)

44. Tichy, Herbert.—i) The Holiest Mountain.
ii) Zum heiligsten berg der welt. (1949)

45. Tucci, Giuseppe & E. Ghersi—Secrets of Tibet. (1935).

46. Wakefield, E. B.—A visit to Western Tibet, 1929 [Expeditions]—Himalayan Journal, vol. 2, p. 101

47. Wessels, C. J.—Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603-1721. (The Hague, Martinus Nijhoff, 1924).

48. Wilford, F.—An Essay on the Sacred, Isles in the West, with other Essays connected with that work etc.—Asiatic Researches, vol. VIII (1805), pp. 322-328.

49. Williamson, F. & F. Ludlow.—Expeditions.—In Western Tibet—Himalayan Journal, vol. 5, (1933), pp. 103-105.

50. Wilson, R. C.—i) Kailas Parbat and two passes of the Kumaon Himalaya. (1928)
ii) Note on the Channel connecting the Lakes Manasarowar and Rakas [See under title Ruttledge]
iii) Obituary note on R. C. Wilson, by T. S. Blakeney.—Himalayan Journal, vol. 26, p. 160.